নড়াইল জেলার
ইতিহাস ও ঐতিহ্য

নড়াইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

মহসিন হোসাইন

র‍্যাডিক্যাল
কলকাতা
২০০০

প্রথম প্রকাশ :
অক্টোবর, ২০০০

প্রচ্ছদ :
অমিতাভ ভট্টাচার্য

প্রকাশক ও মুদ্রক :
অরুণকুমার দে
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩ বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

প্রয়াত পিতামহী মালিকাবানু ও
পিতামহ আবদুস সামাদ মিয়াকে

সূচিপত্র

নড়াইল জেলা পরিচিতি

নামকরণ

কথিত আছে, বাংলার সুবাদার আলিবর্দি খানের শাসন আমলে দেশের বিভিন্ন অংশে বর্গি ও পাঠান বিদ্রোহীরা নানা ধরনের উৎপীড়ন শুরু করে। আলিবর্দির মুঘল বাহিনী বর্গি ও পাঠানদের সম্পূর্ণ শায়েস্তা করতে ব্যর্থ হন। এরপর বর্গি ও পাঠান দস্যুরা তাদের অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। সুবা বাংলার পশ্চিমও উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রাণভয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকায় পালাতে থাকে। সেই সময় মদনগোপাল দত্ত[১] নামে সুবাদারের এক কর্মচারী কিসমাত কুড়িগ্রামে সপরিবারে নৌকা যোগে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি কচুড়ির শক্ত ধাপের উপর একজন ফকিরকে যোগাসনে উপবিষ্ট দেখতে পান। উক্ত ফকির দত্ত মশাইয়ের প্রার্থনায় তার নড়িটি তাকে দান করেন। এবং এই নড়ি পরবর্তীতে আশীবাদ হয়ে দাঁড়ায়।[২] মদনগোপাল দত্ত ফকির বা সাধক আউলিয়ার নড়ি বা লাঠি পেয়ে ধীরে ধীরে প্রতিপত্তি অর্জন করেন। এই ভাবে কিসমাত কুড়িগ্রাম অঞ্চলের ঐ স্থানের নাম হলো নড়াল। নড়ালের লেখ্যরূপ হলো নড়াইল। স্থানটি নড়িয়াল ফকিরের নড়ি থেকে পরিচিতি লাভ করে। মনদগোপাল দত্তের পৌত্র বিখ্যাত রূপরাম দত্ত। রূপরাম দত্তই নড়াইলের জমিদারদের প্রথম পুরুষ। যা হোক, মদনগোপাল দত্ত ও তার উত্তরাধিকারীরা নড়িয়াল ফকিরের অতি শ্রদ্ধাবশত নড়াল নামটি স্থায়ী করেন। তারা কোনো পরিবর্তন আনেন নি। নড়াইলে নীলবিদ্রোহের কারণে মহকুমা স্থাপনের প্রয়োজন হলে ১৮৬৩ সালে ইংরেজ সরকার মহিশখোলা মৌজায় মুহকুমার প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন। এইভাবে মুঘল আমলের 'নড়াল' নামটি ইংরেজ শাসনামলে নড়াইল নামে পরিচিতি পায়। কিসমাত কুড়িগ্রাম বা কুড়িগ্রাম নড়াইল বা নড়ালগ্রাম হতে প্রাচীন। কিসমাত কুড়িগ্রামে মুঘল শাসনামলের পূর্বে সুলতানি শাসনামলে একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র ও সেনাছাউনি ছিল।[৩] কিসমাত কুড়িগ্রামের আয়তনও ছিল বেশ বিস্তৃত।

নড়াইল জেলার সীমা

নড়াইল জেলার উত্তরে মাগুরা জেলা, গোপালগঞ্জ জেলা ও যশোর জেলা। দক্ষিণে যশোর জেলা ও খুলনা জেলা। পশ্চিমে যশোর জেলা। পূর্বে খুলনা জেলা, বাগেরহাট জেলা ও গোপালগঞ্জ জেলা।

আয়তন

নড়াইল জেলার মোট ২৩৬ টি গ্রাম আছে। মৌজা ১৫০টি, ৩টি উপজেলা, ১টি থানা ও ২টি পৌরসভা রয়েছে। নড়াইল জেলার মোট [illegible] বর্গমাইল।[৪]

জনসংখ্যা

১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুসারে নড়াইল জেলার মোট লোকসংখ্যা ছিল ৫.৯০,০৩৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে, ৩,০০,০৫০ জন ও ২,৮৯,৯৮৯ জন। বর্তমান নড়াইল জেলার মোট জনসংখ্যা ৬,৩০,০৮৫ জন।[৫]

ভূমিগঠন ও ভৌগোলিক বিবরণ

আধুনিক ভূতাত্ত্বিকেরা ধারণা করেন, হিমালয় বার বার উত্থানের মধ্য দিয়ে যে ভূমি গঠন করে তাকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। শেষ বারে উত্থান হয়েছিল প্রায় ১০ লক্ষ বছর পূর্বে। মায়োসিন পর্বের পরে এই উত্থান ঘটেছিল বলে ধারণা করা হয়।[৬] হিমালয়ের এই পর্বের উত্থানকে বলা হয় প্লায়েসটোসিন যুগ (Pleistocene Period)। প্লায়েসটোসিন যুগে বিরাট একটি দ্বীপময় জলাশয় সৃষ্টি হয় সমুদ্রবক্ষে।[৭] কালক্রমে ঐ জলাশয় বা হ্রদ ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, নোয়াখালি, বরিশাল, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া, যশোর ও নড়াইল জেলা হিসেবে বিদ্যমান। ভারত মহাসাগর ও উল্লিখিত হ্রদের মাঝখানে ছিলো একটি ক্ষীণ বাঁধ। পরবর্তীকালে ঐ বাঁধটি অপসারিত হয়। সমুদ্র তখন পদ্মা নদীর গতিপথ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। ধারণা করা যায়, গঙ্গা নদী তখন গোয়ালন্দের নিকটে বঙ্গোপসাগরে পতিত হতো। ধীরে ধীরে গঙ্গার প্রবাহিত পলিদ্বারা ভূভাগ গঠিত হয়। ঐ ভূভাগসমূহ 'দ্বীপ' বা 'দ্বীপচর' নামে পরিচিতি লাভ করে। ঐ অসংখ্য দ্বীপই পৃথিবী বিখ্যাত 'গাঙ্গেয় উপদ্বীপ' বা 'বদ্বীপ'।[৮] ভূতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন, প্রায় ২৫ হাজার বছর পূর্বে নদীর মোহনায় ঐ সব ভূভাগ তথা নড়াইল জেলার ভূভাগ সৃষ্টিকর্ম শুরু হয়েছে।[৯]

ভূভাগসমূহ প্রথমে বিপুল জলাশযের মধ্যে দ্বীপ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। প্রাচীন ঘটককারিকা ও বৈষ্ণবগ্রন্থে তার প্রমাণ মেলে :

গঙ্গাগর্ভোত্থিতো দ্বীপো দ্বীপ পূঞ্জৈর্বহির্ধৃর্ত।
প্রতীচ্যাং যস্য দেশস্যগঙ্গা ভাতি নিরন্তর॥১০
(এড়ুমিশ্রের কারিকা)

প্রাচীন সেন রাজত্বের সময় নবদ্বীপরাজ্য ৯টি মতান্তরে ১২টি প্রধান দ্বীপের সমন্বয় ছিল। প্রধান ১২টি দ্বীপের মধ্যেও আবার খণ্ড খণ্ড অসংখ্য দ্বীপের সন্ধান পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো দ্বীপ নামকরণের পূর্বেই অন্য দ্বীপের সাথে মিলিত হয়ে দ্বীপটি অস্তিত্ব হারায়। উল্লিখিত প্রধান ১২টি দ্বীপ হলো : (১) অগ্রদ্বীপ (২) নবদ্বীপ (৩) মধ্যদ্বীপ (৪) চক্রদ্বীপ (৫) এড়ুদ্বীপ বা এড়োদহ (৬) প্রবালদ্বীপ (৭) কুশদ্বীপ বা কুশদহ (৮) অন্ধদ্বীপ (৯) বৃদ্ধদ্বীপ (১০) সূর্যদ্বীপ (১১) জয়দ্বীপ ও (১২) চন্দ্রদ্বীপ।

সূর্যদ্বীপ সমূহকে ভাগ করা হয়েছে ৩ ভাগে। এই দ্বীপগুলো হলো : (১) যোগিন্দ্রদ্বীপ (২) লাটদ্বীপ ও (৩) কংকদ্বীপ। কংকদ্বীপের মধ্যে আছে আরো বেশ কিছু দ্বীপ। এই কংকদ্বীপের বিস্তৃত অংশ নিয়েই নড়াইল জেলা ও অন্যান্য অঞ্চলের ভূমি গঠিত হয়েছে। কংকদ্বীপের ২টি অংশ। চিত্রা নদী হতে উত্তর দিকের নবগঙ্গা পর্যন্ত একটি অংশ। নড়াইল জেলার এই অংশের মধ্যে রয়েছে লক্ষ্মীপাশা, মল্লিকপুর, সারল, উলো, দিঘলিয়া, কোলা প্রভৃতি স্থান। এ ছাড়া নড়াইল জেলার পশ্চিম অংশ ও দক্ষিণ-

পূর্ব অংশ লাটদ্বীপ কংকদ্বীপের অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত। নড়াইল জেলার একটি সুপ্রাচীন দ্বীপ হলো এড়োদ্বীপ। এড়োদ্বীপের বর্তমান নাম এড়েন্দা (স্থানটি লোহাগড়া উপজেলার মধ্যে বিদ্যমান)।

উল্লিখিত দ্বীপসমূহ ছাড়াও প্রাচীন জয়দ্বীপেরও কিছু অংশ বর্তমান নড়াইল জেলা গঠনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। সূর্যদ্বপের উত্তরাংশ, পূর্বদিকে মধুমতি উত্তরে গড়াই ও নবগঙ্গা নদীর পূর্ব তীরবর্তী বিস্তৃর্ণ এলাকা জয়দ্বীপ। জয়দ্বীপের বিশেষ প্রাচীন স্থান হলো জয়পুর। জয়পুর নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানার একটি ইউনিয়ন। প্রাচীনকালেই পদ্মা নদী হতে নবগঙ্গা নদী প্রবাহিত হয়ে ছোটো বড়ো অসংখ্য দ্বীপ বা দ্বীপভিটি সৃষ্টি হয়েছিল। দ্বীপ শব্দটি নড়াইল জেলাবাসী 'দিয়া' উচ্চারণ করে থাকে। জয়দ্বীপের ছোটো ছোটো কয়েকটি দ্বীপ হলো, আলোকদিয়া, সিরিজদিয়া, ঝাকড়াদিয়া প্রভৃতি। নলদ্বীপ বা নলদী লোহাগড়া থানার একটি প্রাচীন দ্বীপ। আরেকটি উল্লেখযোগ্য দ্বীপ হলো, বড়োদ্বীপ বা বড়দিয়া। এই পর্যায়ে কালিয়া থানার শালিকদিয়া, দিয়াডাঙ্গা[১১] ও নড়াইল সদর থানা মাছিমদিয়া প্রভৃতি স্থানের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে সহজে অনুমান করা যায়, আধুনিক নড়াইল জেলা অতি প্রাচীনকালের সৃষ্টি। প্রায় ২৫ হাজার বছর আগেই জেলার মূল ভূ-খণ্ড সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে উত্থিত হয়েছিল।

বহুকাল থেকে উপবঙ্গ তথা নড়াইল জেলার দ্বীপসমূহ ধীরে ধীরে লোক বসতিতে পূর্ণ হয়। এক সময় বিভিন্ন জনপদ বিভিন্ন নাম নিয়ে পরিচিতি পায়। গ্রামের নামগুলোর সঙ্গে স্থানের প্রাচীন দ্বীপ অবস্থার একটি প্রচ্ছন্ন ইতিহাসও খুঁজে পাওয়া যায়। ভূমিগঠন ও জনপদ সৃষ্টির ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র এই ভাবে :

জলাশয় থেকে নবোত্থিত ভূমি প্রথমে চিহ্নিত করা হয় দোহাযুক্ত নাম দিয়ে। পরে যখন দ্বীপ জাগতে লাগলো তখন মধ্যবর্তী জলভাগ গাঙ্গ বা খালের নামে পরিচিত হলো। যখন পলি জমে উচ্চ ভূমির সৃষ্টি হলো, তখন ডাঙ্গা দিয়ে অনেক স্থাননাম হলো। যখন দ্বীপ পরিষ্কার হলো, তখন দিয়া ও দহযুক্ত নাম চালু হলো। ক্রমে চর বা চক যোগ হলো। পরে চরে জঙ্গল জন্মালো, জঙ্গল কেটে শুরু হলো আবাদ। তখন স্থাননামে যোগ হলো কাটি। আরো পরে পাড়া, বাড়ি, গ্রাম, নগর প্রভৃতি শব্দ যোগ হয়। বসতির সঙ্গে সম্পর্ক বাণিজ্যের। ফলে, কাছাকাছি জায়গায় গড়ে ওঠে হাট, বাজার– যে গুলো এখনও স্থান নামে যুক্ত।[১২]

গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে নড়াইল জেলার গ্রামসমূহের নামের পূর্বে বা পরে নিম্নোক্ত পরিচয়াত্মক শব্দ পাবো, যা দ্বারা প্রমাণ হয় এই জেলা ছিল এক সময় অসংখ্য দ্বীপের আধার। ঐ শব্দগুলো হলো, দোহা, দোয়া, দিয়া, দা, দে, ডাঙ্গা, ঘোপ, ঘাটা, চর, কাটি, খাল, খালি, বিল, বিলা ইত্যাদি। এই সম্পর্কে নড়াইল জেলার কয়েকটি গ্রামের নাম উল্লেখ করা হলো, ভাটুদহ, নালিয়া, বলাডাঙ্গা, ঝামারঘোপ, দাশেরডাঙ্গা, নকখালি, চরবালিদিয়া, ধোপাদহ, চালিঘাট, সোনাদহ, শালিখদিয়া, দিয়াডাঙ্গা, মাছিমদিয়া, বড়দিয়া, পদ্মবিলা, কাউলিয়াডাঙ্গা, নারাণদিয়া, নলিয়ারচর, চরকান্দি, ডাকাতেরডাঙ্গা ইত্যাদি।

তবে নড়াইল জেলায় জনবসতি গড়ে ওঠার পূর্বে অঞ্চলটি সুপ্রাচীন কালকবনের অংশ ছিল। এই বিষয়ে ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হবে।

ভূমি গঠন

সমগ্র নড়াইল জেলাকে যদি উত্তর দক্ষিণে বিভক্ত করা যায় তা হলে, জেলার পশ্চিমাংশ পূর্বাংশ থেকে বেশ উঁচু। আর এজন্য দায়ী সুপ্রাচীন চিত্রা ও নবগঙ্গা নদীর সুপ্রচুর, পলি ফেলে যাওয়া। নবগঙ্গা নদী ও চিত্রা নদীর তীরগুলোই উঁচু শক্তভূমি দ্বারা সৃষ্ট। আর দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল বিশেষত কালিয়া উপজেলা ও সদর নড়াইল উপজেলার কিছু অংশ নিম্নভূমি দ্বারা গঠিত। বলা যায়, এই অঞ্চলের ভূমিগঠন প্রকৃতি সাথে মিলযুক্ত। নড়াইল জেলার নিম্নাঞ্চলের পলিমাটির গভীরতা অন্যান্য অঞ্চল হতে বেশি। সমগ্র জেলার মৃত্তিকার স্তরায়ন পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, উপরের স্তরে রয়েছে কাদা ও পলি মাটি। এছাড়া শুষ্ক বালুরাশি। এই স্তরের গভীরতা ৪০ ফুট হতে ১৫০ ফুট পর্যন্ত। এর পরের স্তরে রয়েছে শুষ্ক বালুর সাথে মধ্যমাকৃতির ও অপেক্ষাকৃত মোটা বালু। উপজেলার সমতল ভূমি গঠনে নবগঙ্গা, মধুমতি, চিত্রা, কালীগঙ্গা, নলিয়া ও কাজলা নদীর অবদান স্মরণীয়।[১৩]

মৃত্তিকা

পদ্মার দুই শাখা নদী নবগঙ্গা ও মধুমতি এবং উপশাখা চিত্রা নদীর বয়ে আনা হিমালয়ের পলল দ্বারা নড়াইল জেলার মৃত্তিকা গঠিত। এই মৃত্তিকার উপরের স্তর মোটা বালুকণা দ্বারা গঠিত। মৃত্তিকার গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বিচারে জেলার মৃত্তিকাকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায় : (১) প্লাবনভূমির চূণযুক্ত ধূসর মৃত্তিকা যা নদীর অববাহিকা অঞ্চল ও নিচু অঞ্চল ছাড়া সর্বত্র দেখা যায় (২) মধ্যমাকৃতির শ্বেত বালুকাময় মৃত্তিকা যা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে দৃষ্ট হয় (৩) পিটমৃত্তিকা যা জেলার নিচু অঞ্চলসমূহে পাওয়া যায়।[১৪]

জলবায়ু

নড়াইল জেলার জলবায়ু সমভাবাপন্ন। এখানকার শীতকাল শুষ্ক ও আবামপ্রদ এবং গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আর্দ্র ভাবাপন্ন। গ্রীষ্মকালে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে জেলায় সর্বাধিক আর্দ্রতা দেখা যায়। এবং প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। শীতকালে উত্তরে বায়ুর প্রভাবে জেলায় কোনো বৃষ্টিপাত হয় না বলা চলে। কোনো কোনো বছর অবশ্য নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বৃষ্টিপাত হতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে প্রচুর বারিপাত হতে দেখা যায়। যা কৃষিকাজের জন্য খুব সহায়ক ভূমিকা রাখে।[১৫]

তাপমাত্রা

নড়াইল জেলার গড়তাপ মাত্রা ৮৮.০৩° ফারেনহাইট। এবং গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬৮.৮৯° ফারেনহাইট। জেলায় প্রচণ্ড গরম কিংবা প্রচণ্ড শীত অনুভূত হয় না।[১৬]

আর্দ্রতা

নড়াইল জেলার জলীয় বাষ্পের গড় আর্দ্রতা ৭৮%। মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত সর্বাধিক আর্দ্রতা পরিলক্ষিত হয়।[১৭]

বৃষ্টিপাত

সারা বাংলাদেশের ন্যায় নড়াইল জেলায়ও মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। জুন মাসেই সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। আর ডিসেম্বর মাসে সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। নড়াইল জেলায় বছরে ৯৬.৫৬ ও সর্বনিম্ন ২৮.৫৯ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হতে দেখা যায়।[১৮] অবশ্য কোনো কোনো বছর ব্যতিক্রমও হতে দেখা যায়।

বৃক্ষলতা ও ফসলাদি

নড়াইল জেলার বিল অঞ্চলে বা নিম্নাঞ্চলে হিজলগাছ ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না। তবে মজে যাওয়া জলাশয়ে মাঝে মধ্যে 'বজ'-এর গাছ দেখা যায়। পূর্বে এখানে বাদা বন অবস্থানের সময় প্রচুর পরিমাণে সুন্দরি ও অন্যান্য বৃক্ষ জন্মাতো। জেলার বিভিন্ন স্থানে দিঘি ও ইঁদারা খননের সময় প্রাচীনকালের সুন্দরি বৃক্ষ পাওয়া যায়। নড়াইল জেলার ফলবান বৃক্ষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, নারিকেল, সুপারি, তাল, খেঁজুর, আম, কাঁঠাল, লিচু, জামরুল, বরই, টেপাকুল, পেয়ারা, গোলাপজাম, কালোজাম, বেল, তেঁতুল, চালিতা, লেবু, জিনকলা, দয়াকলা, চাপাকলা, সবরিকলা, চিনিচাপাকলা, কাবুলিকলা, ডালিম, আতা, নোনাফল ইত্যাদি।

জ্বালানি কাঠ ও আসবাবপত্র তৈরির জন্য নড়াইল জেলায় যে-সমস্ত বৃক্ষরাজি পাওয়া যায় তা হলো, অশত্থ, বটপাকুড়, কদম্ব, অর্জুন, শিরিষ, বাবলা, কালোবাবলা, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, তমাল, বকুল, শড়া, উড়িআম, উড়িজাম, শিমূল, রয়না, ছাতিম, জিওল, বেত, ভালুকাবাঁশ, জাবাবাঁশ, তল্লাবাঁশ ইত্যাদি।

ঘর-গৃহ

স্মরণাতীত কাল থেকে নড়াইল জেলার অধিবাসীরা কাঁচাঘরে বাস করতে অভ্যস্ত। সুন্দরবন হতে আনা গরানের কচা ও স্বল্পমূল্যে গোলের পাতা ক্রয় করে লোকেরা বাসগৃহ তৈরি করতো। আর যারা কচা ও গোলপাতা ক্রয়ে সমর্থ হতো না তারা বাঁশ, বেত ও শণ বা ছন দিয়ে বাংলাঘর তৈরি করতো। ছন দিয়ে কখনো কখনো বড়ো চারচালা গৃহ তৈরিও করতে দেখা যায়। তবে মুঘল আমলেও ভারতবর্ষের অন্যান্য এলাকার ন্যায় নড়াইল এলাকায় আমদানিজাত বিদেশী টিন[১৯] যেমন আসতো তেমনি টিনের দ্বারা ঘরবাড়ি নির্মাণের প্রবণতাও সেই সময়কার নড়াইল এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।[২০] সেই যুগে টিনের ঘর তৈরি হতো মূল্যবান কাঠ সহযোগে। সুন্দরবনের কাঠ সংরক্ষণের নিয়ম চালু হওয়ায় নড়াইল জেলায় সুন্দরিকচা কাঠের নির্মিত ঘর তৈরি করতে খুব একটা দেখা যায় না। এখন ছন, বাঁশ, কাঠ, টিন, ইট, চুন, সুরকি দ্বারা আধা কাঁচা ও আধা পাকা বাড়ি এবং ইমারত নির্মাণের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ অনুভব করা যায়। বর্তমানকালে ও পূর্বে টালির ঘর নির্মাণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকালের স্থানীয় জমিদার ও প্রশাসকেরা পাকা ইমারত তৈরি করতেন। নড়াইল জেলার সুপ্রাচীন ইমারতের মধ্যে সুলতানি আমলে নির্মিত ইমারত, দরবারগৃহ, বাসগৃহের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমান সরকারি পাকা ভবন ছাড়াও সম্পদশালী লোকেরা পাকা ঘর ও ইমারত তৈরি করছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. শতাব্দীর সাক্ষী (১৮৮৬-১৯৮৬), প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, ১৯৮৪, পৃ. ৩
২. শতাব্দীর সাক্ষী (১৮৮৬-১৯৮৬), প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, ১৯৮৪, পৃ. ৩
৩. স্মৃতির অলিন্দে শিল্পীসুলতান, মহসিন হোসাইন, ১৯৯৭, পৃ. ৪৭
৪. নড়াইলকে জানুন মুঃ মমতাজুর রহমান, ১৯৮১ পৃ. ৮
৫. Sensus Report on Jessore 1970
৬. যশোরাদ্যদেশ, হোসেনউদ্দিন হোসেন, পৃ. ১
৭. কালিয়া উপজেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মহসিন হোসাইন ১৯৮১ পৃ. ৯
৮. কালিয়া উপজেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ১৯৮৭ পৃ. ১৩
৯. যশোরাদ্যদেশ, হোসেনউদ্দিন হোসেন ১৯৭০ পৃ. ২
১০. যশোরাদ্যদেশ এবং যশোর-খুলনার ইতিহাস, ১৯৭০
১১. মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস : কালিয়া উপজেলা, মহসিন হোসাইন, ১৯৮৫-পৃ. ১
১২. যশোহর-খুলনার ইতিহাস, সতীশচন্দ্র মিত্র, পৃ. ৪৭
১৩. বাংলাদেশ গেজেটিয়ার, যশোর, ১৯৭৪, পৃ. ৯
১৪. বাংলাদেশ গেজেটিয়ার, যশোর, ১৯৭৪, পৃ. ৯
১৫. বাংলাদেশ গেজেটিয়ার, যশোর, ১৯৭৪, পৃ. ১০
১৬. বাংলাদেশ গেজেটিয়ার, যশোর, ১৯৭৪, পৃ. ১০
১৭. বাংলাদেশ গেজেটিয়ার, যশোর, ১৯৭৪, পৃ. ১১
১৮. বাংলাদেশ গেজেটিয়ার, যশোর, ১৯৭৪, পৃ. ১১
১৯. প্রাক-পলাশী বাংলা, সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৪, পৃ. ৫১
২০. নড়াইল জেলার কালিয়া থানার কলাবাড়িয়া গ্রামের জমিদার মুহম্মদ জকি মোল্লার পুত্র মুহম্মদ গগন মোল্লার একখানি প্রাচীন টিনের সুদৃশ্য ঘর ছিল। কালের সমস্ত আগ্রাসন এড়িয়ে ঐ ঘরের কিছু টিন আজো বিদ্যমান আছে।

নড়াইল জেলার প্রাণীকুল

নড়াইল সুপ্রাচীন 'কালক বন' বা প্রাচীন সুন্দরবনের অংশ বিশেষ। এই জেলায় মানব বসতি গড়ে ওঠার পূর্বে অসংখ্য শ্বাপদসংকুল অরণ্য ছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য অনেক প্রাণীই তাদের অস্তিত্ব হারিয়েছে। উল্লেখ্য গত একশত বছরের কম সময়ে সুন্দরবন এলাকা থেকে জলহস্তী বিলীন হয়েছে। নড়াইল জেলার বিভিন্ন পুকুর দিঘি খননকালে জলহস্তী বন্যমহিষ, হরিণ, বাঘ প্রভৃতি জীব-জানোয়ারের দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। প্রকৃতির নানা ঘাত-প্রতিঘাতে নড়াইল জেলার বন্যপ্রাণীকুলের অধিকাংশই অস্তিত্ব হারিয়েছে। বন্য প্রাণীদের এই ভাবে হারিয়ে যাওয়ার জন্য শুধু প্রকৃতিকেই দায়ী করা যায় না, অধিবাসীদের নিষ্ঠুরতা ও শিকার বিলাসিতা অনেকংশে দায়ি বলে মনে করা হয়। পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার জন্য যেমন অনেক প্রাণী হারিয়ে গিয়েছে তেমনি মানুষ হত্যা করেছে অনেক বন্যপ্রাণীকে। অবশ্য কিছু কিছু প্রাণীকে মানুষ নিজ স্বার্থের অনুকুলে গৃহপালিত জীব-জানোয়ারের মর্যাদা দিয়ে রক্ষা করে আসছে। আজকের গৃহপালিত জীব-জানোয়ার এক কালে ছিল বন্যপশু। নড়াইল জেলার বিভিন্ন জীব-জানোয়ার সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হবে।

জলজ প্রাণী

জলজপ্রাণী শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়। জলজপ্রাণীর মধ্যে মৎস্য ছাড়াও অন্যান্য প্রাণী অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এক সময় নড়াইল জেলা বিশেষত উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে বিচিত্র ও উপাদেয় মাছ পাওয়া যেতো প্রচুর পরিমাণে। নদী ও জলাশয়ের জলস্বল্পতার জন্য ধীরে ধীরে মৎস ও অন্যান্য প্রাণী দুর্লভ হয়ে উঠেছে। বিলুপ্ত ও লুপ্ত প্রায় নড়াইল জেলার জলজ প্রাণীসমূহ : ১. কুমির ২. কামট ৩. ভাসাল ৪. কচ্ছপ ৫. শোল ৬. বোয়াল ৭. রুই ৮. কাতল ৯. পুটি ১০. ট্যাংরা ১১. খলিসা ১২. সরপুটি ১৩. তিতপুটি ১৪. বিদেশী পুটি ১৫. চান্দা ১৬. রূপচান্দা ১৭. চেলা ১৮. চেলেন্দা ১৯. কই ২০. শিংগি ২১. চিংড়ি ২২. মাগুর ২৩. অষ্ট্রেলিয়ান মাগুর ২৪. টেপা ২৫. রয়না ২৬. বাঁশপাতা ২৭. বাইন ২৮. কুচে ২৯. ঘ্যানগেনে ৩০. ভেয়ট ৩১. চিতল ৩২. পাংগাস ৩৩. ঘাড়ো ৩৪. সিলভার কাপ ৩৫. তেলাপিয়া ৩৬. কারগো ৩৭. ইলিশ ৩৮. গলদা চিংড়ি ৩৯. বলুংগা মাছ ৪০. ঘুমো চিংড়ি ৪১. চুঁচড়ো ৪২. টাকি ৪৩. তারাবাইন ৪৪. আইড় ৪৫. ঠ্যানঠেনে ৪৬. বাউস ৪৭. কালিবাউস ৪৮. বায়োচ ৪৯. ফাতাসি ৫০. বেজো ট্যাংরা ৫১. মায়া ৫২. বজ্রমুড়ে ৫৩. রায়েক ৫৪. গাঙ্গখয়রা ৫৫. আমেরিকান রুই ৫৬. তেলাপোয়া ৫৭. বাটকে মাছ ৫৮. খরল্লা ৫৯. ক্যাল্লো ৬০. গুতে ৬১. তেলটাকি ৬২. ভাতোটাকি ৬৩. বেলেটাকি ৬৪. গজাল ৬৫. ফ্যাসসে ৬৬. নায়লোটিকা ৬৭. বাগদা চিংড়ি ৬৮. বেঙ ৬৯. কাঁকড়া ৭০. শিশক ৭১. সাপ ৭২. ভোদড় ইত্যাদি।[১]

আকাশচারী প্রাণী বা পাখি

নড়াইল জেলা এক সময় গভীর অরণ্যবেষ্টিত ছিল। প্রায় ৩০/৩১ বছর পূর্ব থেকে অনবরত বৃক্ষাদি কর্তনের ফলে বিভিন্ন প্রাণী ও পাখিদের অভয়নিবাস প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। কোনো কোনো পাখি চিরকালের জন্য তাদের আবাস হারিয়ে চলে গিয়েছে দেশান্তরে। তবে আশার কথা হলো, প্রায় ১৫ বছর আগে জেলার সচেতন অধিবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপন করতে শুরু করেছে। ঐ সব বৃক্ষাদি এখন সবুজ ঘন বন তৈরি করে পরিবেশকে যেমন সুন্দর করেছে তেমনি পাখিদের আবাস ভূমি হিসেবে নড়াইল জেলা আবারো কলমুখরিত হয়ে উঠেছে। আবারো বিচিত্র সব পাখপাখালি নড়াইলের সবুজ বৃক্ষলতাকে আশ্রয় করে খেলা করছে। নড়াইল জেলার বিভিন্ন বনবাদাড়ে অনুসন্ধান করে যে সব আকাশচারী প্রাণী বা পাখির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সে সব হলো :

১. মাছাল ২. মাছরাঙা ৩. চাতক ৪. কাদাখোঁচা ৫. বালিহাঁস ৬. লালচিল ৭. শংখচিল ৮. গাঙ্গচিল ৯. কুচিবক ১০. গোবক ১১. দাঁড়কাক ১২. ঢালিবক ১৩. কানাবক ১৪. পাতিবক ১৫. নলঘোগা ১৬. হটটিটু ১৭. দুধরাজ ১৮. রক্তরাজ ১৯. ভীমরাজ ২০ চড়ুই ২১. ফেচো ২২. দোয়েল ২৩. শ্যামা ২৪. কোকিল ২৫. টিয়া ২৬. টুনটুনি ২৭. দুর্গাটুনি ২৮. তুলোটুনি ২৯. বাঁদুড় ৩০ ক্যাচকেচে (সাত ভায়রা) ৩১. বাঁশশালিক ৩২. গোশালিক ৩৩. গাঙ্গশালিক ৩৪. গাছঠোকরা ৩৫. বনটিয়া ৩৬. তেলিঘুঘু ৩৭. বনঘুঘু ৩৮. ন্যালোঘুঘু ৩৯. হড়িয়াল ৪০. হলুদপাখি ৪১. ঝুটকুলি ৪২. বুলবুলি ৪৩. সুইগুদে ৪৪. হাড়গিলে ৪৫. শামুকখোলা ৪৬. নলডোঙ্গা ৪৭. পানকৌড়ি ৪৮. ডাহুক ৪৯. বিলবিলে ৫০. কোড়া ৫১. মনদটেক ৫২. চামচিকে ৫৩. চেগা ৫৪. বালিহাঁস ৫৫. পেঁচা ৫৬. লক্ষীপেঁচা ৫৭. রাজলক্ষীপেঁচা ৫৮. শুকপাখি ৫৯. কানাকুয়ো ৬০. হলদেপাখি ৬১. নীলকণ্ঠ ৬২. দাঁড়কাক ৬৩. পাতিকাক ৬৪. বনটিয়া ৬৫. কাঠঠোকরা ৬৬. বাবুই ৬৭. ধনেশ ৬৮. পাপিয়া ৬৯. চাতক ৭০. ফিংগে ৭১. বউ কথা কও ৭২. সারস বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২]

হিংস্র জানোয়ার ও অন্যান্য প্রাণী

আগেই বলেছি নড়াইল জেলার সেই পুরাতন বন-বাদাড় আর নেই। যে কারণে আগের বন্য জীব-জানোয়ার অনেক বিলুপ্ত হয়েছে। আবার কিছু ছোট প্রাণী কোনো ভাবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। এবার নড়াইল জেলার বিগত ও বর্তমান কালের হিংস্র জানোয়ার ও জন্তুর নাম উল্লেখ করা হলো :

১. রয়েল বেঙ্গল টাইগার ২. মেছোবাঘ ৩. বুনোশূকর ৪. বুনোমহিষ ৫. হরিণ ৬. বানর ৭ সজারু ৮. বনবিড়াল ৯. বাঘদাসা ১০. শিয়াল ১১. খেঁকশিয়াল ১২. বেজি ১৩. গুইসাপ ১৪. রামগদি ১৫. কাঠবিড়াল ১৬. চিয়া ১৭. ছুঁচো ১৮. খরগোশ ১৯. ছাগুলে খরগোস ২০. খাটাস ২১. কল্লাস ২২. ইঁদুর ২৩. সারেল প্রভৃতি।[৩]

এখানে উল্লেখ করা ভালো যে, রয়েল বেঙ্গল টাইগার কয়েক যুগ আগেও জেলার কয়েকটি স্থানে শীতকালে অবস্থান করতো। এখন সেইসব স্থান বা জঙ্গল নিশ্চিহ্ন হওয়ায় নড়াইল জেলার কোথাও আর রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আনাগোনা দেখা যায়

না। ২০০৬ সালে নড়াইল শহরের ৩ মাইল উত্তরে একটি চিতাবাঘ গ্রামবাসীর প্রহারে প্রাণ হারায়। এ ছাড়া বুনো শূকর, বুনোমহিষ তিন যুগ আগেও নড়াইলের কোনো কোনো জঙ্গলে দেখা যেতো। এখন ঐ প্রাণীগুলো বিলুপ্ত হয়েছে। হরিণ ও বানর এক সময় এই এলাকায় প্রচুর ছিল এখন নেই। তবে জেলার অসংখ্য পুকুর খননের কালে হরিণ বানর এমনকি গণ্ডারের হাড়ের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই ভাবে প্রমাণ করা যায় প্রাচীন সুন্দরবনের অংশ হিসেবে নড়াইল জেলার প্রাচীন ভূমিতে হরিণ, বানর, গণ্ডারসহ অনেক অনেক হিংস্র জীবজানোয়ার বর্তমান ছিল।

সর্প

নড়াইল জেলার বিভিন্ন এলাকায় এক সময় অসংখ্য প্রজাতির নির্বিষ ও বিষধর সাপ দেখা যেতো। এই জেলার সর্পের সংখ্যা কম হলেও বর্ষাকালে এখানে বিভিন্ন গ্রামে সর্পাঘাতে মানুষের মৃত্যু হতে দেখা যায়। নানা ভাবে অনুসন্ধান করে নড়াইল জেলায় যে সব সাপের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে তা উল্লেখ করা হলো :

১. কালকেউটা ২. আলকেউটা ৩. গোখুরা ৪. আইরাজ ৫. বোড়াসাপ ৬. পদ্মকেউটা ৭. বাঁশবুনে ৮. কালিগোখরা ৯. পদ্মগোখরা ১০. দুধরাজ ১১. মণিরাজ ১২. ভীমরাজ ১৩. শংখচূড় ১৪. দাঁড়াস ১৫. ধোড়া ১৬. ঘরমণি ১৭. মেটেসাপ ১৮. ময়াল ১৯. তক্‌তি ২০. শানিসাপ ২১. চন্দ্রবোড়া ২২. বিঘাতেবোড়া ২৩. কালনাগিনী ২৪. বংকরাজ ২৫. বাঁকাল ২৬. সুতো সঞ্চার ইত্যাদি।[৪]

এছাড়া ভিন্ন ভিন্ন জাতের সর্পের সঙ্গমে জন্ম নেয় শংকর বা দোরোখা সাপ। এদের বিভিন্ন আকৃতিতে দেখা যায়। কিন্তু তাদের নামকরণ হয় নি।

গৃহপালিত প্রাণী

নড়াইল জেলার গৃহপালিত প্রাণী গুলো হলো :

১. গরু ২. ছাগল ৩. ভেড়া ৪. ঘোড়া ৫. মহিষ ৬. বিড়াল ৭. কুকুর ৮. বেজি ৯. ময়না ১০. টিয়া ১১. ঘুঘু ১২. ডাহুক ১৩. কোড়া ১৪. শালিক ইত্যাদি।

শিকার ও শিকারি

নড়াইল জেলা সুন্দরবনের অংশ বলে এক সময় এখানে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, মেছোবাঘ, বুনোশূকর, বুনোমহিষ, হরিণ, কুমির, ভাসাল, কামট প্রচুর দেখা যেতো। প্রায় আড়াই যুগ আগেও বাঘ, বুনোশুকর, কুমির কামট ও সাপের ভয়ে মানুষ ভয়ার্ত ছিল। এ ছাড়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় বড়ো বড়ো অজগরের সন্ধান মিলতো। অজগর যে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়েছে তা বলা যায় না।

নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানার রামপুরের গুইয়ের পুকুরের পাড়ে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আনাগোনা ছিল।[৫] ১৯৬৩ সালে লোহাগড়া গ্রামের বুনোসরদার সুধীর একই সময়ে দুটো বড়ো বাঘকে গুলি করে হত্যা করে।[৬]

প্রায় ৩০ বছর আগে নবগঙ্গা নদীর মল্লিকপুরের কোণা থেকে একটি কুমির চুপি চুপি ভেসে গিয়ে ঐ গ্রামেরই এক কুমারী হিন্দু মেয়েকে ধরে নিয়ে যায়। নবগঙ্গা ও মধুমতি নদীতে ৪৫ বছর আগেও প্রচুর কুমির বাস করতো। এছাড়া চিত্রা, নলিয়া ও

নড়াগাতি কাটাখালেও মাঝে মাঝে কুমির কামট আসতো এবং সুযোগ মতো মানুষকে ধরে খেতো।

১৯৭০ সালেও লোহাগড়া থানার বারোইপাড়া, মুচিখোলা, নলদি, জালালসির জঙ্গল এলাকায় বাঘও শূকর দিনেরাতে সমানে বিচরণ করতো।[৭] ঐ সময় গাছবাড়িয়া গ্রামের রজনীকান্ত সরদারকে হিংস্র শূকর বুক ফেড়ে মেরে ফেলে।

চিতাবাঘও এক সময় লোহাগড়া থানার বিভিন্ন জঙ্গলে বাস করতো বলে জোর কিংবদন্তি আছে। ১৯৩৫ সালের দিকে জালালসি গ্রামের তকি মাহমুদের গাভীর বাছুর বাঘে আক্রমণ করলে তকি মাহমুদের স্ত্রী কুড়াল দ্বারা বাঘটিকে আঘাত করে বাছুরটিকে উদ্ধার করে।

১৯৭০ সালে লোহাগড়া থানার নলদি গ্রামের নির্মল বাবুর মেথর রামপালকে বাঘে থাবা মারলে রামপাল আহত হয় এবং কোনো ভাবে জীবনে বেঁচে যায়।

১৮৪৬ সালে লোহাগড়া থানার গাঘা গ্রামের পূর্ব পার্শ্বে একটি পুকুরের পাড়ে বাঘের আড্ডা ছিল। বাঘ ঐ সময় গোয়াল থেকে গবাদি পশু ধরে নিয়ে আহার করতো। ঐ সময় লোহাগড়া থানার বিখ্যাত শিকারি ইতনার লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য গাঘার উক্ত স্থান থেকে একটি বাঘ শিকার করেন। ঐ সময় লোহাগড়া থানার কোটাকোল, চরকোটাকোল, মাইগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে বাঘের অত্যাচার ছিল মারাত্মক রকমের।

কুমির ও কামটের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নড়াইল জেলার নবগঙ্গা ও মধুমতি তীরের ভয়ার্ত মানুষেরা গোসল করার ঘাটে বড় বড় বাঁশের খোয়াড় নির্মাণ করে রাখতো। এমনও দেখা গিয়েছে, কুমির নদীর তীর-ভূমিতে উঠে খোয়াড়ের মধ্যে চুপচাপ অবস্থান করতো। আর ঐ সময় খোয়াড়ের মধ্যে মানুষ গেলে কুমির তাকে নিয়ে ছুটে যেতো নদীর পানিতে।[৮] কুমিরের দাঁত নেই তাই মরা কিংবা তাজা মানুষের দেহকে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে খণ্ড করে আহার করতো। সাধারণত নদীর মাঝখানে চরে কুমির শিকারকরা ব্যক্তির লাশ তার আপনজনদের দৃষ্টিসীমায় ভক্ষণ করতো। এমন মর্মান্তিক ঘটনা এই অঞ্চলে বহুবার ঘটেছে। কচুবাড়িয়া গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র পালের মা, কালীপদ দাসের পিসি ও যাদবচন্দ্র দাসের স্ত্রীকে আনুমানিক ১৯৪৬ সালের দিকে নবগঙ্গা নদীর তীর থেকে কুমির ধরে নিয়ে যায়। একই গ্রামের ভোলানাথ সমাদ্দারকে কুমিরে দারুণভাবে আহত করে আর তাতেই তার মৃত্যু ঘটে।

লোহাগড়া থানার বিনোদপুর গ্রামের ক্ষুদিরাম দাস আনুমানিক ১৯৫৮ সনে যখন রাতের বেলায় ধানের মলন মলতে থাকে তখন মলনের পাশে শুয়ে থাকা একটি কুকুরকে চিতাভাগ আক্রমণ করে। ক্ষুদিরাম হাতের নাড়াল দিয়ে বাঘটিকে পিটিয়ে গৃহপালিত কুকুরটির জীবন রক্ষা করে।

এক সময় লোহাগড়া থানার লক্ষ্মীপাশা, রামপুর, কচুবাড়িয়া, কাশীপুর প্রভৃতি এলাকায় ঝাঁকে ঝাঁকে বন্য শূকর বিচরণ করতো। ১৯৬৪/১৯৬৫ সালেও ঐ এলাকায় বন্য শূকর দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হতো। এলাকার বাগদি বুনো ও চণ্ডাল সম্প্রদায়ের লোকেরা জাল পেতে, বর্শার আঘাতে ও গুলি করে শূকর শিকার করতো। বুনোদের মধ্যে সুধীর সরদার ছিল পাকা শিকারি, সে বর্শা ও বন্দুক দ্বারা বন্য শূকর শিকার করতো।[৯]

লোহাগড়া থানার কুমড়ি গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বের ডাঙ্গার পানিতে ১৯৬৯ সালে একটি বাচ্চা কুমির কৃষকদের হাতে প্রাণ হারায়। কুমড়ির ডাঙ্গা অনাবাদী ও নলখাগড়ায় পূর্ণ ছিল। এখানে সাপ গিসগিস করতো। ১৯৬৮ সালে ডাঙ্গার ঝোপ হতে কৃষকেরা এমন সাপ হত্যা করেছে যার ওজন ছিল এক মণ হতে দেড় মণ।[১০] ১৯৭০ সালে বুনো সরদার সুধীর প্রায় দুই মণ ওজনের একটি বিশালাকৃতির অজগর গুলি করে হত্যা করে। ঐ অজগরটি জনসাধারণের লাঠির আঘাতে একটি অক্ষত খরগোশ পেট হতে উগরিয়ে দেয়।[১১]

কোনো এক সময় লোহাগড়া থানার আমডাঙ্গা অঞ্চলের গভীর জঙ্গলে বেশ কিছু বুনো মহিষ বাস করতো। দলে দলে বুনো মহিষ কৃষকের ফসল নষ্ট করতো। আমডাঙ্গা গ্রামের দুঃসাহসিক বীরনীলবিদ্রোহী চৌধুরী মাহমুদ গ্রামবাসীর অনুরোধে ও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বুনোমহিষ তাড়িয়ে দিতেন। চৌধুরী মাহমুদ বুনোমহিষ তাড়িয়ে প্রমত্তা মধুমতি নদী পার করে দিতেন। এই শতাব্দীর ত্রিশের দশকেও নড়াইল জেলার কয়েকটি অঞ্চলে বুনোমহিষের পাল অবস্থান করতো।[১২]

অনুমান ১৯৪৯ সালে লোহাগড়া থানার বারোইপাড়া গ্রামের আবদুল মোল্যার একটি ছাগলকে বাঘে ভক্ষণ করে। বারোইপাড়া, নলদি, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, রায়গ্রাম, কলাগাছি প্রভৃতি এলাকায় লোকেরা বাঘের ভয়ে শীতকালের রাতে নিয়মিত কাঁসার থালাবাটি বাজাতো।[১৩]

আনুমানিক ১৯৬৪/১৯৬৫ সালে ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রামের নবগঙ্গা নদীর ঘাটে বাঘ নুরুন্নবীর কাকি মাকে কামড়ে আহত করে।

লোহাগড়া গ্রামের বুনো সম্প্রদায়ের সীতানাথ, তৎপুত্র পঞ্চানন ও তৎপুত্র সুধীর সরদার (৭২) পুরুষানুক্রমে শিকারি ছিল। তারা নড়াইল থানা ও ফরিদপুর এলাকা হতে হাজার হাজার বাঘ, কুমির, শূকর, বাঘদাসা, খরগোস, অজগর প্রভৃতি হত্যা করেছিল। পঞ্চানন সরদার প্রায় সাড়ে চার মণ ওজনের একটি বন্য শূকর খালিহাতে এক পা ধরে উঁচু করে রেখেছিল। পঞ্চাননকে ইংরেজ সরকার তার বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে একটি দোনালা বন্দুক উপহার দেয়। পৈত্রিকসূত্রে সুধীর সেই বন্দুকটি ব্যবহার করার সুযোগ পায়।[১৪]

এখন যে স্থানে লোহাগড়া ইউনিয়ন পরিষদ অফিস এক সময় ঐ স্থানে ছিল গভীর জঙ্গল। স্থানটির নাম ছিল মালির ভিটে। আজ থেকে ৩৫ বছর আগে ঐ স্থানে কেউ সাপের ভয়ে যাতায়াত করতো না। সুধীর সরদার ঐ স্থানকে সাপ ও অন্যান্য জীব-জানোয়ার মুক্ত করেছিল। লোহাগড়ার জেমিবাগান থেকে সুধীর সরদার ১৯৬৬ সালে ২টা ও অন্য সময়ে ১টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার বন্দুক দিয়ে শিকার করেছিল।[১৫]

এক সময় লোহাগড়া থানার লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য ও কাশিয়ানির বিখ্যাত শিকারি অক্ষয় সেন নড়াইল জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর বাঘ, কুমির, শূকর ও অজগর হত্যা করে।

১৯৪৮ সালের দিকে নড়াইল সদর থানার বেতবাড়িয়া গ্রামের কলের ভিটের পুকুর পাড়ে বাঘ থাকতো। কুড়িগ্রামের নিশি সরকার ঐ স্থানে বাঘ শিকার করতে যায়। নিশি সরকার বন্দুকের গুলি করলে বাঘ পালিয়ে যায়। পরদিন ঐ স্থানে নড়াইলের খগেন ডাক্তার একটি বাঘকে গুলি করে এবং বাঘটি মারা যায়। এর আগে ঐ স্থান থেকে

বেতবাড়িয়ার বিশ্বনাথ সাহার ডান বুকের মাংস ছিড়ে নিয়ে যায়।[১৬]

নড়াইলের চিত্রা নদীর তীরে স্বপন ভট্টাচার্য (১৬) বাঘের কামড়ে দারুণভাবে আহত হয়। এটা ১৯৬৭ সালের ঘটনা। নড়াইল সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেওয়ার পথেই স্বপন ভট্টাচার্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়।[১৭]

নড়াইল থানার সীমাখালি গ্রামের মমিন সরদার একজন পাকা শিকারি ছিলেন। তিনি বন্দুকের সাহায্যে অনেক বাঘ, শূকর ও খরগোস শিকার করেছেন। ঐ এলাকার পংকবিলা বিল হতে মমিন সরদার বাঘ শিকার করেছেন। ১৮৪১ সালে পংকবিলা গ্রামের আঃ সামাদ বাঘের দ্বারা মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন।

আনুমানিক ১৯৪২ সালের ঘটনা। নড়াইল থানার জুড়ুলিয়া গ্রামের আবদুর রাসেদ মোল্লা বাঘের থাবায় আহত হয়ে চিৎকার করতে থাকলে নবেদ মোল্লা লাঠি নিয়ে এগিয়ে আসে। এবং লাঠি দ্বারা বাঘের মাথায় জোরে আঘাত করলে বাঘ রাসেদকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। নড়াইল থানার সরসপুর নামক স্থানে হাটের পার্শ্বে দিনের বেলায় বাঘের মারাত্মক আনাগোনা ছিল মাত্র ৩ দশক আগেই।[১৮]

১৯৫৬ সালে তুলারামপুর বাজারের কাছে কাজলা নদীতে বিশাল আকারের দুটো কুমির ভাসতে দেখা যায়। কুমির দুটিকে নড়াইলের এসডিপিও তুলারামপুর ডাকবাংলার তত্ত্বাবধায়ক তোফাজ্জলের সহযোগিতায় কয়েকবার গুলি করেন। কিন্তু কোনোভাবেই ঐ বিশালাকৃতির কুমিরটিকে মারা যায়নি।[১৯]

আনুমানিক ১৯৪৭ সালে নূর আকবর (৭০) ও মমিনউদ্দিন দলিজাতপুর গ্রামে বাঘ শিকার করতে যান। দলিজাতপুর গ্রামের হাতেম মোল্যার কুকুরকে নেকড়ে বাঘ আহত করলে বাঘ মারা অভিযান শুরু হয়। অভিযানে মমিনউদ্দিনের বন্দুকের গুলির আঘাতে একটি চিতাবাঘ নিহত হয়। ঐ দিন দলিজাতপুরের শিবঠাকুর বাঘের থাবায় আহত হয়। বাঘ শিকারের জন্য এসডিও সাহেব শিকারি মমিনউদ্দিনকে পুরস্কৃত করেন।[২০]

নড়াইলের তেভাগা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা নূর আকবর বাঘ শিকারি ছিলেন; তরুণ বয়সে যেখানে বাঘের উপদ্রব হতো নূর আকবর ছুটে যেতেন সেখানে। ১৯৪৭ সালের শেষদিকে নড়াইলের রঘুনাথপুর গ্রামের জনৈক উপেনকে বাঘে থাবা মেরে আহত করলে নূর আকবর সেখানে ছুটে যান। কিন্তু তার উপস্থিত হওয়ার আগেই বাঘটি পালিয়ে যায়। রঘুনাথপুরে নূর আকবর চাং বেঁধে বাঘ শিকারের চেষ্টা করেছিলেন। একবার ঘোড়াখালির নীলকুঠিতেও তিনি বাঘ শিকার করতে গিয়েছিলেন। নড়াইল গ্রামের খগেন ডাক্তার ও নড়াইলের জমিদার প্রদ্যোৎ রায় বিশিষ্ট বাঘ শিকারি ছিলেন।

১৮৭৫ সালে কোলকাতার পার্শিবাগানে হিন্দু মেলায় দুঃসাহসিক শিকারি হিসেবে নড়াইলের তৎকালীন জমিদার রাইচরণ রায় পুরস্কৃত হন। ঐ মেলার উদ্বোধন করেছিলেন শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ দেব।[২১] রাইচরণ রায়ের ৩ পুত্র শ্রীপতি রায়, রণপতি রায় ও মনিন্দ্রনাথ রায় বড়ো শিকারি ছিলেন। একবার একটি বাঘ একটি ছাগল নিয়ে নড়াইলের ভওয়াখালি বাগানে পালিয়ে গেলে শিকারি মনীন্দ্র রায় বাঘসহ ছাগলটি জাপটে ধরে আনতে সক্ষম হন।[২২] ১৯৩৮ সালে মনীন্দ্র রায় ও লালু রায় ভওয়াখালির জঙ্গল থেকে বন্দুকের সাহায্যে বাঘ শিকার করেন।

নড়াইল থানার ডুমুরতলা গ্রামে ১৯৪৫ সালে মজিদ শেখ ও ১৯৪৬ সালে আমির হোসেন শেখকে বাঘে থাবা মেরে পালিয়ে যায়।

নড়াইল জেলায় বাঘ শিকারের আরেকটি অভিনব কায়দা প্রয়োগ হতো। বাঘ বাঁধানো হতো খোয়াড়ের সাহায্যে ও ইদুর বাঁধানো বড়ো যন্ত্রের সাহায্যে। খোয়াড়ের মধ্যে ছাগলের বাচ্চা বেঁধে রাখলে গভীর জঙ্গলে ছাগলটি যখন ভয়ে ডাকাডাকি করতো তখন রয়েল বেঙ্গল কিংবা চিতাবাঘ ছাগল আহারের লোভে খোয়াড়ে ঢুকে পড়তো। পরে শিকারিরা সকাল বেলায় বাঘটিকে নৃশংসভাবে হত্যা করতো। নড়াইল থানায় এই ধরনের বাঘ বাঁধানো ফাঁদের বেশ প্রচলন ছিল। ১৯৫০/১৯৫১ সাল পর্যন্ত নড়াইলে ফাঁদের সাহায্যে একশত বাঘ মারা হয়েছে।[২৩] নড়াইল থানার রঘুনাথপুর, আউড়িয়া, বারোইপাড়া, হোগলাডাঙ্গা, দৌলতপুর, হাটভিটা প্রভৃতি গ্রামে বাঘমারা ফাঁদ পাতা হতো। বারোইপাড়ার মতিসরদার, চানমল্লিক, আবু শিকদার বাঘ ধরা ফাঁদের সাহায্যে বাঘ হত্যা করেছেন।

১৯৪৮ সালের ঘটনা। নড়াইল থানার মাইচপাড়া নিবাসী হরিশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের একটি গরুর বাছুরকে বাঘে আক্রমণ করে। হরিশচন্দ্র রামদা নিয়ে বাঘকে আক্রমণ করেন। এক পর্যায়ে বাঘের সাথে হরিশের মল্লযুদ্ধ শুরু হয়। ইতোমধ্যে হরিশের খুড়তুত ভাই সেন্টু বন্দুকের গুলিতে বাঘটিতে হত্যা করেন।[২৪] মাইচপাড়া-দৌলতপুরের খোশদেল কবিরাজ নামের এক ব্যক্তি ফাঁদ পেতে বাঘ শিকার করতো। এবং বাঘের চামড়া বিক্রি করতো।

নড়াইল থানার আউড়িয়া গ্রামের কিরণচন্দ্র ঘোষ ছিলেন বিশিষ্ট শিকারি। কিরণ ঘোষের সহযোগী শিকারি ছিলেন ইব্রাহিম মোল্যা। কিরণবাবু চামড়ার পোষাক পরে শিকার করতে বের হতেন। তিনি অনেক বাঘ, শূকর অজগর ও খরগোশ শিকার করেছেন। এক সময় একটি বাঘের থাবায় কিরণ ঘোষের ডান হাতটি অকেজো হয়ে যায়।

১৯৪৫ সালে হাটবাড়িয়া জমিদার বাড়ির কাছে আবদুল গফুর মোল্যার একটি বড়ো গরু বাঘ খেয়ে ফেলে। এরপর শিকারি খগেন ডাক্তার ও উজিরপুর গ্রামের হরিপদ লোকজন নিয়ে জঙ্গল ঘিরে হিংস্র রয়েল বেঙ্গল টাইগারটিকে গুলি করেন। পরে ঐ বাঘটি গোপীকান্তপুরের জঙ্গলে গিয়ে মারা যায়।[২৫]

আউড়িয়া গ্রামের হরিপদ বোস ছিলেন বিখ্যাত বাঘ শিকারি ১৯৪৮ সালে আউড়িয়া গ্রামের দুটি লোক বাঘের আহারে পরিণত হয়। হরিপদ ঐ হিংস্র মানুষখোকো বাঘটিকে বন্দুকের গুলিতে হত্যা করেন। হরিপদ জীবনে অনেক বাঘ শিকার করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি বাঘের থাবায়ই জীবন হারিয়ে ছিলেন। আউলিয়ার জঙ্গলে এক সময় বাঘ ছাড়াও বন্য শূকর ও বিশাল অজগর বাস করতো। সীমাখালির বিখ্যাত শিকারি মমিন একবার আউড়িয়ার জঙ্গলে শিকার করতে গেলে হিংস্র শূকর তাকে আক্রমণ করে। সাহসী শিকারি মমিন শূকরের আক্রমণ ঠেকিয়েছিলেন বন্দুকের বাটের সাহায্যে। রায়-পুর গ্রামের চাঁদমির ও ডাক্তার খগেন বিশ্বাস দুঃসাহসিক শিকারের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি করে বন্দুক পুরস্কার পেয়েছিলেন। কুড়িগ্রামের শরৎচন্দ্র সরকারও একজন সখের বাঘ শিকারি ছিলেন। নড়াইলের জমিদার শিকারি শ্রী পতিরায় কুড়িগ্রাম বাগানে

গিয়ে 'আও আও' বলে ডাক দিতেন বাঘ বেরিয়ে আসলে লাঠির ও তরবারি দিয়ে বাঘ শিকার করতেন। মালিডাঙ্গা গ্রামের হারুন মোল্যা অনুমান ১৯৫২ সালে একটি বিশালকৃতির বাঘ শিকার করেন।[২৬]

নড়াইল থানার দত্তপট্টিতে এক সময় প্রচুর বাঘ থাকতো। ১৯৬৪/৬৫ সালেও ঐ স্থানে বাঘ ও শূকর থাকতো। প্রায় ৪ মাইলব্যাপী ছিল ঐ বিশাল জঙ্গল। ১৯৫২ সালেও নড়াইলের হোসেনপুর গ্রামে বাঘ ধরার খোয়াড় ছিল।[২৭]

নড়াইল থানার গন্ধর্বখালি গ্রামের গহরউদ্দিন বিশিষ্ট বাঘ শিকার ছিলেন। গহর বাঘ শিকার করলে এলাকাবাসী তাকে অর্থ সাহায্য করতো। তিনি ছিলেন পেশাদার শিকারি। একবার মাইচপাড়া গ্রামের বাঞ্চারাম ঠাকুরেব কুকুরকে বাঘে ধরে নিলে ঠাকুর বাঘটিকে জাপটে ধরেন এবং বাঘটিকে গলা টিপে হত্যা করেন।

নড়াইল থানা ফেদি গ্রামের মকসেদ আলীর একটি গরুর বাছুর বাঘে ধরলে তিনি বাঘটিকে ঝাপটে ধরেন। এবং বাঘটিকে হত্যা করেন।

আনুমানিক ১৯৪২ সালে চণ্ডিবরপুরের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফেদি নিবাসী মরহুম খালেক ভূঁইয়া বদনার আঘাতে একটি বাঘ শিকার করেন। তিনি কমলাপুর রঘুনাথপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় বাঘ শিকার করে পুরস্কৃত হয়েছেন।

চিলগাছা রঘুনাথপুরের (নড়াইল থানা এলাকায়) খালপাড়ে একটি বাঘের খোয়াড় ছিল। ঐ এলাকার মনোরঞ্জন দাস, মনিকেষ্ট দাস, মণাগূহ, খোকা ভদ্র বাঘের খোয়াড় বা ফাঁদ পরিচালনা করতো। খোকা ভদ্রসহ কয়েকজন শিকার করা বাঘের দুধ পান করেছিল বলে এই এলাকায় জোর প্রবাদ রয়েছে। বাঘের দুধ পান করলে না কি বেশি শক্তি সঞ্চয় করা যায়। চিলগাছা রঘুনাথপুরের বাঘের খোয়াড় থেকে ১৯৬৫ সালেও ১৩ টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার মারা পড়ে। এলাকাবাসীর ধারণা সামরিক শাসক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আমলে ব্যাপক বনজঙ্গল ধ্বংস হওয়ায় নড়াইল জেলা এলাকার বন্য জীব-জানোয়ার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।[২৮]

বাঘ ছাড়াও বন্য শূকর নড়াইল জঙ্গল এলাকায় দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৬৫ সালে নাকসির দিলু মোল্যার বুক ফেড়ে ফেলে বন্য শূকর। দিলু মোল্যা প্রানে বেঁচে যায়। শংকরপুর গ্রামে বাঘ ও শূকরের আনাগোনা ছিল। ঐ গ্রামেব শিকাবি মাইকেল ডি ব্যারেজ ১৯৫৮ সালের দিকেও বাঘ শিকার করেছেন। তিনি মোট ১২ টি বাঘ শিকার করেছিলেন। ভদ্রবিলার অধিবাসী পুলিন ঘোষও বাঘ শিকারি ছিলেন।[২৯]

পোলোইডাঙ্গা গ্রামের পবন খাঁ ও গগন খাঁ নামের দুই সহোদরের শক্তি ও সাহস ছিল অনমনীয়। প্রায় ১৫০ বছর আগের ঘটনা। তারা গিয়েছিলেন ন্যাথড়ার হাটে। তারা হাট শেষে বাড়িতে ফেরার পথে বাগডাঙ্গায় আসলে বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হন। গগন খাঁ বাঘের সামনের দুই পা চেপে রাখেন। আর পবন খাঁ লাঠির আঘাতে সেই বিরাটাকৃতির বাঘটিকে হত্যা করেন। তাদের এই বীরত্বের জন্য হাটবাড়িয়ার জমিদার দুই ভাইকে ১৬ পাখি জমি দান করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে।[৩০]

নড়াইল থানার হোসেনপুর গ্রামে বাঘ বাঁধানো খোয়াড় পরিচালনা করতেন ঐ গ্রামের আবদুল মজিদ শিকদার, লাল মিয়া প্রমুখ। এই খোয়াড় থেকে প্রচুর বাঘ মারা পড়েছে। নারায়ণপুর গ্রামের মুচির পুকুরের পাশে একটি বাঘ ধরা খোয়াড় ছিল।

এলাকার হিন্দু-মুসলমান মিলে এই খোয়াড়ে বাঘ শিকার করতেন।

আউড়িয়া নিবাসী স্বরূপ ঠাকুর শিকারি ছিলেন। তার বন্ধু যোগিন্দির দাস সাহসী শিকারি ছিলেন। আগেই আউড়িয়ার বাঘ শিকারি কিরণ ঘোষের কথা বলেছি। তার সহ-শিকারি ছিলেন ইব্রাহিম সরদার। এরা দুইজন ফুলশর গ্রামে বাঘ শিকার করতে গেলে কিরণ ঘোষ আহত হন। ইব্রাহিম একাই বাঘটিকে হত্যা করে। আউড়িয়ার জঙ্গলে একবার বাঘ ও বন্য শূকরের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়। শূকরের কাছে বাঘ পরাজিত হয়। শূকর বাঘের বুক ফেড়ে ফেলে। সম্ভবত বাঘটি মারা যায়।[৩১]

কালিয়া থানার নিধিপুর গ্রামে প্রায় ৬০/৬৫ বছর আগে শীতকালে বাঘের আনাগোনা বাড়তো । গ্রামের বয়সী লোকেরা বলেন, বাঘিনী নিজ শাবক নিয়ে বন-বাদাড়ে স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করতো। আর গ্রামবাসী থাকতো ভয়ার্ত। ঐ সময় নিধিপুর গ্রামের অনেক গরু, ছাগল, মহিষ ও কুকুর বাঘে আহার করেছে এমন তথ্য পাওয়া যায়।

১৩৪১ সনে কালিয়া থানার নড়াগাতি গ্রামের তাহেরউদ্দিন শিকদারের বাড়িতে বিরাটাকারের একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার মারা পড়ে। তাহের শিকদার, মজিদ মোল্যা, রাঙা মোল্যা প্রমুখ শক্তিমান লোকেরা বাঘটিকে দেশীয় অস্ত্রদ্বারাই হত্যা করতে সমর্থ হয়।

১৩৬১ সনে নড়াগাতি গ্রামের শামু শিকদারের একটি ছাগলকে বাঘে আহার করে। এরপর সকালবেলা গ্রামবাসী স্থানীয় জঙ্গল ঘেরাও করে এবং এ দিন দুটো রয়েল বেঙ্গল টাইগার শিকার করে।

১৩৩০ সনে কালিয়া থানার নোয়াগ্রাম এলাকায় রয়েল বেঙ্গল টাইগার সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। শোনা যায়, বাঘটি কয়েকজন লোককে হতাহত করে। গ্রামবাসী তাড়া করলে বাঘটি পালিয়ে যাওয়ার সময় নোয়াগ্রাম নিবাসী দলিলউদ্দিনকে মারাত্মক ভাবে আহত করে।

কালিয়া থানার দেবদুন গ্রামে আনুমানিক ১৯৪৫ সালের দিকে হিংস্র রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আস্তানা ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, সাধক পাগল ঠাকুরের আশ্রমের কাছে বাঘ নির্বিঘ্নে আনাগোনা করতো।

কালিয়া থানার পুটিমারি গ্রামের বটগাছের জঙ্গলে ২০ হাত গভীর একটি স্থায়ী গর্তে বাঘ বাস করতো। কিছুকাল আগেও গর্তটি মানুষের দৃষ্টি গোচর হতো। আনুমানিক ১৯৩৬ সালে কালিয়া থানার পুটিমারি গ্রামের হাজারি শিকদার ও সাহাবুউদ্দিন শেখকে বাঘে মারাত্মক ভাবে আহত করে।

১৯৫৩ সালে কালিয়া থানার বল্লাহাটি গ্রামের শিশু আবদুল খালেককে বাঘে ধরে নিয়ে যায় ঘন পাটের ক্ষেতে। গ্রামবাসী খোঁজাখুঁজি করে খালেককে উদ্ধার করেন।

১৯৫২ সালে কালিয়া থানার ফুলদহ গ্রামের মুহম্মদ সোহরাব মিয়ার কুকুরের সঙ্গে বাঘের জোর লড়াই হয়। গ্রামবাসী লাঠি সোটা ও অস্ত্রসহ ছুটে গেলে বাঘটি পালিয়ে যায়।

১৩৫৯ সনে কালিয়া যোগানিয়া গ্রামে একটি বিরাট বাঘ জানমালের ক্ষয়ক্ষতি করতে থাকে। গ্রামবাসী বাঘটিকে ঘিরে ফেলে। বাঘ তোয়ে বা তোয়েব নামক এক ব্যক্তিকে থাবা মেরে আহত করে পালিয়ে যায়। এরপর থেকে আজ অবধি লোকেরা

তোয়েকে তোয়েবাঘা বলে ডাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কালিয়া থানার কলবাড়িয়া গ্রামের জমিদার জকি মোল্যার পুত্র মুহম্মদ সবুর মোল্যা বন্দুকের সাহায্যে শিকারে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি অনায়াসে পাখি থেকে বাঘ ও অন্যান্য জীব-জানোয়ার শিকার করতেন। প্রবাদ আছে, বিগত ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে ব্যবহার হয়েছিল এমন একটি গাদাবন্দুক ব্যবহার করতেন তিনি। সম্ভবত তাঁর পিতা শক্তিমান মুহম্মদ জকি মোল্লার ব্যবহৃত বন্দুকটি তিনি ব্যবহার করেছেন। এই ভাবে অনুমান করা যায়, জকি মোল্লাও শিকারে অভ্যস্ত ছিলেন। জকি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলাবাড়িয়া নীলবিদ্রোহের নেতা ছিলেন। জকির বন্দুক নীলবিদ্রোহে ও ১৩১৮ সালের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ব্যবহার হয়েছিল। সবুর মোল্লা ছিলেন ঐ সংগ্রামের বিশিষ্ট নেতা ও আসামী।

১৯৮৩ সালে কালিয়া থানার বিষ্ণুপুর গ্রামের স্থানীয় মুহম্মদ সাঈদ ও আরো অনেকে একটি বাঘকে জীবিতাবস্থায় ধরে ফেলে। ঐ বাঘটিকে নড়াইল কৃষি প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। ১৯৮৬ সনে বিষ্ণুপুর গ্রামের জলিল খোন্দকারের একটি পোষা কুকুরকে বাঘে আহত করে। স্থানীয় লোকের ধারণা, ঐ এলাকায় আজো বাঘ বিদ্যমান।

১৯৯৮ সালে কালিয়া থানার মির্জাপুর-গোবিন্দপুর গ্রামের লোকেরা একটি মেছো বাঘ বন্দি করে। ঐ বাঘটিকে দেখার জন্য প্রচুর উৎসাহী লোক ভিড় জমাতে থাকে।

১৯৭২/১৯৭৩ সালে কালিয়া থানার বাগডাঙ্গা সুমেরুখোলার কয়েকজন গৃহস্থের ছাগল, কুকুর ও গরুর বাছুর বাঘ হত্যা করতে থাকে। সংঘবদ্ধ হয়ে গ্রামবাসীরা বাঘটিকে তাড়া করলে পালিয়ে যায়।

১৯৮০ সালে কালিয়া থানার নড়াগাতি গ্রামে বাঘ দেখা যায়। স্থানীয় মোসলেম মিয়ার ছেলে হেরোন মিয়ার মেয়েকে চিতাবাঘ আহত করে পালিয়ে যায়। বাঘটি কামশিয়া, নড়াগাতি ও রামপুরার কয়েকজন লোকের ছাগল হত্যা করে আহার করে। গ্রামবাসী বাঘটিকে তাড়া করলে কামশিয়া-নড়াগাতি কবরস্থানের মজিদ শিকদারের কবরের গর্তে বাঘটি আশ্রয় নেয়। স্থানীয় আসাদ ফকির, আবুল শিকদার, মোসলেম শিকদার, লিয়াকাত মোল্যাহ, জালাল লস্কর বাঘটিকে হত্যা করেন।

কালিয়া থানার নড়াগতি ও ঘোড়াখালির কাটা নদীতে কুমির, কামট ও ভাসাল থাকতো। কুমির অনেক লোককে খেয়ে ফেলেছে। কামট অনেকের হাত-পাও কেটে নিয়ে গেছে। নড়াগাতি গ্রামের জনৈক ময়েজউদ্দিন শেখ ছিলেন বিখ্যাত কামট শিকারি। তিনি বড়ো বড়শিতে কৈ মাছ গেঁথে বহু কামট হত্যা করেছেন।

আনুমানিক ১৯৩৬ সালে কালিয়া থানার মূলশ্রী গ্রামের নাছিরউদ্দিন শেখ ও তার সহোদরকে কুমিরে মধুমতির ঘাট থেকে ধরে নিয়ে আহার করে। ১৯৪৮ সনে মূলশ্রী গ্রামের ইন্তাজ শেখের গাভীর পেছনের বাঁ পা কুমিরে কেটে নিয়ে যায়।

আনুমানিক ১৯৩১ সালে কালিয়া থানার মাউলি গ্রামের রূপলাল মজুমদারের ঠাকুর মাকে কালিগঙ্গা নদীর ঘাট থেকে ধরে নিয়ে যায়। ১৩৫২ সালে কালিয়া-লোহাগড়া থানার মঙ্গলপুর গ্রামের তেলেম চৌধুরীকে মধুমতির ঘাট থেকে কুমির ধরে নিয়ে যায়।

১৩৯১ সনের আগে কালিয়া থানার রঘুনাথপুর গ্রামের চিত্রা নদীতে জেলেদের জালে কুমিরের বাচ্চা পাওয়া গিয়েছে।

কালিয়া থানার মির্জাপুর গ্রামের কালিগঙ্গা নদীরঘাটে (রাইদের ঘাটে) কুমিরের গাড়ে (গর্ত) ছিল। প্রায় শত বছর আগে ঐ এলাকার একটি লোককে কুমির আক্রমণ করলে লোকটি বাঁচার আর কোনো পথ না পেয়ে কুমিরের দুটো চোখের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেয়। কুমির যন্ত্রণায় ডাঙ্গায় উঠে পড়লে গ্রামবাসীরা কুমিরটাকে হত্যা করে।

১৩৫৪ সনে কালিয়া থানার জয়গ্রামের মধুমতি নদীর শেখদের ঘাটে শিশু আবদুল হক ও তার সহোদর বোনকে কুমির আক্রমণ করে। আবদুল হক কোনো ভাবে বেঁচে গেলেও বোনটিকে কুমিরের কবল থেকে রক্ষা করা যায় নি।

১৩৩৬ সনে ছোট কালিয়ার গোপাল ডাক্তারের পুকুরে বিশাল আকারের একটি কুমির নবগঙ্গা নদী হতে প্রবেশ করে। চাঁদপুর গ্রামের ওয়াজেদ গাছি সকাল বেলায় পুকুরে ভাসমান কুমিরটি দেখতে পান। এরপর কুমিরটিকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

বড়দিয়ার নিকটে কালিয়া থানার ময়নাপাড়া গ্রামের মধুমতি নদীতে সার্বক্ষণিক কুমিরের আড্ডা ছিল। ঐ স্থান দিয়ে বড়দিয়া বাজার থেকে বড়ফা গ্রামের (গোপালগঞ্জ জেলার) আলম মোল্লাকে কুমির আক্রমণ করে। আলম সাহসী ও শক্তিশালী ছিলেন। জানা যায়, আলম কুমিরের পিঠে চড়ে কুমিরের দুটো চোখ শক্তভাবে আটকিয়ে রাখেন। কুমির দক্ষিণপার থেকে মধুমতির উত্তর পারে উঠে পাড়ে। পবে কুমিরটিকে গ্রামবাসীরা হত্যা করে। ময়নাপাড়া কুমিরের জলাবাস থেকে বড়ফা গ্রামের সাত্তার মোল্লা আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

১৩৫৪ সনে কালিয়া থানার আঠারোবাঁকি নদীর ঘাটে বল্লাহাটি গ্রামের দুইজন লোককে কুমিরের ধরে নিয়ে যায়। ঐ দুইজনের ১ জনের নাম ছিল ধলা মিয়া।

১৩৪৪ সনে কালিয়া থানার খাশিয়াল গ্রামের আবুল বাশার শেখ (৬০) কে কুমির মধুমতি নদীর ঘাট থেকে আহার করে। ঐ গ্রামের সোনাউল্লাহ শেখকে কুমির আহত করে।

১৯৪৬ সালে কালিয়া থানার টোনা গ্রামের ছমিরউদ্দিন মোল্লাহকে কুমির মারাত্মকভাবে আহত করলে ছমির কিছুদিন ভুগে মৃত্যুবরণ করে।[৩২]

তথ্যনির্দেশ

১. শিশির মাঝি ও প্রফুল্ল মাঝি, কলাবাড়িয়া, থানা : কালিয়া, ১৯৯৪
২. মুহম্মদ দারাউদ্দিন (৫৭), গ্রাম নড়াইল, নড়াইল ও জাফর মোল্লা (৫০), গ্রাম কলাবাড়িয়া, থানা কালিয়া, নড়াইল
৩. মু. দারাউদ্দিন আহমদ (৫৭), গ্রাম নড়াইল, থানা নড়াইল, ১৯৯০
৪. রফি শেখ (৬৬), কলাবাড়িয়া, থানা : কালিয়া, ১৯৮৪
৫. দবিরউদ্দিন আহমদ (৬২), গ্রাম : মল্লিকপুর, থানা : লোহাগড়া
৬. সুধীর সরদার (৭২) ,গ্রাম : লোহাগড়া, থানা : লোহাগড়া, ১৯৮৭
৭. সুধীর সরদার (৭২), গ্রাম : লোহাগড়া, থানা : লোহাগড়া, ১৯৮৭
৮. এডভোকেট ওমর ফারুক (৫৪), গ্রাম : লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া, ১৯৮৮
৯. অধ্যাপক সাঈদুর রহমান (৪০), লোহাগড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয়, ১৯৮
১০. সৈয়দ মশিয়র রহমান (৩২), গ্রাম কুমড়ি, লোহাগড়া, ১৯৮২
১১. সুধীর সরদার (৭২), গ্রাম : লোহাগড়া, থানা : লোহাগড়া
১২. অধ্যাপক সাঈদুর রহমান (৪০)
১৩. এডভোকেট ওমর ফারুক (৫৪), লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া
১৪. সুধীর সরদার (৭২), লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া
১৫. সুধীর সরদার (৭২), লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া
১৬. হাজের আলি বিশ্বাস (৭৫), হাটবাড়িয়া, নড়াইল ১৯৮৬
১৭. প্রাগুক্ত
১৮. নূর আকবর (৭০), দুর্গাপুর, নড়াইল, ১৯৮৩
১৯. নূর আকবর (৭০), দুর্গাপুর, নড়াইল
২০. রবীন্দ্র জীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৪৯
২১. শতাব্দীর সাক্ষী (১৮৮৬-১৯৮৬), প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, পৃ. ২৩
২২. জালালউদ্দিন আহমদ বিশ্বাস (৪৪), ব্যাংক কর্মকর্তা, মাইচপাড়া
২৩ ফুলকাজী (৬৫), সীমানন্দপুর, নড়াইল
২৪. মোদাচ্ছের মিয়া (৭০), বরাশুলা, নড়াইল
২৫. সুধীর কুমার দাস (৬০), রূপগঞ্জ, নড়াইল
২৬. শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস (৭০), কুরিগ্রাম, নড়াইল
২৭. শেখ জমিরউদ্দিন (৭৪), হোসেনপুর, নড়াইল
২৮. শামসুর রহমান (৫৫), হোসেনপুর, নড়াইল
২৯. রুমি মুন্সি (৬৫), নড়াইল, নড়াইল
৩০. মোঃ জাহাঙ্গীর কবির (৪৫), দক্ষিণ বাগডাঙ্গা, নড়াইল ও মাধবচন্দ্র বিশ্বাস (৪৪) শোলপুর, নড়াইল
৩১. কালিয়া উপজেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মহসিন হোসাইন, পৃ. ৯

নড়াইল জেলার নদনদী

এক সময় নড়াইল জেলা সমুদ্রের তলদেশে ছিল। যখন ভূমি সৃষ্টি ও দ্বীপের আবির্ভাব হলো তখন ভূমিখণ্ডের ওপর অসংখ্য নদ-নদীর জন্ম হয়। আদিকালে নড়াইল জেলার আদি ভূ-খণ্ডের ওপর কতো যে নদনদী ছিল তা এখন কোনো ভাবেই ধারণা করা যাবে না। অনেক নদী মজে গিয়ে উঁচু ভূমির সৃষ্টি করেছে। তার উপর গড়ে উঠেছে বসবাসের জন্য জনপদ। নদী প্রবাহের জন্য জেলার ভূমির উর্বরতা তথা শস্যের প্রাচুর্য অঞ্চলবাসীকে সুখী ও সম্পদশালী করেছিল। সমস্ত প্রকৃতি ও পরিবেশকে করেছিল মধুর ও মোহনীয়। বিগত দিনের সুখ স্মৃতি মন্থন করে নড়াইলের কবি বলেছেন :

মধুমতি–নবগঙ্গা স্বাদু স্বচ্ছ নীরে
গড়িল সোনার পল্লী যথা তীরে তীরে
সমোর্বরা হাস্যময়ী শস্যভরা ক্ষেত্র,
উদ্যানের ফুলফলে তৃপ্ত হত নেত্র।

বর্তমান নড়াইল জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া মধুমতি চিত্রা, নবগঙ্গা, কাজলা, নলিয়া নদীর তীরে তীরে অতি প্রাচীনকাল থেকে মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ধারণা করা কঠিন। তবে নির্দ্বিধায় বলা যায় নড়াইল জেলার অনেক নদীর তীরেই পাল, সেন, সুলতানি ও মুঘল আমলেই বসতি গড়ে ওঠে। বিশেষ করে আমরা যখন মধুমতি নদীর তীরে প্রায় ২ হাজার বছরের মুদ্রা প্রমাণ পাই তখন এখানকার নদী সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমাদের আর কোনো সন্দেহ থাকে না। নড়াইল জেলার নদীগুলো প্রবাহিত হয়ে আসছে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে। নদীগুলোর মূল উৎস হলো গঙ্গা-পদ্মা নদী। অর্থাৎ নদীগুলো সরাসরি গঙ্গা-পদ্মা থেকে বেরিয়ে না আসলেও ঐ নদীর শাখাপ্রশাখা থেকে বিকাশ লাভ করেছে। ছোট্ট জেলা হলেও এই এলাকার অসংখ্য নদী ছিল। নড়াইল জেলার অনেক নদীই এখন সমতল ভূমিতে পরিণত হয়েছে। যে নদীগুলো এখন বর্তমান সে গুলো কালিগঙ্গা নদীর অস্তিত্ব তা বুঝতে পারা যায়। কালপ্রাপ্ত নদী বা মরা নদীকেই কালিগঙ্গা বা কালিন্দি নদী বলে। কালিগঙ্গা সুনির্দিষ্ট কোনো নদী নয়। বলা যায়, মৃত নদীসমূহের সাধারণ নাম।

নদীর গতিপথ কোথাও সুস্থির নয়। নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে। পুরাণ খাঁত পরিত্যাগ করে। এবং সেই সব খাঁত জলাভূমি, বিল, ঝিল, গোগ, দহ, বাঁওড়, হাওড় প্রভৃতি নামে পরিচিত পায়।[১] এছাড়া বিল বাঁওড় থেকে নদী পথে কিংবা এক বিল থেকে অন্য বিলে যাওয়ার জন্য ছোট ছোট নালা বা খাল আছে। ফসল উৎপাদন, পরিবহন, যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য জলাশয়ের সংযোজক খাল খনন করা হয়েছিল। এই খালগুলোকে কাটা খাল বা খোঁড়া খাল বলা হয়ে থাকে। এছাড়া সুলতানি ও মুঘল আমলেও অনেক খাল খনন করা হয়েছিল। জেলার প্রধান নদীগুলো নিম্নরূপ : ১. নবগঙ্গা ২. চিত্রা ৩. মধুমতি ৪. কালিগঙ্গা ৫. নলিয়া ৬. কাজলা ৭. আতাখাল বা কালু-মালুর নদী ৮. ঘোড়াখালি (ক) ৯. ঘোড়াখালি (খ) ১০. আঠারবাঁকি ১১. নড়াগতিনদী ও ১২.

হ্যালিফ্যাকস্ ক্যানেল।

নবগঙ্গা : পদ্মা নদী হতে জন্ম নিয়েছে গৌরী বা গড়াই নদী। ঐ নদী থেকে মাথাভাঙ্গা নামে আরেকটি নদী জন্ম নিয়েছে। আবার আলমডাঙ্গা রেলষ্টেশনের কাছে মাথাভাঙ্গা নদী হতে কুমার নামের প্রাচীন নদীটি বৃহত্তর যশোর জেলায় প্রবেশ করে। এই কুমার নদীর পর মাথাভাঙ্গা হতে নবগঙ্গা নামে আরেকটি নদী উৎপত্তি লাভ করেছে। এই নবগঙ্গা চুয়াডাঙ্গার পূর্ব দিকে এক বিলের মধ্যে পড়ে মূল নদীর সঙ্গে সংযোগ হারায়। ঐ স্থানে নদী মজে গিয়ে গতিরুদ্ধ হয়ে আছে। মাগুরা শহরের উত্তরাংশে মুচিখালি নামক একটি খালের দ্বারা নবগঙ্গার সঙ্গে কুমার নদীর মিলন ঘটে। এরপর নবগঙ্গা অধিক শক্তিশালী হয়। নবগঙ্গা নদী মাগুরা বিনোদপুর, শত্রুজিৎপুর, নহাটা ও সিঙ্গিয়ার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে লোহাগড়া থানার নলদির পার্শ্ববর্তী ব্রাহ্মণডাঙ্গা, রায়গ্রাম, কলাগাছি, এড়েন্দা, লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া, কুমারকান্দা, কামঠানা, তেঁতুলিয়া ও কালনা হয়ে মধুমতিতে প্রবাহিত হতো।[২] সম্ভবত মুঘল শাসনামলে নবগঙ্গা নদীর একটি শাখা মল্লিকপুর, কোলা, দিঘলিয়া, তেলপাড়া হয়ে কালিয়া থানায় প্রবেশ করেছিল। ইংরেজ কোম্পানি শাসনামলে এই খালটির সংস্কার করা হয় এবং এরপর থেকে নবগঙ্গার ঐ অংশকে 'ব্যান্ডকাটা খাল' বা 'বানকানার' খাল বলা হয়। মিঃ ব্যান্ড ছিলেন লোহাগড়া এলাকার একজন নীলকুঠিয়াল। তিনি মুঘল আমলের খনন করা খালটি সংস্কার করেছিলেন।

নড়াইল জেলার বিরাট অংশের ভূমি গঠন ও সভ্যতা বিকাশে নবগঙ্গা নদীর বিশেষ অবদান রয়েছে। এক সময় সমুদ্র উপকূল ও সুন্দরবনে বসবাসরত মগ ও হার্মাদ দস্যুরা নবগঙ্গা নদীর দুইতীরের মানুষদের উপর নির্মম ও পাশবিক অত্যাচার করেছে। নবগঙ্গা নদীর দুইতীরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখনও বহু মোগোসাহা, মোগোনমো ও মোগোকায়স্তের সন্ধান পাওয়া যায়। তারা এক সময়কার মগদের অত্যাচারের ইতিহাস বহন করে চলেছে।

১৯৭৫/১৯৭৬ সাল পর্যন্ত নবগঙ্গা নদীর নাব্যতা ছিল। খুলনা হতে মহাজন বড়দিয়া, লোহাগড়া, লক্ষ্মীপাশা হয়ে লঞ্চ সরাসরি বর্তমান মাগুরা জেলার বিভিন্ন অংশে যাতায়াত করতো। অথচ নবগঙ্গার ঐ অংশের কোথাও কোথাও রীতিমতো চাষবাস হয়। নড়াইল জেলার নবগঙ্গা নদীর যে সবস্থানে লঞ্চঘাট ছিল সেগুলো হলো : ১. বড়দিয়া ২. লুটিয়া ৩. চরকোটাকোল ৪. দিঘলিয়া ৫. পাঁচুড়িয়া ৬. চরমল্লিকপুর ৭. লোহাগড়া ৮. লক্ষ্মীপাশা ৯. এড়েন্দা ১০. কলাগাছি ১১. ব্রাহ্মণডাঙ্গা ১২. নলদি ও ১৩ মিঠাপুর।[৩]

১৯৫০/১৯৫১ সাল পর্যন্ত নবগঙ্গা নদীর উপর দিয়ে স্টিমার চলাচল করতো। পানি প্রবাহের স্বল্পতায় স্টিমার চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নবগঙ্গা নদীর যে সমস্ত স্থানে ষ্টিমার ষ্টেশন ছিল সে গুলো হলো : ১. বড়দিয়া ২. দিঘলিয়া ৩. কোলা ৪. জয়পুর ৫. এড়েন্দা ৬. কলাগাছি ৭. ব্রাহ্মণডাঙ্গা ও ৮. নলদি।[৪]

মধুমতি : কুষ্টিয়ার কাছে গৌরী বা গড়াই নদী পদ্মা নদী হতে জন্ম নিয়ে মাগুরা জেলায় প্রবেশ করে। তারপর কুমার নদীব সাথে মিশে কুমারের শাখা বারাসিয়ার স্রোতের সাথে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। বারাসিয়া নদী হতে এলেংখালি নামে এলান জারি করে বাংলার সুবাদার একটি খাল কাটিয়ে দেন। পরবর্তীকালে এলেংখালি একটি

নদীর মর্যাদা পেয়েছে। আগে বারাসিয়ার নিম্নাংশ থেকে নদীর নাম ছিল মধুমতি। এখন 'এলেংখালি নদী ও বিস্তার লাভ করে মধুমতি নামে পরিচিতি পেয়েছে। এলেংখালি-মধুমতির স্রোতধারা মাগুরা জেলার মহম্মদপুর থানার দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানার লাহুড়িয়া-ক্যালিগঞ্জে প্রবেশ করে। এরপর নড়াইলের আজমপুর, ঝাউডাঙ্গা, শালনগর, শিয়ারবর, চাঁচই-ধানাইড়, আড়িয়ারা, আমডাঙ্গা, কালনা, ডিগ্রিরচর, লংকারচর, ইতনা, মহিশাপাড়া, গাঘা, কোটাকোল গ্রামের পার্শ্ব দিয়ে ক্রমে পূর্বগামী হয়ে আঠারবাঁকি, ঘাগর প্রভৃতি নদীর স্রোতের সম্মিলনে বলেশ্বর নাম ধারণ করে সাগরে পতিত হয়েছে। নবগঙ্গার মতো মধুমতি নদীর তীরে শত শত বছরের হাটবাজার, দালানকোটা, মসজিদ, মন্দির গড়ে উঠেছে। এই নদী পথেও হার্মাদ ও মগদস্যুরা এক সময় লুণ্ঠন অত্যাচার করেছে। মধুমতি নদীতে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত স্টিমার চলাচল করতো। এখন মধুমতি নদীর সেই আগের নাব্যতা আর নেই। নড়াইল জেলাধীন মধুমতি নদীতীরে যে সব স্টিমার স্টেশন ছিল সেগুলো হলো : ১. ইতনা ২. ধলুইতলা ও ৩. বড়দিয়া।[৫]

চিত্রা : ঐতিহাসিক চিত্রানদী বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার মাথাভাঙ্গা নদীর একটি শাখানদী। কোনো এক সময় নদীটি মহেশ্বর নদী নামে পরিচিত হতো। এরপর চিত্রানদী দীর্ঘ পথ পার হয়ে বর্তমান মাগুরা জেলার খাটুরমাগুরা গ্রাম পার হয়ে নড়াইল জেলার মাইজপাড়া-মাগুরার মধ্য দিয়ে নড়াইলে প্রবেশ করেছিল। চিত্রানদী মাইজপাড়া, চারিখাদা প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়ে ঘোড়াখালি গ্রামের পার্শ্ব দিয়ে সোজা দক্ষিণবাহিনী হয়েছে। এরপর চিত্রা নড়াইল শহর, বরাশুলা, বাদুরগাছা, লস্করপুর, হাটবাড়িয়া রঘুনাথপুর, ফুলশর চাঁচুড়ি পুরুলিয়া হয়ে নবগঙ্গা নদীতে মিশতো। এরপর গাজির হাটের কাছ দিয়ে চিত্রানদী সোজা পূর্বদিকে খুলনা জেলার তেরখাদার কাছে নলিয়া নদীর সাথে মিশে আঠারবাঁকিতে রয়েছে। প্রাচীন চিত্রানদী কোথাও কোথাও নিশ্চিহ্ন হয়েছে। শিংগাশোলাপুর থেকে গাজীরহাট পর্যন্ত চিত্রা নামে যে নদীটি পরিচিত, আসলে সেটি কালুমালুর খাল বা আতাইনদী।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার বিখ্যাত 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থে চিত্রানদীকে অমর করে রেখেছেন। চিত্রানদীতে কিছুকাল আগেও স্টিমার চলতো। মাগুরার বাঁধ ও ভারতের ফারাক্কা বাঁধের প্রতিক্রিয়ায় চিত্রা এখন অনেকটা মুমূর্ষু নদী।[৬]

কালিগঙ্গা : বাংলাদেশে অসংখ্য কালিগঙ্গা, কালিগাঙ্গ কিংবা কালিন্দি নদীর সন্ধান পাই। কালপ্রাপ্ত নদীকেই কালিগাঙ্গ বলে। সহজ কথায় মরা নদীকে কালিগাঙ্গ বলে। নড়াইল জেলার বিভিন্ন গ্রাম ও মাঠের মধ্য দিয়া চলার সময় ভরাট হয়ে যাওয়া প্রাচীন নদীর নাম জিজ্ঞাসা করলে বৃদ্ধ লোকেরা নদীটিকে কালিগঙ্গা বা কালিগাঙ্গ বলে পরিচয় দেয়। মাগুরা জেলার বিভিন্ন জনপদ পেরিয়ে আমরা নড়াইল জেলায় একটি কালিগঙ্গা প্রবাহিত হওয়ার সংবাদ জানি। বিভিন্ন স্থান ঘুরে নড়াইল সদর থানার দারিয়াপুর পার হয়ে লোহাগড়া থানার রামেশ্বরপুর, ঝিকড়ে, শালিখা, বয়রা, নোয়াগ্রাম, তালবাড়িয়া, কুমড়ি গ্রামের মধ্য দিয়ে মাউলি শুক্তগ্রামের পাশ দিয়ে নবগঙ্গা নদী ছেদ করে কালিগঙ্গা এক সময় কালিয়া হাইস্কুলের সম্মুখ দিয়ে সোজা কলাবাড়িয়ার রাস্তা বরাবর প্রবাহিত হতো। ঐ কালিগঙ্গা নদী মির্জাপুর, চালনা বড়োনাল হয়ে প্রাচীনকালে খুলনা জেলার

তেরখাদার কাছে প্রাচীন চিত্রা নদীতে মিশে প্রবাহিত হতো। মাউলি, তালবাড়িয়া, কুমড়ি, কালিয়া প্রভৃতি গ্রামের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন কালিগঙ্গার পুরানো খাত ও 'কুমিরের গেড়ে' শনাক্তকরা যায়। এই এলাকার মানুষ কালিগঙ্গা নদীকে 'কালিখাল', 'পচাখাল' নামেও পরিচয় দিয়ে থাকে। কালিগঙ্গায় গোসল করতে গিয়ে প্রাচীকালে অনেক লোক কুমিরের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন এমন তথ্য পাওয়া যায়।[৭] কালিগঙ্গা নদীর চরায়, প্রাচীন কালিয়া জনপদের সৃষ্টি হয়েছে।

নলিয়া : দক্ষিণে প্রবাহিত নবগঙ্গা নদীর একটি শাখা পাটনা গ্রামের কাছে নলিয়া-নদী নামে প্রবাহিত হচ্ছে। নলিয়া সুপ্রাচীন নদী। প্রায় দেড়শত বছর আগের একটি 'চিটাবইয়ে' নলিয়া নদীর নাম পাওয়া যায়। পাটনা, রায়পুরা, ধুসাহাটি, ঐতিহাসিক কলাবাড়িয়া গ্রামের মধ্য দিয়ে নলিয়া নদী তেরখাদার নিকট চিত্রানদীতে মিলিত হয়ে আঠারবাঁকি নদীর মধ্য দিয়ে ভৈরব নদে পতিত হয়েছে। নলিয়া নদীর পশ্চিম পারে কলাবাড়িয়া গ্রামে কয়েকশত বছর আগে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ওয়ালি মাহমুদ খাঁ 'কেলাবাড়া' নির্মাণ করেন। 'কেলাবাড়া' থেকে কলাবাড়িয়া গ্রামের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে।[৮]

কাজলা : কাজলা নদীর মূল উৎস পদ্মা। এরপর বিভিন্ন নামের পরিচিতি নিয়ে কাজলা মাগুরার ভূমি খণ্ড থেকে পশ্চিমমুখি হয়ে মাইজপাড়ার কাছে নড়াইল জেলায় প্রবেশ করেছে। এরপর হোসেনপুর, বামনহাট, পেড়লি, তুলারামপুর, মুলিয়া ও হাড়িখালি গ্রামের নিকট চিত্রানদীর খালের কাছে মিলিত হয়েছে। মিলিত স্রোতধারা আফ্রার কাছে প্রাচীন ভৈরব নদে মিশেছে। চিত্রা- ভৈরবের সঙ্গমস্থলে পৌষ সংক্রান্তিতে মেলা বসে। এই সঙ্গমস্থলকে হিন্দুরা পবিত্র মনে করে।[৯]

আতাখাল বা কালুমালুর নদী : আগেই উল্লেখ করেছি, প্রাচীনকালে চিত্রা নদী রঘুনাথপুর হয়ে সোজা পূর্বদিকে ফুলশরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো। আরেকটি শাখা পলাইডাঙ্গা থেকে ঐ স্থানে প্রবাহিত হতো। আর শোলপুরের থেকে গাজির হাট পর্যন্ত বিস্তৃত নদীটি হলো আতাখাল। এই আতাখালের উল্লেখ আছে ১৬১০ ইংরেজি সালে রচিত ফার্সি কিতাব বাহারস্থান-ই গায়বিতে।[১০] ঐ গ্রন্থের অনুবাদক আতাখালের আরেকটি নাম মালুয়ার খাল বলে উল্লেখ করেছেন।[১১] স্থানীয় প্রবীণ লোকেরা আতাখালকে 'কালুমালুব খাল'[১২] বলে। এই কালুমালুর খালটি কালু ও মালু নামের দুই সহোদরের খনন করা। অন্য মতে, সুলতানি আমলের জনৈক কর্মচারী আতা খাঁ সুন্দরবনে হার্মাদ ও মগদের দমনের জন্য আতাখাল খনন করেন। এই আতাখালের তীরে ভূষণার বিদ্রোহী জমিদার একটি উচ্চ দুর্গ বা শিলাহ নির্মাণ করেন। এই শিলাহ পরবর্তীকালে শোলপুর। সুবাদার ইসলাম খাঁ চিশতির সেনাপতি ইখতিয়ার খাঁর কাছে এখানেই শত্রুজিত পরাজিত হন। আতাখাল বা আতানদী ঐতিহাসিক নদী। কিন্তু স্থানীয় জনগণ ব্যতীত অন্যরা নদীটিকে চিত্রানদী বলে ভুল করে থাকে। আতাখাল কর্তনের ফলে রঘুনাথপুর পোলোইডাঙ্গা থেকে বয়ে যাওয়া প্রাচীন চিত্রানদীর খাত নিঃশেষ হয়ে যায়। মেজর রেনেলের অংকিত ম্যাপে আতাখালের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

ঘোড়াখালি (ক) : লোহাগড়া থানার নলদি থেকে বর্তমান ঘোড়াখালির চিত্রানদী পর্যন্ত কয়েকশত বছর আগে একটি খাল খনন করা বা খোড়া হয়েছিল। খোড়া থেকে

স্রোতস্বিনীর উৎপত্তি বিধায় এর নাম ছিল খোড়াখাল। খোড়াখালই খোড়াখাল ও পরে ঘোড়াখালি নামে পরিচিতি পেয়েছে। খোড়াখালটি সুলতানি আমলে খোড়া হতে পারে। যে ভাবে খনন করা হয়েছিল এলেংখালিখাল বা নদী ও আতাখাল বা কালুমালুর খাল। স্থানীয় লোকেরা মনে করে, স্থানীয় জনৈক লবণ ব্যবসায়ী এই নদীটি খনন করেছিলেন। মুঘল শাসনামলে মহম্মদপুর ও ভূষণা থেকে দক্ষিণাঞ্চলে বিদ্রোহীদের দমনের জন্য এই খোড়াখালি বা ঘোড়াখালি নদী বিশেষ ভূমিকা রাখে।[১৩]

ঘোড়াখালি (খ) : দ্বিতীয় ঘোড়াখালি নদীটি কালিয়া থানার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। সাচিয়াদহের নিকট হতে পাখিমারা ডুতকুরা পদ্মাবিলা হয়ে একটি প্রাচীন নদী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। নদীটি বেশ প্রাচীন। নড়াইলের ঘোড়াখালি নদীর মতোই এই ঘোড়াখালি নদীটি খোড়াখাল বা খননকরা খাল। এটি যোগাযোগের সুবিধার্থে সুলতানি শাসনামলে খনন করা হয়েছিল। এই নদীর পাড়ে ঘোড়াখালি নামে একটি গ্রাম রয়েছে। এই গ্রামটি ১৯৫১ সাল পর্যন্ত কলাবাড়িয়ার মুহম্মদ জকি মিয়ার জমিদারি এস্টেটের অন্ত র্ভুক্ত ছিল।[১৪]

নড়াগাতি নদী : কালিয়া থানার জয়নগর গ্রামের কাছে মধুমতির থেকে একটি খাল খনন করা হয়েছিল। নদীটি জয়নগর, নড়াগাতি, বাঐসোনা হয়ে পূর্বের আলোচিত ঘোড়াখালি নদীতে মিশেছে। নড়াগাতি খালের জন্য মুঘল আমলে নড়াগাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। নদীটি এখন মৃতপ্রায়। নদীটি বর্ষাকালে নাব্যতা ফিরে পায় তখন ছোট বড়ো নৌকা চলাচল করে।[১৫]

আঠারবাঁকি : মধুমতি নদী নড়াইল জেলার কালিয়া থানার সিংগাতি গ্রামের পার্শ্ব দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় দক্ষিণদিকে প্রবাহিত একটি শাখা নদীর জন্ম দেয়। ঐ নদীটি আঠারবাঁকি নদী নামে সুপরিচিত। আঠারবাঁকি নদীটি কোনো এক সময় আঠারটিবাঁকের সমষ্টি ছিল। আঠারবাঁকি নদী খুলনার আলাইপুরের নিকটে ফতেপুর মৌজায় ভৈরবের সাথে মিশে বাগেরহাটের দিকে প্রবাহিত হতো।[১৬] ফতেপুর মৌজার নামকরণ হয়েছিল সুলতানি আমলের কেল্লাফতেপুরের নাম অনুসারে। সম্ভবত আঠারবাঁকি নদীপার হয়ে সুবাদার ইসলামখান চিশতি ফতেপুরে পৌঁছেছিলেন এবং রাজা শক্রজিত রায় আঠারবাঁকি ভৈরবের সঙ্গমস্থলে মুঘল সুবাদারের কাছে আত্মসমর্পণ করে বিপুল উপঢৌকন দিয়ে মুঘল সেনাবাহিনীতে চাকুরি গ্রহণ করেন।[১৭]

হ্যালিফ্যাক্স ক্যানেল : প্রাচীনকাল হতে মধুমতি নদী বড়দিয়ার নিকটে নবগঙ্গা নদী হতে ১ মাইল উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত হতো। সহজ যোগাযোগের জন্য ১৯১৮ সনে যশোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হ্যালিফ্যাকস একটি ক্ষুদ্র পরিসরের খাল খনন করে নবগঙ্গা ও মধুমতি নদীর সংযোগ সাধন করেন। যার ফলে, মধুমতির মূলস্রোত এখন নবগঙ্গা দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত। যদিও নবগঙ্গা নদী মাইগ্রাম পর্যন্ত নাব্যতা হারিয়েছে, হ্যালিফ্যাকস্ ক্যানেল খননের ফলে বৃহত্তর যশোরও খুলনা জেলার সঙ্গে সে সময় পশ্চিম বাংলা ও উত্তর বাংলার সহজ যোগাযোগ সাধন হয়।[১৮] হ্যালিফ্যাকস ক্যানেল খননের ফলে প্রাচীন টোনা নদীবন্দর বড়দিয়ায় উঠে আসে। বড়দিয়া অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরের মর্যাদা পায়।[১৯]

খাল ও নালা

নড়াইল জেলার নদীর পরেই আসে খালের প্রসঙ্গ। নদীর মতোই অনেকগুলো খাল বেশ প্রাচীন। প্রাচীনকালের অনেক নদী মরে গিয়ে খালের সৃষ্টি হয়েছে। আবার বিল ও বাঁওড়ের মতো নদীর সাথে কিংবা অন্য বিল বাঁওড়ের সাথে যোগাযোগের জন্য খাল নালাগুলি বেশ কার্যকর ভূমিকা রেখে আসছে। এছাড়া গ্রামীণ সমাজের ব্যবসায় বাণিজ্য উন্নতির জন্য খালগুলোর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। প্রাকৃতিক উপায়ে খাল ও নালা সৃষ্টি হওয়া ছাড়াও অনেকগুলো খাল খনন করা হয়েছিল। নড়াইল জেলার কয়েকটি খাল রীতিমতো স্রোতোস্বিনী নদীতে পরিণত হয়েছে যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এবার নড়াইল জেলার ৩টি থানার খাল ও নালগুলোর নাম দেওয়া হলো :

নড়াইল সদর থানার খাল ও নালসমূহ : ১. বড়েন্দার খাল ২. মুলিয়ার খাল ৩. মুচির খাল ৪. ট্যাপারির খাল ৫. বাহিরডাঙ্গার খাল ৬. নাওডোবার খাল ৭. বরাশুলার খাল ৮. শংকরপুরের খাল ৯. টাকিমারার খাল ১০. নাককাটির খাল ১০. গাড়ুচিয়ার খাল ১১. কাটাখালির খাল ১২. কালিগাঙ্গের খাল ১৩. শিরের খাল ১৪. শিয়েলপাগলা খাল ১৫. কাটাখালি ১৬. কাটাখাল ১৭. চোরখাল ১৮. মাইগ্রামের খাল ১৯. আউড়িয়ার খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২০]

কালিয়া থানার খাল ও নালসমূহ : ১. শুক্তগ্রাম খাল ২. গাছবাড়িয়ার খাল ৩. সুন্দরীর খাল ৪. চাঁচুড়ির খাল ৫. ম্যাটেরিয়া খাল ৬. বনগ্রাম খাল ৭. বাঁশগ্রাম খাল ৮. বুড়ির খাল ৯. মির্জাপুরের খাল ১০. কদমতলা-জুশালার খাল ১১. কালেকতোয়ার খাল ১২. বেন্দার খাল ১৩. রামেশ্বর খাল ১৪. গাছবাড়িয়ার খাল ১৫. টোনার খাল ১৬. বড়োনালের খাল ১৭. বালিচার খাল ১৮. নড়াগাতির খাল ১৯. লাইনের খাল ২০. ছিটকিতলার খাল ২১. ভুতির খাল ২২. পরামানিকের খাল ২৩. মোল্যাহর খাল ২৪. দাসের খাল ২৫. ডোমবাগ খাল ২৬. মাধবপাশা খাল ২৭. জটার খাল ২৮. মধুপুর খাল ২৯. টাকিমারা খাল ৩০. পেড়লির খাল ৩১. শীতলাবাড়ির খাল ৩২. খড়রিয়ার খাল ৩২. মদিনার খাল ৩৩. ডহরবল্লাহাটির খাল ৩৪. নলামারার খাল ৩৫. ঘোষের খাল ৩৬. সুগন্দির খাল ৩৭. গুপির খাল ৩৮. লোহারগাতির খাল ৩৯. খুরুল্লের খাল ৪০. কাটাখাল ৪১. পুটিমারি খাল ৪২. পানিপাড়ার খাল ৪৩. আনেসমোল্যার খাল ৪৪. পাটনার খাল ৪৫. ইসলামপুরের খাল ইত্যাদি।[২১]

লোহাগড়া থানার খাল ও নালসমূহ : ১. গাঘাঁর খাল ২. ধলইতলার খাল ৩. তেলকাড়ার খাল ৪. কন্যাদহের খাল ৫. সাতরার খাল ৬. ধোপাদহের খাল ৭. পুটিমারির খাল ৮. ভুঁইয়ের খাল ৯. কাটাখাল ১০. জেলের খাল ১১. দুধধোয়ার খাল ১২. কচুবাড়ের খাল ১৩. এড়েন্দার খাল ১৪. জেলের খাল ১৫. মিঠেপুরের খাল ১৬. নলদির খাল ১৭. মুচিখালির খাল ১৮. জেলের খাল (২) ১৯. তেঁতুলবেড়ের খাল ২০. বাজারে খাল ২১. হাজরাখালির খাল ২২. নীলকুঠির খাল ২৩. দোয়ার খাল ২৪. গাঠার খাল ২৫. শোইলদুরা খাল ২৬. নলামারার খাল ২৭. দুধপাতলার খাল ২৮. টাংরাখালির খাল ২৯. লেবুগাতির খাল ৩০. মনোর খাল ৩১. দাঁড়ার খাল ৩২. রোইসখালির খাল ৩৩. মুচিদোয়া খাল ৩৪. চাকদা খাল ৩৫. গোরুমারা খাল ৩৬. ট্যাংরাখালির খাল ৩৭. বড়োগাতির খাল ৩৮. সীমানার খাল ৩৯. সুখের খাল ৪০. পাগলার খাল ৪১. হাড়িভাঙ্গার খাল ৫২. বাটেইখালির খাল ইত্যাদি।[২২]

প্রাচীনকালের নদ-নদীসমূহ গতি হারিয়ে রুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় হ্রদের সৃষ্টি করে। কিংবা গতিপথ পরিবর্তন করে অন্যস্থানে চলে গেলে পূর্বের স্থানটি একটি জলাশয়ে রূপ নেয়। নড়াইল জেলাবাসি এই জলাশয়গুলোকে বিল, বাঁওড়, দোহা, দোয়া গোব, ডোব, গোগ প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করে। এই জলাশয়গুলো হাজার হাজার বছরের সভ্যতাও তার বিকাশের ধারাবাহিকতারই অবশিষ্টাংশ। জেলার ভূমি গঠন ও জনপদ সৃষ্টির পেছনেও রয়েছে বিল বাওড়গুলোর বিশেষ অবদান। এবার আমরা নড়াইল জেলার জলাশয়গুলোর বর্ণনা দেব।

লোহাগড়া থানার বিল বাঁওড়গুলোর নাম : ১. ইছামতির বিল ২. মল্লিকপুরের দোয়া ৩. গাঘাঁর বাঁওড় ৪. কুমড়ির বিল ৫. ফোটকের বিল ৬. মাইগ্রামের বিল ৭. আন্দার কোটার বিল ৮. পাংখারচরের বাঁওড় ০. তুলাব গোব ১০. উত্তরপাড়ার দোয়া ১১. রুইয়ের বিল ১২. তুষখালির দোয়া ১৩. এগারনালির গোগ ১৪. বাজারের গোলা ১৫. ডিক্রিরচরের গোলা ১৬. তাল দোয়া ১৭. চালিঘাটের দোয়া ১৮. নোয়াগ্রামের বিল ১৯. ভামুরিয়ার বিল ২০. বড়োবিল ২১. বসুপটির দোয়া ২২. পদ্মবিল ২৩. শামুক খোলার বাঁওড় ২৪. ধামাঘষার বিল ২৫. ঘাটবিল ২৬. চাড়ালদিঘির বিল ২৭. ন্যালোর বিল ২৮. পাঁচুড়ের বিল ২৯. চাকসি বাঁওড় ৩০. মোমিনের গাড়ি ৩১. ঘষিবাড়ির গোব ৩২. ঠাকুরবাড়ির গোব ৩৩. কুমিরের গাড়ে ৩৪. নাওদাঁড়ার বিল ৩৫. গজালের বিল ৩৬. খয়রাপচার বিল ৩৭. গাঙ্গনালিয়ার বিল ৩৮. দোয়ারের বিল ৩৯. চাপুলিয়ার বিল ৪০. মৌলভিরগাড়ে ৪১. খুগির পুকুর ৪২. পাথরঘাটার বিল ৪৩. চতরের দোয়া ৪৪. হবোগাতির ডোব ৪৫. রামকৃষ্ণপুর ডোব ৪৬. পিলহাদের গাড়ে ইত্যাদি।[২৩]

নড়াইল সদর থানার বিল-বাঁওড় জলাশয়ের নাম : ১. দুধপাতলার বিল ২. মদ্যি বিল ৩. দক্ষিণডাঙ্গার বিল ৪. খয়রাসারি বিল ৫. ডুংখোরের বিল ৬. কানাপুকুরের বিল ৭. চাকদার বিল ৮. কালীকীর্তনিয়ার বিল ৯. ঘড়িভাঙ্গা বিল ১০. কুমোর গাড়ে ১১. নলমারার বিল ১২. বকচরের বিল ১৩. নলাবিল ১৪. কাড়ার বিল ১৫. বড়েন্দারের বিল ১৬. ঘড়িভাঙার বিল ১৭. কুরির ডোব ১৮. ক্যালেরবিল ১৯. বাহারবিল ২০. আজোগার বিল ২১. বাউনের বিল ২২. পাথরঘাটার বিল ২৩. মাদিমারার বিল ২৪. বাঁশতলার বিল ২৫. আজোদাঁড়ার বিল ২৫. বাবনখাদা বিল ২৬. হাতিগাড়ে ২৭. কুমির গাড়ে ইত্যাদি।[২৪]

কালিয়া থানার বিল-বাঁওড় ও জলাশয়ের নাম : ১. চাঁচুড়ি বিল ২. টোনার গোব ৩. পাটেশ্বরীর বিল ৪. কালিদহের বিল ৫. বড়োনালের বিল ৬. ডাকাতের বিল ৭. রাণীঘাটার বিল ৮. চোয়াড়ের বিল ৯. দাবুড়ের বিল ১০. গোল্লাবিল ১১. ধোপার গাড়ে ১২. বিলআফরের বিল ১৩. বল্লাহাটির বিল ১৪. গাজির বিল ১৫. খাশিয়ালের গোব ১৬. গজলের বিল ১৭. চান্দার দোয়া ১৮. কুমিরের গাড়ে (ক)১৯. কুমিরের গাড়ে (খ) ২০. রুনজালার বিল ২১. ছুয়াড়ের বিল ২২. জোয়ারের বিল ২৩. মাদারগাড়ে ২৪. ধলা বা ধলেশ্বর বিল ২৫. পদ্মবিল ২৬. পূণ্যের গাড়ে ২৭. কানা গোব ২৮. বাইর গোব ২৯. হাসার বিল ৩০. পরমাণিকের গাড়ে ৩১. চিতেলের বিল ৩২. পিপড়েকান্দার বিল ৩৩. হাজি মারগোর বিল ৩৪. মেছেরের গোব ৩৫. পিয়ারা কান্দর বিল ৩৬. বোরইতলার বিল ৩৭. দাবুড়ের গোলা ৩৮. বায়োনডাঙ্গার বিল ৩৯. খায়রাপচার বিল ৪০. কচুবাড়ের বিল ৪১. মোল্যাহরবিল ইত্যাদি।[২৫]

তথ্যনির্দেশ

১. যশোহর-খুলনার ইতিহাস, শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র বি. এ, পৃ. ২০
কালিয়া উপজেলা পরিক্রমা, মহসিন হোসাইন, পৃ. ৯,
২. অধ্যাপক সাঈদুর রহমান (৪০), মাউলি, কালিয়া, ১৯৮১
৩. জাফর মাতুব্বর (৭০), মাউলি, কালিয়া, ১৯৮১
৪. কালিয়া উপজেলা পরিক্রমা, মহসিন হোসাইন, পৃ. ১০
৫. কালিয়া উপজেলা পরিক্রমা, মহসিন হোসাইন, পৃ. ১০
৬. কালিয়া উপজেলা পরিক্রমা, মহসিন হোসাইন, পৃ. ১০
৭. কালিয়া উপজেলা পরিক্রমা, মহসিন হোসাইন, পৃ. ১০
৮. ওবায়দুর তরফদার (৫০), প্রাক্তন ইউ, পি. চেয়ারম্যান, তুলারামপুর. নড়াইল, ১৯৮৭
৯. বাহারীস্থান-ই-গায়বি (১ম খণ্ড) মির্জা নাথান, অনুবাদ : খালেকদাদ চৌধুরী, ১৯৯৩, পৃ. ১৪
১০. বাহারীস্থান-ই-গায়বি (১ম খন্ড) মির্জা নাথান, অনুবাদ : খালেকদাদ চৌধুরী, ১৯৯৩, পৃ. ১৬৭
১১. মসলেম বয়াতি (৭৮), গ্রাম তারাপুর, থানা : নড়াইল, ১৯৮৪
১২. মুহম্মদ দারাউদ্দিন আহমদ (৫৭), গ্রাম : নড়াইল, নড়াইল, ১৯৮৪
১৩. কালিয়া উপজেলা পরিক্রমা, মহসিন হোসাইন, পৃ. ১০
১৪. বাহারীস্থান-ই গায়বী, মির্জা নাথান অনুবাদ খালেকদাদ চৌধুরী, পৃ. ১৪
ধূসর অতীত; আবুল কালাম শাসসুদ্দীন, যশোরাদ্যদেশ, হোসেনউদ্দিন হোসেন, পৃ. ৩১
১৫. কালিয়া উপজেলা পরিক্রমা, মহসিন হোসাইন, পৃ. ১১
কালিয়া উপজেলার ইতিহাস সংস্কৃতি, মহসিন, হোসাইন, পৃ. ১৬,
১৬. অধ্যাপক সাঈদুর রহমান, (৮০) লোহাগড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয, লোহাগড়া, নড়াইল
১৭. মহম্মদ জালালউদ্দিন বিশ্বাস (৪০) ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক, রূপগঞ্জ, ১৯৮২
১৮. কালিয়া উপজেলা পরিক্রমা, মহসিন হোসাইন, পৃ. ১১ ও কালিয়া উপজেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি মহসিন হোসাইন।
১৯. এখলাসউদ্দিন আহমদ (৪৪) অধ্যাপক, লোহাগড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয়, দবিরউদ্দিন আহমদ (৫৫), গ্রাম মল্লিকপুর ও ডা. খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মাইগ্রাম, লোহাগড়া, ১৯৮৪
২০ অধ্যক্ষ আনারুজ্জামান (৫২), লোহাগড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয়, শেখ আবদুস সবুর (৫০), প্রাক্তন উপজেলা চেয়ারম্যান, লোহাগড়া, নড়াইল, ১৯৮৪
২১. রুমি মুন্সি, (৬৫), নড়াইল, সুনীল বিশ্বাস (৫০), গুয়াখোলা নড়াইল ও মোদাচ্ছের মিয়া (৭০), বরশুলা, নড়াইল, ১৯৮৬
২২. কালিয়া উপজেলা পরিক্রমা, মহসিন হোসাইন, পৃ. ১১
কালিয়া উপজেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মহসিন হোসাইন, পৃ. ২৯
২৩. কালিয়া উপজেলা পরিক্রমা, মহসিন হোসাইন, পৃ. ১০
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষ

বাংলাদেশ ষড় ঋতুর বৈচিত্র্যময় দেশ। পৃথিবীর অন্য কোথাও প্রকৃতির এমন বৈচিত্র্য আছে বলে মনে হয় না। এখনাকার গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত ঋতু যেন বাংলা প্রকৃতির ৬টি মোহনীয় হীরক খণ্ড। ঋতু সমূহের উজ্জ্বলতায় পৃথিবীর নানা দেশের মানুষ এই দেশে ছুটে এসেছেন। তারা বাংলার প্রকৃতির প্রশংসা করেছে দ্বিধাহীন চিত্তে। পরিব্রাজকেরা কখনো কখনো বাংলার প্রকৃতিকে অনুপম সৌন্দর্যের লীলাভূমি বলেছেন। কিন্তু বিপরীত দিকও রয়েছে। আমরা জানি, অন্তর অন্তর ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রকৃতিও তার রূপ বদলায়। তাই প্রকৃতি তার মোহনীয়া রূপ ঝেড়ে নিষ্ঠুর স্বভাবের হয়ে ওঠে। কোনো কোনো শীত ঋতুতে তীব্র শীত অনুভব হয়। জনসাধারণ রীতিমতো অসুস্থতাবোধ করে। আবার খরায় হয় ফসলের ক্ষতি। অতি বন্যায় সব ধ্বংস হয়ে যায়। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি ফসল কিছুই বন্যার হাত থেকে রক্ষা পায় না। ঝড়, প্লাবন, ঘূর্ণিবাত্যা, খরা, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ প্রায় অঙ্গাঅঙ্গি হয়ে আছে। বিপর্যয় আসে চলে যায়। তবে বেশ কিছু বিপর্যয়কে নড়াইল জেলার জনগণ কখনো ভুলতে পারেনি, ভুলতে পারবে না। বিপর্যয়গুলো জেলার অধিবাসীদের মুখে আজো আতংক সৃষ্টি করে বিপর্যয়গুলো নিম্নরূপ:

১৫৮৫ সালের ঝড় : সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে দক্ষিণ বাংলায় দীর্ঘ ৫ ঘণ্টা ব্যাপী প্রচণ্ড বৃষ্টি ও বজ্রপাত হয়। ঐ সময় অনেক ঘরবাড়ি ও নৌকা-জাহাজ বিনষ্ট হয়। যশোর-খুলনায় এই ঝড়ে ২ লক্ষ লোক প্রাণ হারায় বলে আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরিতে' লেখা হয়েছে। ঐ ঝড়ে নড়াইল জেলার অধিবাসী ও বহু ক্ষয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল।[১]

১৬৮৮ সালের ঝড় : সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খানের আগ্রায় বদলি হওয়ার বছর পশ্চিমে হুগলি নদীর মোহনা হতে পূর্বের সুন্দরবনসহ দক্ষিণ মধ্যবঙ্গ ঝড়ে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। নড়াইল জেলাও এই বিপর্যয়ে পতিত হয়েছিল।[২]

১৮৬৪ সালের ঝড় : ১৮৬৪ সালের সম্মুখীন মারাত্মক ঝড়ে কলকাতা ও তার নিকটবর্তী জেলা সমূহের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। এই ঝড়ে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। ঝড়ে নড়াইল জেলার জনসাধারণ ও জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়।[৩]

১৮৬৭ সালের ঝড় : কার্তিক মাসের এই ঝড়ে সাগর দ্বীপ হতে পাবনা পর্যন্ত সমস্ত এলাকার জানমালের অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়। যশোরের কপোতাক্ষ নদীর তীরে ৪ হাত পানি উপচে পড়েছিল। নড়াইল জেলার নবগঙ্গা, মধুমতির চিত্রা, নলিয়া প্রভৃতি নদীতে প্রবল বান আসে। এই সময় নড়াইল জেলার গবাদি পশু ও মানুষের জানমালের ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতির কথা শোনা যায়।[৪]

১৮৬৯ সালের ঝড় : ১৬ মে তারিখের কাল বৈশাখীতে দেশের দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ বরিশাল ও খুলনা জেলায় ঘূর্ণিঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে অগণিত জানমালের ক্ষতি সাধিত

হয়। নড়াইল জেলায় এই ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি কম হলেও মানুষের ঘরবাড়ি চুরমার হয়ে যায় এবং শস্য হানি ঘটে।[৫]

১৯০৯ সালের ঝড় (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) : ১৭ ও ১৮ মে অর্থাৎ ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নিকট গভীর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়ে পুরো একরাতে একদিন ধরে ঝড় হয়। সারা দক্ষিণ-মধ্য-পশ্চিমবঙ্গ এই ঝড়ের আওতায় আসে। নড়াইল জেলায় ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টার প্রায় ৭০ মাইল। মধুমতি, নবগঙ্গা, কালিগঙ্গার জলের উচ্ছ্বাসে সমস্ত এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। মানুষের ঘরবাড়ি, গাছপালা, গবাদি পশু ও শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়।[৬] কালিয়া থানার সরসপুর গ্রামের তফু মোল্লা সরকারের ধুয়াগানে ১৩১৬ সনের ঝড়ের একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। গানটি উদ্ধৃত করা হলো :

তেরশো ষোল সালে
আজগৈবি এক ঝড়ের কথা শোন সকলে
বেল দেড়পারের কালে
কতো কষ্ট লেখছে আল্লাহ বান্দার কপালে
বৃষ্টি মুড়ি খুতবো পড়ি, শিন্নির মাথায় পড়লো বাড়ি
হলো না কারোর কপালে॥

দক্ষিণে ঝড়েতে ভাই উল্টো চালায় কল
খানার মদ্যি ঠেলে ফেলায় রোশোই ঘরের চাল
খটমট বাজে তাল বেতাল,
মোছলমানে বলে আল্লা, কোথায় থেকে আলো বালা
ইবার সারছে সগল কাম
হিন্দুরা বলে রাম রাম॥

আছে দুই রমণী ঘরেতে আমার
দুই রমণী দুই দিকে টানে নড়ার শক্তি নাই আমার
ছেলে বাজান বলে ধরছে মাজা জড়ায়ে
আজানেতে জোর নাই পাই,
আল্লাহ আকবর এদিক উদিক চাই
যিয়ালে বলি হাইয়ে আলার ছালা
মা বলে তফু মোল্যাহ চেয়ে দেখ বাবা ছাগলের কুড়ে নাই॥[৭]

১৯১৯ সালের ঝড় (১৩২৬ বঙ্গাব্দ): ১৯১৯ সালের ঝড় নড়াইলবাসীর নিকট ২৬ সনের ঝড় বলে আখ্যায়িত হয়। রাত ৯/১০ টার দিকে ঝড় শুরু হয়। সারা রাত ও পরের দিন ধরে ঝড় চলতে থাকে। এই ঝড় ছিল আশ্বিন মাসের প্রথম দিকের ঝড়। ১৯০৯ সালের ঝড়ের মতো এই ঝড় তীব্র না হলেও নড়াইল জেলার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সমতল ভূমি বন্যার পানিতে ভেসে যায় ও ধানের ক্ষতি হয়।[৮]

১৯৫২ সালের আমডাঙ্গার ঝড় : এই ঘূর্ণিঝড় জেলার সর্বত্র হয় নি। শুধু লোহাগড়া থানার আমডাঙ্গা আচতাইল, তেঁতুলিয়া, কামঠানা প্রভৃতি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

এই ঝড় ছিল কাল বৈশাখী। বিকেল সাড়ে ৪ টা থেকে ৫ টার মধ্যে প্রথম প্রবল উত্তরে বায়ু বইতে থাকে। হঠাৎ বাতাসের গতিবেগ তীব্র আকার ধারণ করে। ছাই, বালু তুষ ও আবর্জনায় সারা আকাশ ছেয়ে যায়। পরে প্রবল থেকে প্রবলতর বেগে একটানা বায়ু বইতে থাকে। ঐ ঝড়ে আমডাঙ্গা গ্রামের জনৈক বালু মিয়া বাতাসের তীব্রতার ছোনঘরের চালা ধরে রাখেন। ঝড় চালশুদ্ধ বালুমিয়াকে উর্ধ্ব আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যায়। চালের সাথে উড়ে চলার সময় বালুর হাত, পা, মাথা কেটেও থেতলিয়ে যায়। চরনারাণদিয়া গ্রামের জনৈক মজিদ মোল্যাহর ১৭ খানা টিনের ঘর ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এই ঝড় মাত্র আধ ঘন্টার মতো স্থায়ী হয়েছিল। ঝড়ের শেষে মানুষের কান্নায় শোকে আকাশ বাতাস মুহ্যমান হয়ে উঠে। হাজার হাজার লোক গৃহহীন হয়ে পড়ে। মাটির ঘরও দালানকোঠা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

আমডাঙ্গা ঝড়ের পর দিনই তৎকালীন যশোরের জেলা প্রশাসক ঘোড়ায় চড়ে দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন। পূর্ব পাকিস্থানের ত্রাণ মন্ত্রী মফিজুর রহমান ডাক্তার, সেবিকা ও ঔষধপত্রসহ লোহাগাড়ার নবগঙ্গা নদীতে 'সি-প্লেনে' অবতরণ করেন। আহতদের জামা, কাপড়, তাবু ও খাবার বিনামূল্যে দেওয়া হয়। লোহাগড়া উচ্চবিদ্যালয়ে ত্রাণ শিবির ও অস্থায়ী হাসপাতাল খোলা হয়।[৯]

১৯৬১ সালের ঝড় : এই ঝড়ের উৎস ছিল উত্তর বঙ্গোপসাগরের গভীর নিম্নচাপ। উপকুল ভাগে প্রায় ১০০ মাইল বেগে ঝড় বইতে থাকে। ঝড়ে নড়াইল জেলাবাসীর ঘরবাড়ি ও ফসলের প্রচুর ক্ষতি হয়।[১০]

১৯৬৩ সালের হলদা গাছবাড়িয়ার ঝড় : নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানার উত্তর-পশ্চিমে এলাকায় বাংলা ১৩৭০ সনের ২৮ চৈত্র বিকেল ৫ টায় উত্তর-পশ্চিমাকাশে হঠাৎ কালো মেঘ দেখা দেয়, তারপর প্রবলবেগে ঘূর্ণিঝড় গাছবাড়িয়া, কালীনগর, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, রায়গ্রাম, কলাগাছি গ্রামগুলিতে আঘাত হানে। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত এই ঘূর্ণিঝড়ের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ৫ মিনিট। ঘূর্ণিবাত্যা ঐ এলাকায় অল্প সময়ের মধ্যে এক শোকাবহ পরিবেশ সৃষ্টি করে। একমাত্র গাছবাড়িয়া গ্রামে ১০০ শত লোক নিহত হয়। কলাগাছির গোবিন্দ মালোর স্ত্রী অন্তঃসত্তা ছিল। টিনের ঘরের চালের আঘাতে তার পেট কেটে সন্তান বেরিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। ব্রাহ্মণডাঙ্গার তহশিল অফিস (ইমারত) ভেঙ্গে পড়ে তহশিলদারসহ ইঁদরিস, উর্বশি, আখতার, করিম মাতব্বর প্রমুখ প্রাণ হারায়। আরো বিস্ময়কর ঘটনা হলো, গাছবাড়িয়া গ্রামের একটি তালগাছে কাঁসার বাটি সেঁধে থাকতে দেখা যায়। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, এই বাটিটি মুহম্মদপুর থানার (মাগুরা) ভবানী-পুর গ্রামের মোতালেব মিয়ার বাড়ি হতে উড়ে এসে গাছবাড়িয়ার তালগাছে আঘাত করে। গাছবাড়িয়া থেকে ভবানীপুরের দূরত্ব প্রায় ১৪ মাইল। কাঁসার বাটির গায়ে মোতালেব মিয়ার নাম ঠিকানা লেখা ছিল। উল্লেখ্য, মুহম্মদপুর এলাকায়ও সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল।

হলদা, গাছবাড়িয়ার ঝড়ে অসংখ্য গবাদি পশু মারা যায়। ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঘরের টিনগুলো ভেঙেচুরে ছেড়া কাগজের ন্যায় মাইলের পর মাইল উড়ে যায়।[১১] ঝড়ের পরদিনই দুর্গত এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি ভাবে ত্রাণ তৎপরতা চলে। পুর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান সি-প্লেন যোগে নবগঙ্গায় অবতরণ করেন। স্পিড বোটে দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন।

উপরে বর্ণিত ঝড়সমূহ ছাড়াও ১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৬৬, ও ১৯৭০ সালের ঝড় নড়াইল জেলাবাসীকে ক্ষতিগ্রস্ত ও আতংকিত করে।

১৯৩৮ সালের বন্যা

১৯৩৮ সালে নড়াইল জেলার সর্বত্র গঙ্গার অতিরিক্ত পানি নবগঙ্গা হয়ে ফসলাদি ও বাসগৃহের দারুণ ক্ষতি করে। এর পরপরই এলাকায় নেমে আসে ভয়াবহ মন্বন্তর ও মহামারি। লোকেরা বাঁশের মাচালের ওপর আশ্রয় নিয়ে বাস করতে থাকে। গবাদি পশুরও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়।[১২]

১৯৭১ সালের বন্যা

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে দক্ষিণ বাংলার সর্বত্র বন্যায় তলিয়ে যায়। নড়াইল জেলাবাসীও বন্যায় মানবেতর জীবন যাপন করে।

১৯৬৯-৭০ সালের দুর্ভিক্ষ (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর)

বাংলা ১১৭৬ সালের মন্বন্তরকে আজো লোকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলে চিহ্নিত করে। ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ মুঘল বাদশাহের নিকট হতে দেওয়ানি লাভ করেন (কোম্পানির পক্ষ থেকে)। বাংলাদেশে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়। শাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থার চরম গাফলতি কর্মচারিদের অসাধুতার জন্য ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নেমে আসে। খাদ্যাভাবে সারাদেশে লোক মারা যেতে থাকে। অপুষ্টি ও অখাদ্য গ্রহণের জন্য অবস্থা আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করে। বাংলার ১/৩ অংশ লোক এই মন্বন্তরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নড়াইল জেলার উপরও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে অশুভ প্রভাব পড়েছিল।[১৩]

১৯৪৩ সালের মন্বন্তর (১৩৫০) : ১৯৪২ সালে বাংলার অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদিত এলাকাসমূহে বন্যার জন্য ফসলের মারাত্মক ক্ষতি সাধন হয়। এ ছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন দেশের দ্বার গোড়ায়। বর্মা জাপানের দখলে, চট্টগ্রাম সীমান্তের অদূরে জাপানি সেনাবাহিনী উপস্থিত। দেশের যানবাহনসমূহ যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত। ঠিক এই পরিস্থিতে সারা বাংলায় আকাল বা মন্বন্তর নেমে আসে। ১৯৪৩ সনের মন্বন্তরকে লোকেরা পঞ্চাশ সনের মন্বন্তর বলে। দেশের অনাহার ও অপুষ্টিজনিত কারণে ২০ থেকে ২৫ লক্ষ লোক মারা যায়। পঞ্চাশ সনের মন্বন্তরকে অধিক ভয়াবহ করে তোলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন 'মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি'। এই সময় নড়াইল জেলাও দারুণ মন্বন্তরের সম্মুখীন হয়। কিছুলোক অনাহারেও মারা যায়। আবার অনেকে পুষ্টিহীনতায় ও রোগভোগে দুঃসহ যন্ত্রণায় কাল কাটায়।

১৯৭৪-১৯৭৫-এর মন্বন্তর

১৯৭৪ সালের বন্যায় যেমন ব্যাপক ফসল হানি ঘটে তেমনি রাজনৈতিক অস্থিরতার সারাদেশে এক ভয়াবহ মন্বন্তর দেখা দেয়। ঐ সময় লবণ ৪০/৪২ টাকা সের দরে বিক্রি হয়। শুকনো মরিচের সের ১০৫ টাকায় বিক্রি হয়। অনাহার ও অপুষ্টিতে নড়াইল জেলায়ও মন্বন্তর দেখা দেয়। বেশ কিছু লোক অনাহার ও অপুষ্টিতে ভুগে মারা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. খুলনা জেলা, মোঃ নুরুল ইসলাম, '১৯৮১, পৃ. ৮
২. Imperial Gazettee, vol xll (p. 110), 1931
৩. Bengal VIDE Lieutenant Governars, vol-1 (p. 298)
৪. যশোহর-খুলনার ইতিহাস, শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, (১ম খণ্ড) পৃ. ৫৯
৫. খুলনা জেলা, মোঃ নুরুল ইসলাম পৃ. ১০৯-১১০
৬. Bangladesh District Gazettees, Jessore.
৭. কালিয়া উপজেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মহসিন হোসাইন, পৃ. ২৪
৮. খুলনা জেলা, মোঃ নুরুল ইসলাম, পৃ. ১১০
৯. এডভোকেট ওমর ফারুক, লক্ষীপাশা, লোহাগড়া, শেখ আবদুস সবুর, সরশুনা ও অধ্যক্ষ আনারুজ্জামান, লোহাগড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয়
১০. প্রাগুক্ত
১১. এখলাসউদ্দিন আহমদ (৫৫) ও মোঃ সাঈদুর রহমান (৪৪), অধ্যাপক আদর্শ লোহাগড়া মহাবিদ্যালয়, নড়াইল
১২. মোঃ লোকমান মোল্লা (৮২), ছয়ানিপাড়া, কলাবাড়িয়া, কালিয়া, ১৯৭৯
১৩. W. W. Hunter, Annals of Rural Bengal, Appendix-6, p, 360

নড়াইল জেলার ঐতিহাসিক বিবরণ

নড়াইল জেলার সামাজিক ও রাজনৈতিক বৃত্তান্ত আলোচনা বেশ শ্রমসাধ্য। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, সাহিত্য ও ধর্মপুরাণই আমাদের আলোচনার প্রাথমিক ভিত্তি। আরো একটু স্পষ্ট করে বলতে গেলে প্রাচীন শাসকদের শিলালিপি, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও স্থাপত্যকীর্তি, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন সাহিত্য ও উপাখ্যান, পরবর্তীকালের লেখা ইতিহাস, বিদেশী পর্যটকদের রচনাবলী ও বিজ্ঞলোকদের সাক্ষাৎকারের বিষয় নিয়ে বর্তমান অংশটি লেখা হয়েছে।

আমরা ভূমিগঠন পর্বে আলোচনা করেছি এক সময় নড়াইল জেলা ছিল বিশাল জলাশয়ের মধ্যে দ্বীপময় অঞ্চল। ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্য ভূ-ভাগ আদিকালে উপদ্বীপ, বদ্বীপ, গাঙ্গেয় বদ্বীপ, বকদ্বীপ প্রভৃতি নামে পরিচিতি পায়।[১] সুন্দরবন বর্তমান নড়াইল জেলার সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছিল। 'বৃহৎ সংহিতায়' উপবঙ্গ জনপদের সন্ধান পাওয়া যায়। 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থে বৃহত্তর যশোর ও তার সন্নিহিত এলাকাকে বলা হয়েছে 'উপবঙ্গ'। 'বৃহৎ সংহিতায়' লেখা হয়েছে : উপবঙ্গে যশোরাদ্য : দেশ : কানন সংযুক্তা'।[২] এই সময় বিভিন্ন দ্বীপভূমির নড়াইল জেলা এলাকা গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল।

হিন্দুপুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, অন্ধমুনি দীর্ঘতমার ঔরসে বঙ্গের রাজা বলির মহিষী রাণী সুদেষ্ণর গর্ভে ৫টি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়।[৩] এরা যথাক্রমে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। বঙ্গ নামীয় সন্তানটির বংশধরেরা পরবর্তীকালে বাঙালি জাতির সৃষ্টি করেছে। তাদের আবাসস্থান হলো বঙ্গ বা বাংলা। প্রাচীন নড়াইল জেলাও বঙ্গের একটি অংশ হিসেবে প্রাচীন বাঙালিদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। গোলাম হোসেন সেলিমের 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' গ্রন্থে উল্লেখ আছে (ফিরিস্তা প্রমুখ ঐতিহাসিকের বরাত দিয়ে) : হযরত নূহ নবীর সময়ে বিশ্বে যে মহাপ্লাবন হয় তাতে পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হয়। শুধু নূহ নবীর সঙ্গীসাথী ও পশুপক্ষীকূল জীবিত ছিল।[৪] 'নূহ নবীর পুত্র হাম, হামের পুত্র হিন্দ এবং হিন্দের অন্যতম পুত্রের নাম ছিল বং (বঙ্গ)। বং-এর সন্তানেরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করায় দেশের নাম হয় বঙ্গ। এখানে পূর্বকালে যেসব ঢিবি বা স্তূপ তৈরি হতো তাকে বলা হতো "বাংগলা"।[৫] গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণায় জানা যায়, প্রাচীনকালে নড়াইল জেলার ভূমিখণ্ডেও লোকবসতি ছিল। তাই বং জাতির শাসনামলে নড়াইলও তাদের দ্বারা শাসিত হতো।

রামায়ণে বর্ণিত রাজা দশরথ তার দ্বিতীয় স্ত্রী কৈকেয়ীর অভিমান ভাঙাতে গিয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে তার শখের জিনিষপত্র এনে দিতে চেয়েছিলেন। উল্লিখিত দেশের নামগুলোর মধ্যে বঙ্গদেশের নামও উল্লেখ আছে। সীতাদেবীর পিতৃভূমির নাম ছিল মিথিলা। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা ও বাংলাদেশের রাজশাহী মিথিলা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৬] যশোরের সাগরদ্বীপ অন্যতম প্রাচীন স্থান। এখানে কপিলেশ্বর মুনির (সাংখ্যকার কপিল নয়) আশ্রম বর্তমান। কপিলেশ্বরের ভাই বাসুদেব পৌণ্ড্রবর্ধনের রাজা ছিলেন। ঐতিহাসিকের ধারণা, যশোর নড়াইল জেলার ভূখণ্ড রাজা বাসুদেবের শাসনাধীনে ছিল।

বাসুদেব ছিলেন প্রাচীন বাংলার বীরশাসক ও অনার্য ব্রাত্যক্ষত্রিয়। বাসুদেব আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করেছিলেন। মহাকাব্য মহাভারতে উল্লেখ আছে, বাসুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হয়েছিলেন। সঙ্গত কারণেই বলা চলে বর্তমান যশোর ভূমিখণ্ড তথা নড়াইল জেলার ভূমিখণ্ড রাজা বাসুদেবের শাসিত অংশ ছিল। আমরা এবার মহাভাবতের ভীষ্মপর্ব হতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করবো যেখানে বাসুদেবের উল্লেখ আছে :

'তখন মহারাজ দুর্যোধন শরাসন গ্রহণপূর্বক সিংহের ন্যায় ধ্বনি করতঃঘটোৎকচের প্রতি ধাবমান হইলেন। বঙ্গাধিপতি সদস্রাবী পর্বত সদৃশ দশ সহস্র কুঞ্জরসমাজ ব্যবহারে তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। ...তখন ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল... মহাবীর ঘটোৎকচ দুর্যোধনের আলিঙ্গনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া দুর্যোধনকে সংহার করিবার মানসে... পর্বত বিদারণক্ষম মহাশক্তি সমুদ্যত করিলেন। মহাবীর বঙ্গাধিপতি সেই মহাশক্তি সমুদ্যত দেখিয়া সত্বরে শ্রীঘ্রগামী পর্বত সদৃশ কুঞ্জরে আরোহণ পূর্বক ঘটোৎকচের অভিমুখে দুর্যোধনের রথপথে উপস্থিত হইয়া রথ আবরণ করিলেন। মহাবল ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া সেই সমুদ্যত শক্তি বঙ্গাধিপতির গজের উপর নিক্ষেপ করিলেন। করীবর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে বঙ্গাধিপ সত্ত্বর গজ হইতে অবতরণ করিলেন, সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, মহাভারতীয় যুগে নড়াইল জেলা তথা বকদ্বীপের শৌর্য ছিল অপরিসীম।

'পাণিনির মহাভাষ্যে' পতঞ্জলি প্রাচীন আর্যবর্তের সীমা নির্দেশ করতে গিয়ে আর্যবর্তের পূর্বভাগকে বলেছেন, 'কালকবন'। এই 'কালকবনই' বর্তমান বিশ্ববিখ্যাত সুন্দরবন।[৭] 'দ্বিগ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থে যশোর তথা নড়াইলকে উপবঙ্গ বলা হয়েছে। বরাহ মিহিরের 'বৃহৎ সংহিতায়'ও এই কথা বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে লেখা আছে : উপবঙ্গে যশোরাদ্যাদেশ : কানন সংযুক্তা।[৮] এইভাবে আমরা জানি, নড়াইল জেলা এক সময় গভীর সুন্দরবনের অংশ ছিল। নড়াইল জেলার ইতনা, মল্লিকপুর, দিঘলিয়া, কাশিপুর, লোহাগড়া, কলাবাড়িয়া, কালিয়া, পেড়ুলি, নড়াইল, রূপগঞ্জ, শেখপুরা, নলদি, জগন্নাথপুর, তুলারামপুর প্রভৃতি গ্রামে পুকুর খনন করতে গিয়ে আবিস্কৃত হয়েছে প্রাচীন কালকবন বা সুন্দরবনের সুন্দরী কাঠ (বৃক্ষ), বাঘ, হরিণ, কুমির ও জলহস্তীর ধ্বংসাবশেষ ও ফসিল।[৯] দ্বীপময় অরণ্যে লোকবসতি ছিল। বকদ্বীপ বা বা-দ্বীপের ঐ অধিবাসীদের বলা হতো 'বাগদি'। বাগদি জনগণ অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও মৎস্য শিকারি ছিল। ভাত ও অন্যান্য খাবারের সঙ্গে তারা বেশি বেশি মৎস্য আহার করতো। নড়াইল জেলার উঁচু বা টিলাভূমির উপর অতি প্রাচীনকালের যে লোকবসতির সন্ধান পাওয়া যায় তারাই বাগদি বর্তমান নড়াইল জেলার কল্যাণপুর, কালীনগর, গাছবাড়িয়া, কলাবাড়িয়া, দক্ষিণ আমাদা, নারায়ণদিয়া, পদুমা, সরগুনা, গাছবাড়িয়া, এগারখানি, 'আগ্রাহাটি, ডুমদি, প্রভৃতি গ্রামগুলো আজো দ্বীপময়। ঐ ধরনের টিলার কোনো কোনো গ্রামে আজ আর লোকবসতি নেই। উল্লিখিত গ্রামের মাটি খনন করলে প্রাচীন বসতের চিহ্ন, জালের কাটি, সামুদ্রিক কড়ি, প্রাচীন মেটে পাত্রের ভগ্নাংশ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন বাগদি জাতির লোকেরা স্থানসমূহে শত শত বছরব্যাপী যে বসবাস করতো তা সহজে অনুমান করা যায়। ইতনা, লাহুড়িয়া, মল্লিকপুর, জয়পুর, গ্রামগুলোর নামসমূহ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। উল্লিখিত গ্রামগুলোর বর্তমান নামসমূহের আড়ালে রয়েছে অনেক

প্রাচীন টিলাময় গ্রাম। যেমন লাহুড়িয়া পঁচাশি (৮৫) পাড়া। উল্লিখিত গ্রামের মাটি খননে হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের স্মারক পাওয়া যায়।[১০]

১৯৮৩ সালে ইতনা গ্রামের জয়নাল আবেদীনের বসতবাটির সন্নিহিত 'বাটভিটা' খননের ফলে ৯ হাত মাটির গভীরে প্রায় ২ হাজার বছরের পাকা ইমারত, ইদারা ও মাটির অক্ষত পাত্রাদি পাওয়া যায়।[১১] দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় এই খবর পরিবেশিত হলে ঢাকার জাতীয় যাদুঘর থেকে দুবার অনুসন্ধান টিম গিয়ে স্থানটি পরিদর্শন করেন। এরূপ দুটি প্রাচীন ভিটি কলাবাড়িয়া গ্রামের দশানিপাড়া বা মোল্যাপাড়ার 'রায়ের ভিটি' ও 'মুন্সির ভিটি' এ ধরনের প্রাচীন ভিটি বা টিলার সন্ধান পাওয়া যায় নড়াইলের দক্ষিণ পশ্চিম এলাকার শেখপুরা গ্রামে। এই সব ভিটিতে অনুসন্ধান করলে হাজার হাজার বছরের প্রত্ন-নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে।[১২]

কিছুকাল আগে পশ্চিম বাংলার অজয় নদীর তীরে 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' আবিস্কৃত হওয়ায় প্রাচীন বাংলা তথা উপবঙ্গ কিংবা ব-দ্বীপে যে সভ্য মনুষ্যবাস ছিল প্রত্নতত্ত্ববিদরা তা সহজেই ধারণা করতে পেরেছেন।[১৩] এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক–গবেষক রমেশচন্দ্র মজুমদার তার বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন :

১৯৬২ ও ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে অজয় নদীর দক্ষিণে 'পাণ্ডু রাজার ঢিবি'তে খুব ব্যাপকভাবে এবং নিকটবর্তী আরও কয়েকটি স্থানে সামান্যভাবে মাটি খনন করিয়া যে সমুদয় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও নানাবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া কোনো কোনো পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'খ্রিষ্ট জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সিন্ধুনদের উপত্যকায়, মধ্য ভারতের ও রাজস্থানের অনেক জায়গায় যেমন তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা ছিল বাংলাদেশের এই (সম্ভবত অন্য) অঞ্চলেও সেই রূপ সভ্যতা সম্পন্ন মনুষ্যগোষ্ঠী বাস করিত।'

'পাণ্ডুরাজার ঢিবির লোকেরা নৌকা করিয়া, দূরদেশে ও বিদেশে সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। মশলা, সূতারবস্ত্র, গজদন্ত, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র এবং সম্ভবত হীরক ও চিনি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ছিল।" 'সুতরাং প্রাচীন যুগে অন্তত তিন হাজার বছর অথবা তাহারও পূর্বে যে বাংলাদেশের এই অঞ্চলে সু-সভ্য জাতি বাস করিত ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।'

এইভাবে আমরাও আর সি মজুমদারের সাথে একমত হয়ে বলতে পারি যশোর তথা নড়াইল জেলাও হাজার হাজার বছর পূর্বে সভ্য মনুষ্যবসতির স্থান ছিল।

আধুনিক গবেষকগণ এই ধারণা পোষণ করেন যে, মহাভারত রচনার যুগে এমনকি তার পূর্ব থেকেই বর্তমান বাংলাদেশ খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কোনো কোনো সময় বিশেষ পরাক্রমশালী রাজা একাধিক রাজ্য অধিকার করে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। মহাভারতের উল্লিখিত অঙ্গরাজ্য কর্ণের অধীনে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকাংশ স্থান নিয়ে একটি বিশাল রাজ্য ছিল। খ্রিঃ পূর্ব ৩২৭ অব্দে যখন আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন বাংলাদেশে গঙ্গারিডাই বা গঙ্গরিডি নামক এক শক্তিশালী যোদ্ধাজাতির সন্ধান পাওয়া যায়।[১৪] এই জাতি যে, প্রাচীন বাঙালি জাতির প্রতিভূ এতে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো কোনো লেখক গঙ্গানদীকে ঐ গঙ্গারিডিদের রাজ্যের পশ্চিম সীমানা বলে উল্লেখ করেছেন। তা হলে, আমাদের পূর্ব বর্ণিত ভাগিরথী-পদ্মার মধ্যবর্তী

উপবঙ্গই যে গঙ্গারিডি রাজ্য তা সহজেই অনুমেয়। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে গঙ্গারিডির রাজধানী কোথায় ছিল? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। কারো কারো মতে, প্রাচীন যশোরের মুরলি, কারো কারো মতে বিখ্যাত প্রাচীন বারবাজার, কেউ আবার মত প্রকাশ করেছেন বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়ায়। গঙ্গারিডির রাজধানী যেটাই হোক তা বর্তমান ক্ষুদ্র জেলা নড়াইলেরই সীমান্তবর্তী। এই ভাবে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, নড়াইল জেলা যে কোনো বিচারে গঙ্গারিডি রাজ্যের অংশবিশেষ ছিল। গঙ্গারিডি রাজ্য সম্বন্ধে সমসাময়িক গ্রিক ঐতিহাসিক লিখেছেন : 'ভারতবর্ষে বহুজাতির বাস। তন্মধ্যে গঙ্গারিডি জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ (অথবা সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী)। ইহাদের চারিসহস্র বৃহৎকায় সুসজ্জিত রণহস্তী আছে, এই জন্যই অপর কোনো রাজা এই দেশ জয় করিতে পারেন নাই। স্বয়ং আলেকজান্ডারও এই সমুদয় হস্তীর বিবরণ শুনিয়া এই জাতিকে পরাস্ত করিবার দুরাশা ত্যাগ করেন।'

পণ্ডিতদের মতে খ্রিঃ পূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী হতে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে 'মহাভারত' মহাকাব্য বর্তমান আকার ধারণ করে। মহাভারতের বর্ণনা ও গ্রিক ঐতিহাসিকের বর্ণনা উপবঙ্গ তথা নড়াইল জেলার প্রাচীন ইতিহাসের এক যুগকে সূচিত করে।

অঙ্গাধিপতি কর্ণ ও গঙ্গারিডি রাজার নাম জানা যায় না–যারা এক সময় বঙ্গ তথা উপবঙ্গ তথা নড়াইল জেলার ভূমি খণ্ডের শাসক ছিলেন। এরপরের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। কারণ ঐ সময়ে বিদেশী পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের রচনা ছাড়া দেশীয় লোকের কোনো লেখা পাওয়া যায় নি।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে শ্রীগুপ্ত নামীয় রাজা গুপ্ত বংশীয় শাসন কায়েম করেন। তিনি বাংলাসহ ভারতের বিশাল অঞ্চল তার শাসনাধীনে আনেন করেন। শ্রীগুপ্ত গুপ্তবংশীয় সম্রাটদের আদি পুরুষ বলে জানা যায়। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত যখন ভারত বর্ষে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, ঐ সময় বাকুড়ার সিংহবর্মা ও চন্দ্রবর্মার নাম জানা যায়। অনেকের ধারণা, সিংহবর্মার রাজধানী ছিল বাকুড়ায়। তার পুত্র চন্দ্রবর্মা বাকুড়া হতে সমগ্র উপদ্বীপ শাসনাধীনে আনেন। বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া গ্রামে 'চন্দ্রবর্মকোট' নামীয় একটি দুর্গ ছিল। দুর্গটি রাজাচন্দ্রবর্মা নির্মাণ করেছিলেন বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা।[১৫] ঐতিহাসিকেরা আরো মত প্রকাশ করেন, বাকুড়া হতে ফরিদপুর পর্যন্ত সমগ্র ভূ ভাগের শাসক ছিলেন চন্দ্রবর্মা। এই ভাবে বৃহত্তর যশোর জেলাসহ নড়াইল জেলা রাজাচন্দ্রবর্মার শাসনাধীনে ছিল। সমুদ্রগুপ্ত রাজাচন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করে সমগ্র পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলা অধিকার করেন। অর্থাৎ এরপর নড়াইল জেলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উপবঙ্গ ছাড়াও বাংলাদেশের পূর্বভাগ অর্থাৎ 'সমতট' সমুদ্রগুপ্তের করদরাজ্যে পরিণত হয়।

অন্তর্বিদ্রোহ ও বারবার হূণজাতির আক্রমণে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গুপ্ত শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময়ে যশোধবর্মণ নামের এক বীর সমগ্র আর্যবর্ত দখল করেন। তার জয়স্তম্ভে লেখা আছে, তিনি পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। এই সময় দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য সৃষ্টি হয়। কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনে এই

তথ্য পরিবেশিত হয়। এই সময়কার শক্তিমান শাসকেরা হলেন, গোপালচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব। এই রাজাদের শাসিত অঞ্চল পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ। নড়াইল জেলার গুপ্ত শাসন মুক্ত রাজাদের দ্বারা কিছুকাল শাসিত হয়েছিল। এরপর গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নড়াইল জেলা। স্বাধীন গৌড়রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গুপ্ত সম্রাটদের কোনো এক উত্তর পুরুষ। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই রাজ্যের রাজা ছিলেন মহাসেন গুপ্ত। গুপ্তশাসনামলে শশাংক একজন মহাসামন্ত বা রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে 'মহাসামন্ত' রাজা শশাংক গৌড়ের সিংহাসনে আসীন হন। সমগ্র বৃহত্তর যশোর তথা নড়াইল জেলা ঐ সময় রাজা শশাংকের শাসনাধীনে চলে যায়। প্রায় ৫৫ বছর আগে নড়াইল জেলার উত্তর দিকে মাগুরা জেলার মুহম্মদপুর থানার এলেংখালি (মধুমতি) নদীর কাছে একটি পুকুর খননকালে ৩টি প্রাচীন মুদ্রা আবিস্কার হয়। নড়াইল জেলার সীমান্ত হতে মুদ্রা প্রাপ্তির স্থানের দূরত্ব ৬/৭ মাইলের বেশি নয়। ৩টি প্রাচীন মুদ্রার ১টি গুপ্ত শাসনামলের। আর বাকি ২টি মুদ্রা গুপ্ত পরবর্তী শাসনামলের। গুপ্ত শাসনামল ছিল ৩৪০ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩৭৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।[১৬]

শশাংকের গৌড়ের সিংহাসন আরোহণ বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবজনক অধ্যায়। বাংলার শাসক হয়েও তিনি সর্বভারতীয় ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলেন। রাজা শশাংকের শাসনকালের কিছু পরে রাজা আদিশূর গৌড়ের শাসনভার গ্রহণ করেন। নড়াইল জেলা ও উপবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চল আদি শূরের শাসনাধীনে ছিল। তখন নড়াইল জেলায় আদি বাগদি ও বৌদ্ধধর্মীয় সমাজই প্রাধান্য বিস্তার করে। নড়াইল জেলার কোথাও ব্রাহ্মণ্যবাদের সামান্যতম ছোঁয়াচও লাগে নি।

আদিশূরের রাজত্বের শেষদিকে দেশ নানাদিক থেকে আক্রান্ত হতে থাকে। যাব ফলে গৌড়রাজ্যের ঐক্য বিনষ্ট হয়। এবং সারাদেশে বেঙের ছাতার ন্যায় অসংখ্য রাজ্য ও রাজধানীর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। বাংলার ঐ অবস্থাকে ঐতিহাসিকেরা 'মাৎস্যন্যায়' অবস্থা বলে থাকেন। বাংলায় ঐ সময় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এই অবস্থা ছিল ১০০ থেকে ১৫০ বছর পর্যন্ত।[১৭] অনুমান করা যায়, নড়াইল জেলার শেখহাটি ও নয়াবাড়িতে দুটো স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। বর্তমান নড়াইল জেলার সদর থানার ৭ মাইল উত্তরে নবগঙ্গা নদীর তীরে নয়াবাড়ি গ্রামে এক অখ্যাত রাজার রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। এই রাজার কোনো রাজপ্রাসাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে প্রায় ২৭০ গজ দীর্ঘ এবং ২৫০ গজ প্রস্থ বিশিষ্ট উঁচুস্থানের চতুর্দিকে ৩০০ গজ প্রস্থ পরিখা বা গড়বেষ্টিত নিম্ন খাতের চিহ্ন বিদ্যমান। যদি ঐ দুর্গটি আক্রান্ত হয় তা হলে রাজা ও তার রাজ পরিবারের লোকজন যাতে প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করতে পারেন তার জন্য নিকটবর্তী নবগঙ্গা ঘাট পর্যন্ত ভূ-গর্ভে পাকা সুড়ঙ্গ পথ ছিল। এই সুড়ঙ্গপথ প্রাচীনকালের পাতলা ইট ও চুন সুরকি দ্বারা নির্মিত। হয়তো ভূ-গর্ভে দালানও ছিল। কিন্তু কালের গ্রাসে আজ সবকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। 'মাৎস্যন্যায়' আমলের এই রাজার নাম জানা নেই। ধারণা করা যায়, ঐ নয়াবাড়ির রাজাকর্তৃক বর্তমান নড়াইল জেলার কিছু অংশ শাসিত হতো। নাম অজ্ঞাত এই রাজাকে স্থানীয় লোকেরা বলে 'পাতালভেদী রাজা'। এ ছাড়া ইতনায় ব্যাপক খনন কার্য চালালে হয়তো 'মাৎস্যন্যায়' আমলের কোনো ক্ষুদ্র রাজার রাজবাড়ির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

'মাৎস্যন্যায়' অবস্থায় দেশে অশান্তি ও অরাজকতা বিদ্যমান থাকায় শক্তিমান লোকেরা চুরি ডাকাতি ও লুটপাটে অভ্যস্ত ছিল। এই চুরি ও অপহরণে কোনো দ্বিধা ও সংকোচ ছিল না। লুটেরারা এই কাজকে যথার্থ সম্মানীয় ও বীরোচিত কাজ বলে ধরে নিয়েছিল। লোহাগড়া থানার নলদি ইউনিয়নের বারোইপাড়া গ্রামে তেমনি সুসংগঠিত চোর ডাকাতের সন্ধান পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকের মুখে ওরা 'বারোইপাড়ার চোর' বলে পরিচিত হয়ে আসছে। ঐ চোরদের মূল লক্ষ্য ছিল সম্পদ অপহরণ ও সঞ্চয়। বারোইপাড়ার চোরদস্যুদের সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদের মুখে একটি লোকছড়া শোনা যায়:

তিনশো ষাইট আড়া
তার ভিতর বারোইপাড়া
বেলা হইলো ঘোর
বেরোলো বারোইপাড়ার চোর।

অর্থাৎ ৩ শত ৬০টি আড়া বা গড়বেষ্টিত বাড়ি নিয়ে বারোইপাড়া গ্রাম, বেলা শেষে সন্ধ্যা হলে চোরেরা তাদের স্বভাবসিদ্ধসম্পদ অপহরণে বেরিয়ে পড়ে। স্থানীয় প্রাচীন লোকদের সাক্ষাতকারে জানা যায়, সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বারোইপাড়ার চোর-দস্যুরা নলদির মুচিপাড়ার খালের মধ্য দিয়ে নৌকাযোগে নবগঙ্গা নদী হয়ে দূরদূরান্তে চুরি ডাকাতির জন্য বেরিয়ে পড়তো। আমরা ক্ষেত্রানুসন্ধানে বারোইপাড়া গ্রামে গিয়েছিলাম। সেখানে শত শত প্রাচীন উঁচু ঢিবি বিদ্যমান। ঢিবি বা বসত ভিটাগুলো এখন জনশূন্য। বারোইপাড়ার দস্যুরা কতকাল তাদের চৌর্যবৃত্তি চালিয়েছিল তা আজ আর অনুমান করা যায় না। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ পর্যন্ত ঐ স্থানে হিন্দুদের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করতো।

মালদহ জেলার (ভারত) অন্তর্গত খালিমপুর গ্রামে আবিস্কৃত একখানি তাম্রশাসন হতে জানা যায় :

মাৎস্য ন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতি ভির্লক্ষণা : করং গ্রাহিত :।
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতিশ শিরসাং চূড়ামনিস্ত্য সুত:।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই শ্লোকের অনুবাদ করেছেন : 'দুর্বলের প্রতি সবলের (অত্যাচারমুলক) মাৎস্যন্যায় (অরাজকতা) দূর করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুঞ্জে যাহাকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়া (রাজা নির্বাচিত করিয়া দিয়াছে)... নরপালকুল চূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা (বপ্যট) হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।' কিংবদন্তি আছে, রাজা গোপাল রাণীর হাত থেকে প্রাণে রক্ষা পেয়ে রাজদণ্ড শক্ত হাতে ধরেছিলেন। এই গোপালের উত্তর বংশধরেরাই বাংলার ইতিহাসে বিখ্যাত 'পাল রাজন্যবর্গ।'

পাল শাসনামল

গোপাল রাজশক্তি হাতে নিয়ে সারা বাংলাদেশে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন। নড়াইল জেলা হতে 'মাৎস্যন্যায়' অবস্থার অবসান ঘটে। গোপাল কত বছর বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন তা বলা যায় না। তবে 'আর্যমঞ্জশ্রী মূলকল্প' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, গোপাল ২৭ বছর বাংলা শাসন করেছিলেন। তিনি আনুমানিক ৭৫৬ হতে ৭৮১ সন

পর্যন্ত বাংলার সার্বভৌম রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গোপাল শুধু বাংলা নয় বাংলার বাইরেও তার রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। রাজ্যের সীমা ছিল সমুদ্র পর্যন্ত। তার শাসনামলে বর্তমান নড়াইল জেলাসহ সমগ্র এলাকা পালরাজ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।[১৮]

গোপালের মৃত্যুর পরে তার পুত্র ধর্মপাল বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধর্মপাল ৭৭৯ খ্রিস্টাব্দ হতে ৮১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সিংহাসনে আসীন ছিলেন। পর্যায়ক্রমে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী গোপালের বংশধরগণ প্রায় ৪ শত বছর বাংলার সার্বভৌম রাজা ছিলেন। আর নড়াইল জেলা বরাবরই পাল শাসনাধীনে থেকে সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। এই বংশের রাজা মহিপাল ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দ হতে ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। মহিপালের রাজত্বকালের বরেন্দ্র অর্থাৎ উত্তর বাংলার কৈবর্ত নায়ক দিব্য বা দিব্যেবাক পাল শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' গ্রন্থে দিব্বোকের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। মহিপাল উত্তর বাংলার কৈবর্ত নায়ক দিব্যেবাকের হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেও পূর্ব-দক্ষিণ–পশ্চিমবঙ্গ পাল শাসকদের কর্তৃত্বই ছিল।[১৯] তাই নড়াইল জেলাও উপবঙ্গ বরাবর পাল শাসনাধীনেই বর্তমান ছিল। পাল রাজবংশের শেষ রাজা মদন পাল ১১৪৩ খ্রিঃ হতে ১১৬১ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। মদনপালের শাসনামলে রাঢ় অঞ্চলের সামন্ত রাজা বিজয় সেন ক্ষয়শক্তির অধিকারী হন। তিনি দুর্বল পাল রাজাদের বিভিন্ন যুদ্ধে সহায়ক শক্তি হয়ে সাহায্য করেছিলেন। মদনপালের শাসনামলের (১১৪৩-১১৬১) শেষদিকে বৈদ্যরাজা বিজয় সেন গৌড়ের শাসনদণ্ড ধারণ করেন। এবং এইভাবে বৌদ্ধপাল শাসনের স্বর্ণযুগের অবসান ঘটে।

প্রাচীন বাংলার শাসন ব্যবস্থায় নড়াইল

প্রাচীন যুগের বাংলার শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অতি সামান্য। গুপ্ত যুগে পুণ্ড্র, বঙ্গ, গৌড় নামীয় উপজাতীয় নামের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রাচীন বাংলায় উপজাতীয় রাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। রাজ্যের কোনো অংশের শাসকদের তখন বলা হতো 'মহাসামন্ত'। যে সমস্ত অঞ্চল সরাসরি কেন্দ্রীয় শাসক বা রাজা কর্তৃক শাসিত হতো সেই অঞ্চলের কতগুলি সুনিয়ন্ত্রিত প্রশাসনিক ভাগ ছিল। যেমন সর্ববৃহৎ ভাগটির নাম ছিল 'ভুক্তি'। ভুক্তিকে বর্তমানকালের প্রশাসনিক 'বিভাগ' বলা যেতে পারে। ভুক্তির অধীনে থাকতো কয়েকটি 'বিষয়'। বিষয়কে বর্তমানকালের জেলার সাথে তুলনা করা যায়। বিষয়ের অধীনে ছিল 'মণ্ডল', 'বীথি' ও গ্রাম।[২০] দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় গুপ্ত যুগে একটি নামহীন ভুক্তি প্রশাসনের অবস্থান জানা যায়। আমরা এই 'ভুক্তি'টিকে 'বাগড়ি' ভুক্তি বলে মনে করি। এই 'বাগড়ি' ভুক্তির এক সময়কার রাজধানী ছিল নড়াইল সদর থানার শেখহাটিতে। বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিন তার তবাকাতই নাসির গ্রন্থে শেখহাটিকে 'শঙ্খনদ' বলেছেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বাগড়ি ভুক্তিকে সেন রাজাদের রাজধানী বলে ক্ষান্ত হয়েছেন। মূলত সেনরাজাদের আগে গুপ্ত শাসন ও পাল শাসনামলে 'বাগড়ি' ভুক্তি বা প্রদেশ বিদ্যমান ছিল। আর তার রাজধানী ছিল বর্তমান শেখহাটিতে। নড়াইল জেলার ভূ-খণ্ড ছিল বাগড়ি ভুক্তির মূল খণ্ড। আর জেলার প্রাচীন জনপদগুলোতে 'ভুক্তি', 'বিষয়', 'মণ্ডল' ও 'বীথি'র শাসনকার্য পরিচালিত হতো নিজ

নিজ শাসনকেন্দ্রে অবস্থিত 'অধিকরণ'-এর মাধ্যমে। অধিকরণ বলতে সরকারি কার্যকাল বুঝাতো। আমরা বহু অনুসন্ধানের পরে নড়াইল জেলায় কমপক্ষে ৩টি মণ্ডলের অবস্থান জানতে পারি। এই মণ্ডল ৩টি হলো, 'মণ্ডলভাগ', 'মঙ্গলহাটা' ও 'মঙ্গলপুর'।[২১]

'মণ্ডলভাগ' হাট অতি প্রাচীনকালের. 'মণ্ডলভাগের' সন্নিকটে শালনগরে চাকলানবিশদের পাতলা ইটের ইমারতের ধ্বংসাবশেষ খনন করতে গিয়ে প্রাচীন জঙ্গলের মধ্যে ১০/১১ হাত মাটির তলায় বড়ো বড়ো ইটের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই ইটগুলোকে হাজার বছরের প্রাচীন বলে ধারণা করা হয়। গুপ্ত ও পাল শাসনামলের মণ্ডলভাগের সন্নিকটে তৎকালীন মণ্ডলের 'অধিকরণ' ছিল বলে অনুমান করা যায়। 'মঙ্গলহাটা' ও 'মঙ্গলপুর' মণ্ডল শব্দের অপভ্রংশের সঙ্গে পরবর্তীকালের 'হাট' ও 'পুর' শব্দযোগে বর্তমান রূপ নিয়েছে। গুপ্ত ও পালশাসনের অধীনে বর্তমান নড়াইল জেলার উত্তরাংশ বিশেষ সমৃদ্ধি অর্জন করে। নড়াইল জেলায় প্রাচীনকালে মণ্ডলের অধিকরণের সন্নিহিত এলাকায় হাট বা ক্ষুদ্র নগরী গড়ে ওঠে। এই হাট বা ক্ষুদ্র নগরীর প্রমাণ হাজির করা যায় এই ভাবে : 'মঙ্গলহাটা' গ্রামের নামের সঙ্গে হাট শব্দটি যুক্ত। 'মণ্ডলভাগ' বাজার কালের বহু প্রতিকূলতা পেরিয়ে আজো টিকে আছে। আর মঙ্গলপুরে যে হাট গড়ে ওঠে পরবর্তীকালে নদী প্রবাহের পরিবর্তনের জন্য টোনা ও আরে পরে বড়োদিয়ায়স্থিত হয়।

আমরা বহু পর্যবেক্ষণের পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, গুপ্ত ও সমগ্র পাল শাসনামলে উপবঙ্গ তথা নড়াইল জেলায় ব্রাহ্মণ্যবাদি হিন্দুধর্মেব প্রসার ঘটে নাই। বাংলার যে সবস্থানে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী বসবাস করতো সেইসব স্থানে সামান্য জৈন ধর্মাবলম্বী ছিল বলে অনুমান করা যায়।

সেন বংশীয় শাসনামল

বাংলার সেন রাজাদের আদি বসতি ছিল দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক অঞ্চলে। এই বংশের আদি পুরুষ সামন্ত সেন বাংলায় অবস্থান করেন। সম্ভবত কোনো আক্রমণকারী সেনাদলের সঙ্গে তিনি এদেশে আগমন করেছিলেন। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন রাঢ়দেশে একটি স্বাধীনরাজ্য স্থাপন করেন। আবার অনেক ঐতিহাসিক হেমন্ত সেনকে পালরাজাদের সামন্ত বলে উল্লেখ করেছেন। পুত্র বিজয় সেন পিতা হেমন্ত সেনের মৃত্যুর পর শাসনভার গ্রহণ করেন। বিজয় সেন পালরাজাদের শেষ বংশধর মদনপালকে (রাজত্বকাল : বঙ্গাব্দ ১১৪৩-১১৬১) পরাজিত করে গৌড়-বাংলার সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করেন। মদনপাল বিজয় সেন কর্তৃক পরাজিত হয়েও বাংলাব বাইরে কিছুকাল নিজস্ব প্রতিপত্তি রক্ষা করেছিলেন।

বিজয় সেন গৌড়ের শাসনভার গ্রহণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের উপর অত্যাচারী হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন গোড়া হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক। বিজয় সেন বাংলার যে সব কেন্দ্রে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার দেখেছেন সেখানেই অত্যাচারের হাত বাড়িয়েছিলেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন, রাজা শশাংকের পরে সেন বংশীয়রা যে ভাবে বৌদ্ধ ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন অন্য কোনো রাজা বা রাজন্যবর্গ তা করেন নাই। মোট কথা, শান্তিপ্রিয় সুখী বৌদ্ধদের উপর অত্যাচারের সীমা ছিল না।

বিজয় সেন সুদীর্ঘ ৬২ বছর সামন্ত ও সার্বভৌম রাজা হিসেবে শাসন করেছেন। ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় সেনের মৃত্যুর পর তার পুত্র বল্লালসেন বাংলার সিংহাসনে আসীন হন। অনেকে বল্লাল সেনকে বিজয় সেনের ক্ষেত্রজপুত্র' বলেও বর্ণনা করেছেন। রামজয়কৃত বৈদ্যকুল পঞ্জিত আছে:

কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্রের নাহি ব্যবহার,
কিন্তু বৈদ্য বংশে এক পাই সমাচার।
আদিশূর বংশ ধ্বংস সেন বংশ তাজা
বিশ্ব সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লল সেন রাজা।

বল্লাল সেনের শাসনামলে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ তার করায়াত্বে এসেছিল। নড়াইল জেলা স্বভাবতই সেন শাসনাধীনে ছিল। বল্লাল সেন ১৮ বছর রাজত্বের পর ১১৭৮ সালের তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর তার বিদ্রোহী পুত্র লক্ষণ সেন গৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করেন। বল্লাল নিচ জাতীয় রমণীকে বিয়ে করায় পিতাপুত্রের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। লক্ষণ সেন কিছুদিনের জন্য নির্বাসনেও ছিলেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে বল্লাল পুত্রকে রাজধানীতে নিয়ে যান। লক্ষণ সেন সম্ভবত পিতামহ বিজয় সেনের শাসনামলে যথেষ্ট বীরত্বের সঙ্গে বিজয়াভিযান করেছিলেন কিন্তু তার নিজের শাসনামলে তার বিজায়াভিযানের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। ১১৯৬ সালে বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় লক্ষণ সেনের শাসনামলে স্বাধীন রাজার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। গৌড়রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ তুর্কিবীর ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক লক্ষণ সেন পরাজিত হয়ে গৌড়ের সিংহাসন ত্যাগ করেন। ১২০১ হতে ১২০৪ সালের মধ্যে গৌড় তুর্কি মুসলমানদের শাসনাধীন আসে।

'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র নড়াইল জেলার শেখহাটিকে সেন শাসনামলের বাগড়ী প্রদেশ বা ভুক্তির রাজধানী বলে মত প্রকাশ করেছেন। আমি শেখহাটিকে গুপ্ত ও পাল আমলের বাগড়ি ভুক্তির রাজধানী বলেছি। শেখহাটি ও তার সন্নিহিত তপনভাগ, পচিশা, মহিষখোরা, জগন্নাথপুর প্রভৃতি গ্রামের ৮.১০ বর্গ মাইল স্থান জুড়ে সুউচ্চ ভূমি এবং মাঝে মাঝে ভরাট হয়ে যাওয়া বিরাট বিরাট জলাশয়ের নিম্নখাত সমৃদ্ধ জনপদের স্বাক্ষর বহন করে। এখানকার উঁচু ভূমি খুঁড়লে স্থানে স্থানে পাতলা ইট, চুন, সুরকির রাশি দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবত এখানে খ্রিস্ট জন্মের পূর্বে বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'কেম্ব্রিজ হিস্টরি আর ইণ্ডিয়া' হতে জানা যায় : 'রাজা (লক্ষণ সেন) হিন্দুরীতি অনুসারে সামান্য পরিধেয়সহ অর্ধ উলঙ্গ' অবস্থায় খাদ্য ভক্ষণ করছিলেন। এবং সেই সময় ইখতিয়ার উদ্দিনের অতর্কিত আক্রমণে ভীত হয়ে নৌকাযোগে নদীয়া ত্যাগ করেন। বিশেষত লক্ষণ সেন পেছনের দরজা দিয়ে নৌকাযোগে পলায়ন করেন। কয়েকজন ঐতিহাসিক এই মত (সতীশ মিত্র, এ.এফ.এম. আবদুল জলীল প্রমুখ) প্রকাশ করেন, লক্ষণ সেন নৌকাযোগে নবদ্বীপ হতে ভৈরব নদী দিয়া স্বীয় 'বাগড়ি' ভুক্তির রাজধানী শেখহাটিতে গমন করেন। রাজা শেখহাটিতে কিছুকাল অবস্থান করেন। এবং রাজত্ব (ইখতিয়ারের অবিজিত অঞ্চল) পরিচালনা করেন। এখানে অতি সহজেই ধারণা করা যায়, লক্ষণ সেনের শাসনামলে নড়াইল তার শাসনাধীনে ছিল।

১১৯৬ সালে অর্থাৎ ইখতিয়ারের আক্রমণের পূর্বে সুন্দরবন এলাকায় ডোমনপাল

স্বাধীনভাবে একটি রাজ্য পরিচালনা করেন। ডোমনপাল বৌদ্ধ ধর্মালম্বী ছিলেন। তার রাজত্বের সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি ঐতিহাসিকেরা ডোমন পালকে পাল রাজাদের কোনো উত্তর বংশধর বলে বর্ণনা করেছেন। সেন বংশের শাসনের শেষ দিকে বর্তমান মাগুরা জেলার শ্রীপুরে একজন শক্তিমান স্বাধীন রাজার অস্তিত্ব ও তার রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ আজো বিদ্যমান। এই রাজাকে স্থানীয় লোকেরা 'বিরাট রাজা' বলে থাকেন।[২২] তার স্ত্রীর নাম ছিল শ্রী, এই শ্রী থেকেই শ্রীপুর নামের উৎপত্তি হয়েছে। শ্রীপুরের মৃত্তিকা খনন করলে পাল রাজত্বের অনেক নির্দশন আজো পাওয়া যায়। 'যশোরাদ্যদেশ' গ্রন্থের রচয়িতা হোসেনউদ্দিন হোসেন 'বিরাট রাজাকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলেছেন। এখন প্রশ্নজাগে, এই 'বিরাট রাজা' কী পূর্বোল্লিখিত রাজা ডোমন পাল? তার রাজত্ব সেন শাসনামলের শেষদিকে বর্তমান বৃহত্তর যশোর ও খুলনার বিস্তৃত অংশ নিয়ে গড়ে ওঠে। বর্তমান নড়াইল জেলার উত্তর-পশ্চিমদিকে 'বিরাট রাজা' বা ডোমন পালের রাজত্ব ছিল। এই বিরাট রাজা একজন মুসলিম সেনাপতির কাছে পরাজিত হন। সম্ভবত নদীয়া থেকে নড়াইলের বাগড়ি ভুক্তিতে অবস্থান করার সময় মুসলিম শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য 'বিরাট রাজার' সাথে লক্ষণ সেন ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সম্মিলিত শক্তি তুর্কি থেকে আসা মুসলিম বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। এরপর রাজা লক্ষণ সেন বর্তমান ঢাকার বিক্রমপুরে অবস্থান করে কিছুকাল রাজ্য পরিচালনা করে মৃত্যুবরণ করেন। লক্ষণ সেনের উত্তর বংশধরেরা, বিক্রমপুর, বর্তমান বরিশাল, খুলনার কিয়দংশের শাসক ছিলেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন, লক্ষণ সেন বিক্রমপুরেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

পাল শাসনামল ছিল সমৃদ্ধ। তখন অধিকাংশ লোক ছিল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। অল্পকালের জন্য কর্ণাটক দেশীয় হিন্দু শক্তি গৌড়ের শাসক হলেও সাধারণ জনগণ তাদের শাসনদণ্ডকে মেনে নেয় নি। যার ফলে, বিজয় সেন জনসাধারণের উপর নির্যাতন করেছিলেন--ধর্মান্তরেও প্রবল চেষ্টা ছিল। 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' ও 'সুন্দরবনের ইতিহাস'[২৩] গ্রন্থদ্বয়ে আমরা নড়াইল জেলায় সেন শানামলে 'আচারণী হিন্দু সমাজের' মানুষ বর্তমান ছিল এমন প্রমাণ পাই না। 'আচরণী বা উচ্চবর্ণ' হিন্দুদের জেলায় বসতিস্থাপন হয়েছে বেশ পরে। নড়াইল জেলার টিলার উপর অন্ত্যজ বর্ণের হিন্দুদের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পূর্ব পুরুষেরা বসবাস করতো। এরা কোল, ভিল, নাগা, বাগদি, চান্দাল বা চাণ্ডাল বা চাড়াল বা নমো, ডোম প্রভৃতি জাতির লোক ছিল। উল্লিখিত জাতির লোকেরা সেন রাজ শাসনের ভয়ে জঙ্গলাকীর্ণ টিলায় বসবাস করতো।[২৪] তাদের জীবনযাত্রা ছিল অতি মানবেতর। প্রাচীন 'চর্যাপদ' থেকে এমনি একজন ডোমনির দুঃখার্তি জানা যায় :

টালত মোর ঘর নাহি পড়বাসী
হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী।

অর্থাৎ : টিলায় আমার বসতি। আমার কোনো প্রতিবেশী নেই। হাড়িতে ভাত নেই। অথচ নিত্যরাতে দেহভোগী পুরুষ আমাকে উত্যক্ত করে। এক সময়কার দ্বীপময় নড়াইল জেলা আজো প্রাচীন যুগের অসংখ্য টিলায় পরিপূর্ণ।

মুসলিম শাসনমল

চার ডক্টরেট কর্তৃক লেখা বাংলাদেশের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে হতে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলা ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির কাছে পদানত হয়। কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থে সমর্থন মেলে ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতাব্দীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম দরবেশরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসন কেন্দ্র স্থাপন করেন। আরাকান রাজাদের 'রাজভয়েং' পুস্তক-এর ওপর নির্ভর করে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন চট্টগ্রামে দশ শতাব্দীতে একটি স্বাধীন মুসলিম রাজ্য ছিল।[২৫] এছাড়া ময়নামতিতে ১৭২ হিজরির একটি আরবিয় স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্তিতে ৯ম ও ১০ম শতাব্দীতে বাংলায় মুসলিম শাসনের জোর প্রমাণ খাড়া করা হয়। সম্প্রতি দিনাজপুরের ঐতিহাসিক মেহরাব আলী ১২৩ হিজরির একটি আরবি শিলালিপি উদ্ধার করেছেন। এবং বগুড়ার মজিদাড়া গ্রামে অতি সম্প্রতি ৫৯ হিজরি লেখা একটি শিলালিপিপ্রাপ্তি এই ধারণা দেয় যে, ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের অন্তত ২৫০ বছর আগে বাংলাদেশের কোথাও কোথাও স্বাধীন মুসলিম শাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ড. নীহাররঞ্জন ১৯৮০ সালের ৮ আগষ্ট মেহরাব আলী সাহেবকে যে পত্র লেখেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি :

'সবিনয় নিবেদন—১৯৮০ সালের বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত আপনার রচিত '১২৩ হিজরির একটি শিলালিপি' নিবন্ধ পেয়ে অত্যন্ত প্রীত ও বাধিত হলাম। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

হাতে পেয়েই নিবন্ধটি এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলেছি এবং তারপর মুহূর্তেই আপনাকে এ পত্র লিখছি। আমি আরবী ও ফারসী ভাষা জানিনে। লিপিটির যে পাঠ আপনি গ্রহণ করেছেন বিশেষ করে তারিখটি সম্বন্ধে তা যদি যথাযথ পাঠ হয়ে থাকে তা হলে আপনার ইতিহাস ব্যাখ্যার সঙ্গে কারু কোনো বিরোধ থাকার কথা নয়, অন্তত আমার নেই। অনেক দিন থেকেই আমার সন্দেহ অষ্টম-নবম শতাব্দী থেকেই উত্তর ও পূর্ব বাংলায় সুফীদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রচার হয়েছিল এবং সন্তরা এসেছিলেন সিন্ধুদেশ ও পাঞ্জাব অঞ্চল থেকে। পাহাড়পুর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া ১৭২ হিজরীর আরবী মুদ্রাটির কথা আমার জানা ছিল এবং ব্যবসাবাণিজ্য হোক বা অন্য যে কোন উপায়েই হোক, লোক যাতায়াত ছাড়া পাহাড়পুরে এ মুদ্রার অস্তিত্ব কল্পনা করা কঠিন।'[২৬]

ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের পরে এবং লক্ষণ সেন ও বিরাট রাজা বা ডোমন পাল নড়াইল ও তার সন্নিহিত এলাকা থেকে কোনো মুসলিম শাসক বা সেনাপতি দ্বারা পরাজিত ও বিতাড়িত হলে এই এলাকার শাসক কে ছিলেন কিংবা তার নাম কী ছিল তা জানা যায় নি। ইখতিয়ারউদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত বাংলার সিংহাসনে গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খিলজি ১২১২ সাল থেকে ১২২৭ সাল পর্যন্ত আসীন ছিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিম-পূর্ব বঙ্গ তথা নড়াইল জেলা ইওয়াজের করদ রাজ্য ছিল। ঐতিহাসিক মিনহাজ করদরাজার করদানের কথা উল্লেখ করলেও শাসকের নাম বলেন নি। হরি মিশ্রের কুলজী গ্রন্থ কারিকা থেকে জানা যায়, লক্ষণ সেনের পুত্র রাজা কেশব সেনের নিকট থেকে কর আদায় করেছিলেন। আমাদের হাতে এমন কোনো প্রমাণ নেই

যে, কেশব সেন নড়াইলের উপর তার শাসন অব্যাহত রেখেছিলেন। দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিশ কর্তৃক ইওয়াজ পরাজিত ও নিহত হন। এবং বাংলাদেশ ১৩৪০ সাল পর্যন্ত দিল্লি কর্তৃক শাসিত হয়। ঐ সময় সমগ্র বাংলার একটি অংশ হিসেবে নড়াইল জেলাও দিল্লীর সুলতানের শাসনাধীনে চলে যায়। বাংলার সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের শাসনামলে তারই প্রত্যক্ষ সহায়তায় ১৩০৩ সালে সিলেট হযরত শাহজালাল কর্তৃক বিজিত হয়। তখন সিলেটের শাসনভার দেওয়া হয় সিকান্দার গাজির উপর।[২৭] সিকান্দার গাজির পুত্র বরখান গাজি সাহেব (গাজি-কালু-চম্পাবতী কাহিনীর নায়ক) বৃহত্তর যশোর জেলা, খুলনা এবং ২৪ পরগণার অনেকাংশ পদানত করেন। গাজি অনেক ঘটনা ও কিংবদন্তির জন্মদাতা। তাকে নিয়ে বেশকিছু পুঁথি লেখা হয়েছে। গাজি বারোবাজার-ছাপাইনগরের রাজা শ্রীরামকে পরাজিত ও নিহত করেন। রাজপুত্র অজিত নারায়ণ কোনো দাসীর সহায়তায় রক্ষা পেয়েছিলেন। অজিত নারায়ণের পুত্র কমল নারায়ণ রায় কপোতাক্ষ নদীর তীরে রায়চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা।[২৮] বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও বর্তমান মাগুরার কৃতিসন্তান সাবেক প্রতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী ঐ ছাপাই নগরের রাজা শ্রীরাম রায়েরই বংশধর।

বরখান গাজি বা গাজি বাংলার সুলতানের সহযোগিতায় নড়াইল জেলা তথা দক্ষিণ-মধ্যবঙ্গে মুসলিম জনগণের ওপর নিপীড়ক পরাভূত করেন। তিনি কোনো এলাকায় থেকে স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন নি। তবে তার মনোনীত লোকেরা বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। এইভাবে সমগ্র এলাকায় গাজির শৌর্য, বীরত্ব ও আধ্যাত্মশক্তি বিস্তৃত ছিল। তার সঙ্গে ছিল দুর্দান্ত শক্তিশালী পাঠান ও তুর্কি সেনাবাহিনী। পুঁথিকারেরা প্রতীক হিসেবে গাজির সেনাবাহিনীকে বলেছেন ব্যাঘ্রবাহিনী। নড়াইল জেলার সাথে সেই সুলতানি শাসনামলে গাজির গভীর সম্পর্কের কথা জানা যায়। নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানায় ১টি 'গাজির মোকাম' ও ৪টি গাজির দরগাহের সন্ধান পাওয়া যায়। উল্লিখিত গাজির দরগাহ হলো : ১. জালালশির গাজির দরগাহ ২. আমডাঙ্গার গাজির দরগাহ ৩. কুমারডাঙ্গার গাজির দরগাহ ও ৪. সরশুনার গাজির দরগাহ।

১২৪৭ সালের পরে কোনো এক সময় গাজি নড়াইল জেলার নলদি (পরগনা) পদানত করেন। গাজি যে স্থানে দরবার করেছিলেন সেটি আজো গাজির মোকাম বা কসবা নামে পরিচিত। সম্ভবত গৌড় সুলতানের কোনো প্রতিনিধিকে রেখে তিনি স্থান ত্যাগ করেন। নড়াইল এলাকায় প্রবল জনশ্রুতি আছে, বড়োখান গাজি বা গাজি ঐ এলাকায় গিয়েছিলেন। যে সব এলাকায় গাজি গিয়েছিলেন সেইসব এলাকা আজো গাজির স্মারক বহন করছে। ১৯৮৩ সালে ৮৫ বছর বয়সী সরশুনা গ্রামের দুধবিবি বলেছেন, তিনি তার মৃত স্বামী মুন্সি ওদেলউদ্দিনের কাছ থেকে শুনেছিলেন, গাজি বহুবার বাঘে চড়ে সরশুনা এলাকায় আগমন করেছেন। শত শত বছর আগের ঘটনা, লোক মুখে আসতে আসতে কিছু অতিরঞ্জন (বাঘ প্রসঙ্গ) হতেই পারে। তবে অতিরঞ্জনের খোলাস থেকে সত্য উদ্ধার করা খুব কঠিন নয়।

কালিয়া থানার ব্রাহ্মণপাটনা গ্রামে একটি গাজির দরগাহ, কলাবাড়িয়া ইউনিয়নের গাজিরডাঙ্গা, গাজিরখাল ও গাজিরহাট গ্রামের নামকরণের পেছনে গাজি সাহেবের স্মৃতি

কাজ করেছে।

ঐতিহাসিকদের ধারণা, গাজি সাহেবের আবির্ভাবের পরে দক্ষিণ-মধ্যবঙ্গে একজন বিখ্যাত সাধক ও শাসক এই অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। এই বিখ্যাত সাধক বাগেরহাটের মাটিতে শায়িত আছেন। তিনি হজরত খানজাহান আলী নামে পরিচিত। খানজাহান বাংলার সুলতানের প্রতিনিধি হিসেবে খলিফাতাবাদ সরকারের শাসক ছিলেন। খলিফাতাবাদ বর্তমান বাগেরহাটের পূর্ব নাম। এর অর্থ হলো, প্রতিনিধির শহর। দিল্লি কিংবা বাংলার রাজধানী গৌড়ের দীর্ঘ পথ ঘুরে খানজাহান এসেছিলেন ঐতিহাসিক বারোবাজারে। এই বারোবাজার শহর যশোর শহরের প্রায় ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। বাবোবাজারে খানজাহান অবস্থান করে সেখানে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন। আজো খানাজাহানের একাধিক মসজিদ ও তালাব বা দিঘি দেখতে পাওয়া যায়। বারোবাজার থেকে খানজাহান বর্তমান যশোর শহরে অবস্থান করেন। ঐ স্থানে তার প্রতিনিধি গরীব শাহের মাজার বিদামান। খাজাহানের আরেক প্রতিনিধি বর্তমান খুলনার বেতকাশি অঞ্চলে সোজা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যান। ঐ প্রতিনিধির নাম বোরহান খাঁ বা বুড়ো খান। খানজাহান ভৈরব নদীর তীব বেয়ে দক্ষিণ ডিহিতে অবস্থান করেন। স্থানের নাম রাখেন পয়গাম-ই-কসবা বা পয়গ্রাম কসবা। এরপর নানা জনপদ পেরিয়ে বর্তমান খুলনার দৌলতপুরের কাছে ভৈরব পার হয়ে উত্তরদিকে অভিযান অব্যাহত রাখেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, খানজাহানের সাথে সব সময় ৬০,০০০ হাজার কোড়াদার সৈনিক থাকতো। ঐ সেনাদল মসজিদ-প্রাসাদ নির্মাণ ও দিঘি খনন করতো। খানজাহান বারাকপুর ও মজুতখালি পর্যন্ত খুলনা হতে উত্তরদিকে সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়েছিলেন। এরপর তিনি প্রায় সোজা পূর্বদিকে এগিয়ে খলিফাতাবাদ বা বাগেরহাটে অবস্থান নেন। বাগেরহাটে তার বিশাল বিশাল কীর্তিরাজির কথা জানা যায়।

এদিকে খানজাহানের আরদ্ধ অভিযান আরো উত্তরদিকে প্রসারিত হয়। যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তার কনিষ্ঠ সহোদর বলে কথিত জাহান্দাব খান। জাহান্দারের সেনাবাহিনী পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যে সময়ে বর্তমান নবগঙ্গা নদী বেয়ে বর্তমান নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানার মহিশাপাড়া গ্রামে মধুমতী নদীর তীরে অবস্থান গ্রহণ করে। মহিশাপাড়া সেই সুলতানি শাসনামলে একটি শাসন কেন্দ্রে রূপ নেয়। এ ছাড়া পাশ্ববর্তী পাচুড়িয়া গ্রাম সম্পৃক্ত ছিল জাহান্দার খানের অভিযানের সাথে। ধারণা করা যায়, বর্তমান পাড়ুড়িয়া গ্রামে তৎকালীন সুলতানি সরকারের কোনো রাজন্যের অবস্থান ছিল। এখানে একটি বিষয়ে সুস্পষ্ট যে, খানজাহান খান ও তাব অনুসারী বা প্রশাসনের লোকের ইসলাম ধর্ম প্রচারেও আন্তরিক ভাবে নিযুক্ত ছিলেন।

বাগেরহাটের সাধক পিব ও শাসক খানজাহান আলি খান খলিফাতাবাদ সরকারের শাসক ছিলেন। খানজাহানের সহোদর বলে কথিত জাহান্দার খান বর্তমান নড়াইল জেলার উত্তরাংশ ও বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার বেশ কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। বাগেবহাটে খানজাহানের দরবারে ফরিদপুর থেকে দুইজন গুণী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। এই দুই ব্যক্তিকে সম্ভবত খান জাহানেব সহোদর জাহান্দার খানই পাঠিয়েছিলেন।[২৭]

খলিফাতাবাদ সরকারের সীমানা বেশ বিস্তৃত ছিল। বর্তমান বাগেরহাট জেলা, নড়াইল জেলা, গোপালগঞ্জ জেলা, খুলনা জেলা ও বরিশালের কিছু কিছু অংশ নিয়ে খলিফাতাবাদ সরকার গঠিত ছিল। সহজ কথা, নড়াইল জেলা একসময় বাগেরহাট থেকে শাসিত হতো। নড়াইল থানার মিরেপাড়া গ্রামসহ নড়াইল জেলায় কমপক্ষে ৩টি খাঞ্জেলি দিঘি আজো বিদ্যমান। এই দিঘিগুলো পীর খানজাহানের শাসনস্মারক হিসেবে আমরা আজো দেখতে পাই। পীর খানজাহান ও তাঁর নিযুক্ত উত্তরাঞ্চলীয় শাসক জাহান্দার খান স্বাধীন সুলতানি শাসনামলে বর্তমান নড়াইল ও গোপালগঞ্জ জেলার বিস্তৃত অংশের শাসক ছিলেন। বাগেরহাটের পীর খানাজাহান আলির মৃত্যু সাল লেখা রয়েছে তাঁর সমাধির উপর ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ। খানজাহান বাংলার স্বাধীন সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের শাসক প্রতিনিধি ছিলেন বলে জানা যায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ নিহত হলে তার সেনাপতি আযম খাঁ তার পুত্র নাসিরউদ্দিনকে নিয়ে বাগেরহাটে আশ্রয় নেন। এই আযম খাঁ-ই খানজাহান।

পীর খানজাহানের শাসনামলে গাজি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নলদির গাজির মোকামে একটি প্রশাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪ শত বছরের অধিককাল আগে এই গাজির মোকামে খানজাহানের সময়ে বাংলার স্বাধীন সুলতানের কাজী নিযুক্ত হয়েছিলেন। মুঘল শাসনামলের প্রথম দিকেও নলদিতে কাজীর বিচারও বিচারালয় বর্তমান ছিল। নলদি ছিল নলদি পরগণার শাসন কেন্দ্র। নলদি আজো পুরাকীর্তির জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। এখানে আজো ধসে যাওয়া রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, দরবারগৃহ, ঈদগাহ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন সুলতানি শাসনামলের নিযুক্ত কাজির বংশধরেরা ইংরেজ শাসনামলে এলাকায় মহামারি শুরু হলে স্থান ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস করতে চলে যায়। সুলতানি শাসনামলেই নলদি খলিফাতাবাদ সরকারের একটি বড়ো পরগণার মর্যাদা পেয়েছিল। এক ইউরোপীয় পরিব্রাজকের তৈরি ম্যাপে নলদির অবস্থান-এর প্রাচীনত্বকে বেশি বেশি নিশ্চিত করে।[৩০]

পীর খানজাহান আলি কখনো নড়াইল জেলা এলাকায় আগমন করেছিলেন কি না তা জানা যায় না। তবে কিংবদন্তি অনুযায়ী তার ছোট সহোদর জাহান্দার খান এই এলাকায় শাসন কার্য পরিচালনা ও ইসলাম প্রচারে আত্মীয়তা করেছিলেন। জাহান্দার খান একাধিক বিয়ে করেছিলেন। তাঁর অনেক সন্তানাদি ছিল; যারা পরবর্তীকালে ইসলাম প্রচারে ও শাসনকার্যে নিজেদের নিযুক্ত করেছিলেন। জাহান্দার খানের এক নাম কিশওয়ার খাঁ বলে তার উত্তর বংশধরেরা বলে থাকেন। লোকমুখে জাহান্দার খাঁ নাম জামদার খাঁ বলে প্রচলিত ছিল। জানা যায়, কিশওয়ার খাঁ সুলতান কিংবা বাদশাহের দেওয়া বিশেষ উপাধি।[৩১] দেড় হাজার থেকে তিন হাজার সিপাহশালারকে কিশওয়ার খাঁ উপাধি দেওয়া হতো। জাহান্দার খাঁ বর্তমান নড়াইল, ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ জেলা এলাকার 'সর-ই-লস্কর' ছিলেন। সর-ই-লস্কর বা সরকারই লস্কর বর্তমান বিভাগীয় কমিশনার পর্যায়ের প্রশাসক। কিশওয়ার খাঁ মহিশাপাড়ায় অবস্থান কালে মধুমতির পূর্বপারে গোপীনাথপুরের জনৈক নরবলীদাতা তাপস মণ্ডলের অত্যাচারের খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যান এবং মণ্ডলকে পরাজিত করেন। কিশওয়ার খাঁ জাহান্দার খাঁর কবর গোপীনাথপুরের মিয়াপাড়ায় আজো বিদ্যমান।[৩২] যতদূর জানা যায় জাহান্দার খাঁ

বাংলার সুলতান জালালউদ্দিন ফতে শাহের শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

কিশওয়ার খাঁ জাহান্দারের অন্যতম পুত্র ওয়ালি মাহমুদ পিতা ও পিতৃব্য (যথাক্রমে, জাহান্দার খাঁ ও পীর খানজাহান আলি খাঁ)-এর অনুসারী ছিলেন। তিনি পিতার আদেশে বর্তমান কালিয়া থানার শিবপুর গ্রামে এক সেনা অভিযান চালিয়ে স্থানীয় অমুসলিমদের ওপর প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ২৭ বিঘা জমির উপর একটি 'কেলাবাড়া' বা 'কেলাবাড়ি' নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে ঐ 'কেলাবাড়া'কে কেন্দ্র করে ঐ স্থানের নাম হয় কলাবাড়িয়া। 'কেলাবাড়া' বা 'কেল্লাবাড়ার' প্রাচীন ভিটা এখন পরিত্যক্ত। তবে ভিটাটিকে স্থানীয় লোকেরা 'ঠাকুরের ভিটে' বলে।[৩৩] তুর্কি শব্দ ঠাকুরের অর্থ হলো, 'প্রভু', শাসক, সম্মানিত ব্যক্তি। সুলতানি শাসনামলের একজন আঞ্চলিক শাসককে প্রজাসাধারণ 'ঠাকুর' সম্বোধন করতো। ওয়ালি মাহমুদ ও তাঁর পিতা কিশওয়ার খাঁ জামদার খাঁ-এর মতো নড়াইল জেলা এলাকার একজন শাসক বা সরকার-ই-লস্কর ছিলেন ধারণা করা যায়। স্বাধীন সুলতানী আমলের দুইশত বছর গ্রন্থের লেখক সুখময় মুখোপাধ্যায় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের একজন সামন্ত শাসকের নাম উচ্চারণ করেছেন। যার নাম ওয়ালি মহম্মদ। এই ওয়ালি মহম্মদ ও নড়াইল জেলার কেলাবাড়ায় ওয়ালি মাহমুদ কি একই ব্যক্তি? তবে এটা প্রমাণিত সত্য জাহান্দার খাঁ ও ওয়ালি মাহমুদের বংশধরদের নানা পদবির মধ্যে আজো 'লস্কর'ও একটি পদবি (সরকার-ই-লস্করের সংক্ষিপ্ত হলো লস্কর)। কলাবাড়িয়া গ্রামের ওয়ালির বংশধরেরা প্রথমদিকে খাঁ উপাধিধারী ছিলেন। এখন তারা মোল্যাহ্ ও মিয়া পদবি নিয়ে টিকে আছেন।[৩৪] অনুমান করা যায়, সরকার-ই-লস্কর বা সামন্ত শাসক ওয়ালি মাহমুদ বাংলার সুলতান নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহ্-এর রাজত্বকাল পর্যন্ত নড়াইলের একটি অংশের সামন্ত শাসক ছিলেন। কলাবাড়িয়া এক সময় ডিহির মর্যাদা পায়। ওয়ালি মাহমুদের মাজার ঠাকুর ভিটেয় বিদ্যমান। নলদি, কলাবাড়িয়া ছাড়াও সুলতানি শাসনামলে শেখহাটি এবং লোহাগড়ার লাহুড়িয়ার প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুলতান নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহের পরে গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন। নড়াইল জেলা বরাবরই সুলতানি শাসনের মধ্যেই ছিল। ১৫৩৮ সালে মুঘল শক্তির সাময়িক অবসান ঘটিয়ে শেরশাহ দিল্লিসহ ভারতের অধিশ্বর হন। তিনি ইতোমধ্যে বাংলার স্বাধীন সালতানাতের অবসান ঘটিয়ে পাঠান সালতানাতের সূচনা করেন। ১৫৬৪ সাল থেকে ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত বাংলার শাসক ছিলেন পাঠান কররানি বংশের সুলতানেরা। ১৫৭৬ সালে পাঠান সুলতান দাউদ খান কররানি আকবরের সেনাপতির কাছে নিহত হলে বাংলায় সুলতানি শাসনের অবসান ঘটে। দাউদ খান কররানির মৃত্যুর পর তার কর্মচারি শ্রীহরি ও তার সহোদর বসন্ত রায় দেশের বিশাল অরণ্য কালকবন বা সুন্দরবনে আশ্রয় নিয়ে একটি শাসন কেন্দ্র স্থাপন করেন। প্রাচীন যশোর নামটিকে উৎকর্ষ করে (তাদের মতে) শাসন কেন্দ্রের নাম রাখেন যশোহর। নিহত সুলতান দাউদ খান কররানির অনুসারী ও জমিদারেরা মুঘলদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ করতে থাকেন। এই যুদ্ধ 'বারোভূঁইয়াদের সংগ্রাম' নামে পরিচিত। বাহারীস্থান-ই-গায়বীর বিবরণীতে জানা যায়, শ্রীহরির পুত্র প্রতাপাদিত্য মুঘল সেনাপতি ইখতেফার খাঁর নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেন।

মুঘল শাসন আমল

আইন-ই-আকবরি পাঠে জানা যায়, শের শাহ মাহমুদাবাদ সরকার দখল করেন। মাহমুদাবাদ সরকারের শাসিত অঞ্চল ছিল বর্তমান মাগুরা, ঝিনাইদহ, ফরিদপুর, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলার অংশ বিশেষ। এর রাজধানী ছিল ভূষণা। মাহমুদাবাদ সরকারের শাসন কেন্দ্র ভূষণা বর্তমান ফরিদপুরের সাতৈর রেলস্টেশনের কাছে অবস্থিত। সম্রাট আকবরের শাসনামলে বাংলা মুঘলদের অধিকারে থাকলেও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় ছিল না। সুলতানি আমলের জমিদার বা বারোভূঁইয়া এবং তাঁদের পুত্র ও অনুসারীরা কখনো মুঘলদের অধীনতা স্বীকার করতেন, আবার সুযোগ বুঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন। এ ছাড়া বারোভূঁইয়াদের মধ্যেও নানা রকম স্বার্থদ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল। দক্ষিণ বাংলা মুঘল সেনাপতি মুরাদ খার অধীনে ছিল। নড়াইল জেলাও মুরাদ খাঁর অধীনে ছিল। মুরাদ খার শাসন কেন্দ্র ছিল বর্তমান ফরিদপুর শহরের নিকট যার নাম খানখানাপুর। দক্ষিণাঞ্চলে মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করে ছিলেন রাজা মুকুন্দরাম রায়। মুকুন্দরাম রায় মুরাদ খাঁর পুত্রদের ভূষণা দুর্গে আমন্ত্রণ করে হত্যা করেন। তিনি ফরিদপুরের বিরাট অংশ দখল করেন।[৩৫] এই মুকুন্দরাম রায় ও তার পুত্র সত্রাজিত রায় উভয়ই মুঘল সুবাদারের দ্বারা জমিদার বা রাজা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা সাতৈর বা ভূষণার অধিকার পেয়ে বর্তমান নড়াইল জেলার নলদি পরগনা, বেলফুলিয়া পরগণা, মকিমপুর পরগণা ও ইউসুফপুর পরগণার মুঘল প্রতিনিধি হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। রাজা সত্রাজিত রায় তিন বারের অধিক মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার ও বিদ্রোহ করে কুখ্যাতি অর্জন করেন। তার জীবন অবসান হয়েছিল বিশ্বাসঘাতকতার জন্য পুরানো ঢাকার শূলখানায়। রাজা সত্রাজিত রায় বারোভূঁইয়ার সংগ্রামের সময় স্বল্পকালের জন্য নড়াইল ভু-খণ্ডের মুঘল শাসক নিযুক্ত ছিলেন। যশোরের প্রতাপাদিত্য নড়াইল জেলার ভূ-খণ্ডের অধিকারী কিংবা শাসক প্রতিনিধি ছিলেন না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, রাজা সত্রাজিত রায়ের কর্মকাণ্ড ছিল নড়াইল জেলার মধুমতি, চিত্রা, নবগঙ্গা, আঠারবাঁকি, কালু-মালুর খাল, ইতনা, নলদি, বরাশুলো, উজিরপুর, শোলপুর প্রভৃতি এলাকায়।

রাজা সত্রাজিত রায়, মুঘল সুবাদার ইসলাম খান চিশতি (নিযুক্তি ১৬০৯ সাল)- এর বাংলায় আগমনের সংবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এবং সুলতানি শাসনমলের রাজস্ব আদায় কেন্দ্র নড়াইল শহরের সামান্য দক্ষিণে উজিপুরে অবস্থান করছিলেন। উজিরপুর তখন বাংলার স্বাধীন সুলতানদের একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। তখনো নড়াইল নাম বা গ্রামের পত্তন হয় নি। নড়াইলের মাটিতে মুঘল সেনাপতি ইখতিয়ার খাঁর নিকট সত্রাজিত যুদ্ধে যেভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন তা 'বাহারিস্তান-ই-গায়বি (১ম খণ্ড)' থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হলো :

ইসলাম খাঁ আলাইপুর (বর্তমান খুলনা জেলার রূপসা থানার আলাইপুর গ্রাম ; এখানেই ছিল সুলতানি শাসনামলের ফতেপুর নামের বিখ্যাত কেলাহ– সেটি এখন ভৈরব নদীর ভাঙ্গনে বিলীন) পৌঁছেই কিছু সংখ্যক জমিদারসহ ইখতিখার খাঁকে ভূষণার রাজা শত্রুজিতের বিরুদ্ধে পাঠান। এ নির্দেশ দিয়ে যে, রাজা যদি বশ্যতা স্বীকার করেন তা হলে তাঁকে তাঁর রাজ্য জায়গির হিসাবে প্রদানের আশ্বাস দিতে এবং তাঁকে ইসলাম খাঁর নিকট নিয়ে আসতে। অন্যথায় তাঁর কৃতকার্যের জন্য তিনি নিজেই শুধু দায়ী হবেন।

এবং তাঁর সহায় সম্পদ ও তিনি নিজে শাহী কারোরিদের (রাজস্ব আদায়কারী) শিকারে পরিণত হবেন। ইখতিখার খাঁ একটি সুশিক্ষিত সৈন্যদল নিয়ে তাঁর গন্তব্য স্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। এই অভিযানের সংবাদ অবগত হয়েই সত্রাজিত এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। এবং আতাখালে একটি উচ্চ দুর্গ নির্মাণ করেন। এই খালকেই তিনি তার প্রতিরোধের উপযুক্ত স্থান বলে মনে করেন। ইখতিখার খাঁ- এর সন্নিকটে পৌঁছালে প্রভুভক্ত গোয়েনদারা শত্রু দুর্গের ডান দিকের রাস্তা পরিত্যাগ করে ইখতিখার খাঁর সৈন্যবাহিনীকে অন্যপথে খালের উজান দিয়ে নিয়ে যায়। সেখানে খালের জল ছিল কম। এ খবর পেয়ে সত্রাজিত যুদ্ধের জন্য দ্রুত সেখানে পৌঁছেন কিন্তু ইতিমধ্যে শাহী ফৌজ নদী পার হয়ে সেই তীরে উপস্থিত হওয়ায় সেখানকার লোকদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। আর প্রতিরোধ মুস্কিল ভেবে রাজা সন্ধির প্রস্তাব করে দূত পাঠান। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজা সত্রাজিত ইখতিখার খাঁ-র সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। ইখতিখার খাঁ তাকে পুত্র বলে সম্মানিত করে ইসলাম খাঁর নিকট নিয়ে আসেন'[৩৬]

সত্রাজিত রায়ের পরাজয় ও মুঘল বাহিনীর অধীনতা স্বীকার প্রসঙ্গে বাংলার সুবাদার ইসলাম খান চিশতির সমসাময়িক পরিব্রাজক আবদুল লতিফের 'বাহারিস্তান' নামক ভ্রমণ কাহিনী হতে জানা যায়, 'তিনি (সত্রাজিত রায়) সুযোগ বুঝে কখনো মুঘলদের পক্ষ অবলম্বন করতেন, কখনো বা বিরোধিতা করতেন।... সত্রাজিত যখন মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন, তখন সুবেদার ইসলাম খাঁ ইফতেখার নামক এক সেনাপতিকে এই বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে প্রেরণ করেন। সত্রাজিত ইফতেখারের যুদ্ধ যাত্রার খবর পেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুললেন। এই যুদ্ধে সত্রাজিতের পরাজয় হয়েছিল। ইফতেখার তাকে বন্দি করলে, সত্রাজিত ইসলাম খাঁর সাক্ষাত প্রার্থনা করলেন। ইসলাম খাঁ অগ্রসর হচ্ছিলেন। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে ফতেহপুর নামক একটি স্থানে (কেলাহ্) সত্রাজিত তার সাথে সাক্ষাত করলেন। সুবেদারকে উপযুক্ত উপঢৌকন স্বরূপ আঠারটি হস্তী প্রদান করে বশ্যতা স্বীকার করলেন। দুইপক্ষে আপোষ মীমাংসা হলো। সত্রাজিত এরপর থেকে মুঘলদের পক্ষ হয়ে বিদ্রোহ দমনে মনোযোগ দিলেন।'[৩৭]

আলাইপুর থেকে মুঘল সেনাপতি ইখতিখার খা বর্তমান মহানগরী খুলনার ৬ মাইল উত্তর পূর্ব কোণের আঠারবাঁকি হয়ে বর্তমান তেরখাদা থানার পার্শ্ব দিয়ে প্রাচীন চিত্রানদী দিয়ে কালিয়া থানার বারোইপাড়া ফুলদহ হয়ে রঘুনাথপুরে উপস্থিত হন। চিত্রার নদীর এই মুল খাঁদ এখন মৃত। রাজা সত্রাজিত নড়াইলের উজিরপুরের সেনানিবাস থেকে আরো দক্ষিণে এগিয়ে চিত্রা ও আতাখালের সঙ্গম স্থলে নদীর পশ্চিম তীরে উঁচু দুর্গ বা শিলাহ নির্মাণ করেন। ঐ শিলাখানা বা কেল্লাটি এখন শোলপুর নামে পরিচিত। মুঘল বাহিনীর ভয়ে সত্রাজিতের বাহিনী মোকাবেলায় অসমর্থ হয়ে আত্মসমর্পণ করে। ধারণা করা যায়, এরপর সত্রাজিতকে সেনাপতি ইখতিখার খাঁ বর্তমান নড়াইলের উত্তর পূর্ব এলাকা ঘুরিয়ে অর্থাৎ চিত্রা, ঘোড়াখালি, নবগঙ্গা, মধুমতি ও আঠারবাঁকি নদী পেরিয়ে আঠারবাকি– ভৈরবের সঙ্গম স্থলে ফতেপুর কেল্লায় সুবাদার ইসলাম খাঁ চিশতির পায়ের উপর হাজির করেন। এরপর সত্রাজিত মুঘল বাহিনীর সাথে যশোরের রাজা প্রতাপের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পর দোদুল্যমান চরিত্রের

প্রতাপাদিত্য মুঘল বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে জাহাঙ্গিরনগর বা ঢাকায় নীত হন।[৩৮] সুবাদার ইসলাম খান চিশতি তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করেন। যশোর এলাকা মুঘলদের করায়ত্ব হয়। যশোরের শাসক বা ফৌজদার নিযুক্ত হন সেনাপতি গিয়াস খাঁ।

নড়াইল জেলার উত্তরাংশ অর্থাৎ তৎকালীন নলদি পরগনা রাজা মুকুন্দ রাম রায় ও তাঁর পুত্র সত্রাজিত রায় মুঘল কর্মচারি তোডরমলের কাছ থেকে শাসনের ভার পেয়েছিলেন। রাজা সত্রাজিত রায় মুঘল সুবাদারের নির্দেশে নড়াইলের বাইরে অবস্থান করলেও নড়াইল জেলার উত্তরাংশ তাঁর অধীনস্থ কর্মচারিদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। সত্রাজিত নড়াইলের ইতনা গ্রামের সেনানিবাসে মাঝে মাঝে অবস্থান করতেন। সত্রাজিত রায়ের সহকর্মী ছিল পরামানন্দ রায়। পরমানন্দ ইতনায় অবস্থান করতেন। পরমানন্দও মুঘল সরকারের একজন কর্মচারি ছিলেন। সত্রাজিত মুঘলদের সাথে বার বার বিশ্বাসঘাতকতা করলে ১৬৩৬ সালে তাকে প্রাণদণ্ড দণ্ডিত করা হয়। মাগুরা জেলার সত্রাজিতপুর নামে নবগঙ্গার তীরে একটি গ্রাম আজো বিদ্যমান। ঐ গ্রামে সত্রাজিতের বংশধরেরা বসবাস করছে।

নড়াইল জেলার পূর্ব দক্ষিণাংশ অর্থাৎ বেলফুলিয়া পরগণার শাসক সত্রাজিত রায় ছিলেন না। কিংবা তাঁর বংশধরেরা এই অংশের শাসক ছিলেন না। বেলফুলিয়া পরগণাটি বেশ দীর্ঘ। বর্তমান খুলনা শহরের পরপারে ভৈরবের তীরে বেলফুলিয়া গ্রাম আজো বিদ্যমান। খুলনা জেলা থেকে আরম্ভ করে নড়াইল জেলার কালিয়া ও অন্যান্য অংশ বেলফুলিয়া পরগণার মধ্যে ছিল। যে মুঘল সেনাপতি ইখতিয়ার খাঁ সিলাপুর বা সোলপুরে সত্রাজিতকে নড়াইলে পরাজিত করেন তার পুত্র ইলাইয়ার খাঁ খুলনার ৬ মাইল পূর্ব-উত্তর কোণে আলাইপুরের ফতেপুর কেলার অধিকারী ছিলেন। বেলফুলিয়া ও আলাইপুরের দূরত্ব ৫ মাইলের উর্ধে নয়। আজো মির্জা ইলাইয়ার খাঁর স্মৃতিচিহ্ন ধরে রেখেছে ইলাইপুর গ্রামটি। ইলাইপুরে এখন একটি আনসার প্রশিক্ষণ ক্যাম্প আছে। এই মুঘল কর্মচারি ইলাইয়ারের অধীন বেলফুলিয়া পরগণার ডিহি কলবাড়িয়াসহ[৩৯] বেশকিছু মহালের পুরুষানুক্রমিক শাসক ছিলেন পূর্বে আলোচিত কেলাবাড়া বা কলাবাড়িয়ার ওয়ালি মাহমুদ খাঁর[৪০] বংশধরেরা। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ওয়ালি মাহমুদের উত্তরাধিকারী বা খান-মোল্যাহদের প্রতিপত্তি বিপুলাংশ হ্রাস পায়। ১৯৫১ সালের জমিদারি প্রথা বাতিল হওয়া পর্যন্ত খান-মোল্যাহদের তালুক ও গাঁতির অভিজাত নিশানা ছিল।[৪১]

সম্ভবত সত্রাজিত রায়ের মৃত্যুর পরে তার বংশধরদের প্রশাসনিক ক্ষমতা হ্রাস পায়। ঐ সময় মধুমতি নবগঙ্গা নদীকে মগপর্তুগিজ মুক্ত রাখার জন্য জনৈক মুঘল কর্মচারী লোহাগড়া থানার মধুমতির পশ্চিমতীরে অবস্থান গ্রহণ করেন। ঐ সেনাপতির নাম জানা যায় না। তবে তার নামের শেষে ছিল লাহোরি খাঁ। সম্ভবত তিনি লাহারের বাসিন্দা ছিলেন। লাহোরি খাঁর নাম অনুসারে গ্রামের নাম বিকৃত হয়ে লাহুড়িয়া হয়েছে। গ্রামের পূর্ব নাম জানা যায় না। লাহোরি খাঁর বংশধরেরা দীর্ঘকাল নলদি পরগণা তথা নড়াইল জেলার স্থানীয় প্রশাসক ছিলেন। লাহোরি খাঁর এক মেয়েকে সৈয়দ উমর বিয়ে করেছিলেন (যিনি বড়পির সাহেবের বংশধর বলে কথিত)। সৈয়দ উমর সম্রাট

আলমগীরের 'ফতোয়াই-আলমগীর' কিতাবের শুদ্ধতা যাচাই কমিটির সদস্য ছিলেন। সৈয়দ উমরের পুত্র ও লাহোরি খাঁর দৌহিত্র নলদি পরগণার প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন। তিনি সৈয়দ খাঁ। সৈয়দ খাঁর মূল নাম জানা যায় নি। শুধু পিতার বংশ সৈয়দ ও মুঘল প্রশাসনিক উপাধি খাঁ জানা যায়। সৈয়দ খাঁ বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন তিনি মুঘল সরকারের প্রশাসক, সেনাপতি ও সদর বা কাজি ছিলেন।

সৈয়দ খাঁর পরে নলদি পরগণার জায়গির পেয়েছিলেন রাজা সীতারাম রায়। সীতারাম রায় ১৬৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সুবাদার শায়েস্তা খাঁ তাঁর বিশ্বস্ততার পরিচয় পেয়ে তাঁকে নলদি পরগণার জায়গির দিয়েছিলেন।[৪২] এইভাবে মুঘল শাসনামলে নড়াইল জেলার উত্তর অংশ লাহোরি খাঁর বংশধর ও রাজা সীতারাম কর্তৃক শাসিত হতো। আর পূর্ব দক্ষিণ অংশ বা বেলফুলিয়া পরগণা ইলাইয়ার খাঁ ও তাঁর উত্তরাধিকারী এবং ওয়ালি মাহমুদ খাঁর বংশধরেরা শাসন করেছেন। উল্লিখিত জায়গিরদার জমিদারদের খাজনা দিতেও আনুগত্য প্রকাশ করতে হতো পরবর্তীকালে যশোরের ফৌজদারের কাছে। যশোর ফৌজদারের অধীন ছোট বড়ো সব ভূস্বামীর খাজনা ফৌজদারের কাছে জমা দেওয়ার নিয়ম ছিল। ফৌজদার তাঁর এলাকার সব রাজস্ব বাংলার সুবাদারের কাছে অর্থাৎ জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকায় পাঠিয়ে দিতেন। এইভাবে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা ও মিরজাফরের কয়েকজন উত্তরাধিকারীর নবাবি শাসন পর্যন্ত নড়াইল জেলার ভূমি রাজস্ব ও প্রশাসন মুঘল অনুশাসন অনুসারে পরিচালিত হয়েছে।

কোম্পানি শাসনামল

১৭৫৭ সালে চরম বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে নবাব সিরাজদ্দৌলার পতন হয়। ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুবা বাংলার দেওয়ানি লাভ করে। এই ভাবে নড়াইল জেলার বিচার বিভাগ নবাব সরকারের হাতে থাকলেও রাজস্ব বিভাগ চলে যায় কোম্পানির বেনিয়া প্রশাসকদের হাতে।

১৭৬৯ সালে (বাংলা ১১৭৬ সন) সারা বাংলায় কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সংগঠিত হয়। তাতে সুবা বাংলার ১/৩ অংশ লোক মারা যায়। ঐ সময় কলাবাড়িয়ার প্রাচীন জমিদার পরিবারের লোক যথাক্রমে বড়োমিয়া চান মাহমুদ, মেঝেমিয়া কোরেশ মাহমুদসহ ৭ সহোদর তাদের লোকজনসহ নলিয়া নদী হতে নবাবনাজিম সরকারের চালের নৌকা লুটপাট করে চাল বিলিয়ে দেন। যতদূর জানা যায়, চাঁচড়ার জমিদারদের মাধ্যমে লুটেরাদের সন্ধান নেওয়া হয়। বিচারের দায়িত্বে ছিলেন নবাব সরকারের থানাদার বা দারোগা। চান ও কোরেশ মাহমুদ প্রজার স্বার্থে চাল লুটের কথা স্বীকার করলে চাঁচড়ার রাজা তাদের পুরস্কৃত করেছিলেন।[৪৩] ১৭৭২ সালে যশোরের শান্তিও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যশোরে একজন ইংরেজ কালেকটর নিযুক্ত হয়। তখন বৃহত্তর খুলনা জেলা ও অন্যান্য এলাকাসহ নড়াইল জেলা যশোর কালেকটরির অধীনে চলে যায়। ১৭৮১ সালের ভারত শাসনের নতুন বিধান অনুসারে যশোরের ইংরেজ জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন টিলম্যান হেংকেল।[৪৪] কুখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম হলে সুলতানি ও মুঘল আমলের অনেক ছোটো বড়ো অভিজাত পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। পুরানো জায়গিরদার-জমিদারদের কর্মচারিরা বড়ো বড়ো জমিদারি ক্রয় করে কোম্পানি

সরকারের দাসানুদাস হয়ে ওঠে। এই সময় মহম্মদপুরের সীতারাম রায়ের নলদি পরগণা ও ভূষণার বিভিন্ন জমিদারি মহল নাটোর, যশোরের চাঁচড়া ও নলডাঙ্গা জমিদারির মধ্যে চলে যায়। এই ভাবে কোম্পানি শাসনামলে বর্তমান নড়াইল জেলা ছোটো বড়ো জমিদার-তালুকদার ও গাঁতিদারদের দ্বারা শাসিত হতে থাকে।

১৮৪২ সালে যশোর জেলার একটি নতুন থানা নয়াবাদে (খুলনা) মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় নড়াইল জেলার দক্ষিণাংশ অর্থাৎ বর্তমান কালিয়া থানা খুলনা মহকুমার অংশ বিশেষে পরিণত হয়।[৪৫] ১৮৬১ সালে সমগ্র নড়াইল জেলা এলাকায় ব্যাপক নীল বিদ্রোহের কারণে নানা ধরনের অশান্তি দেখা দেয়। ঐ বছরই মহিশাখোলা মৌজায় 'নড়াল' এলাকায় একটি মহকুমা সদর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রাচীন 'নড়াল' নাম হতে নতুন মহকুমার নাম রাখা হয় ' নড়াইল'। ১৮৮১ সালে খুলনা তৃতীয় শ্রেণীর একটি জেলার মর্যাদা পায়। ঐ বছর দৈনিক স্টেটস্যম্যান পত্রিকায় ২ মে তারিখে 'New District' নামে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়। সংবাদটি নিম্নরূপ : 'From the first instant the much talked new district of khulna formed of the Subdivision of Satkhira, Narail, Khulna and Part of Bashirhat has been organise at head quarters of the Sub-Division bearing the name of the district.'[৪৬]

১৮৮৬ সালে কালিয়া থানা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯১১ সালের 'বঙ্গভঙ্গ রহিত আন্দোলনসূত্রে বড়োনাল কেন্দ্রিক ৩ রাত ৩ দিনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ৩/৪ বছরের জন্য তরফ কলাবাড়িয়ায় থানা স্থাপিত হয়। সুলতানি শাসনের পরে ডিহি কেলাবাড়ি মুঘল আমলে তরফ কলাবাড়িয়ার মর্যাদা পায়। ১৯১৪ সালে পুলিশ ষ্টেশন নড়াগাতি নদী বন্দরে উঠে যায়। কোম্পানি শাসন আমলে নড়াগাতির নাম রাখা হয়েছিল 'অমৃতনগর'। ১৯৩১ সালে নড়াগাতি থেকে থানা কার্যালয় কালিয়ায় পুনরায় স্থাপিত হয়।[৪৭] এই শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে স্টাটিসটিক্যাল রিপোর্টে দেখা যায়, নড়াইল মহকুমা নড়াইল সদর, বড়োকালিয়া ও লোহাগাড়া থানা নিয়ে গঠিত।[৪৮] এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য কালিয়া, এখন ছোট কালিয়া ও বড়কালিয়া নামে পরিচিত পায়। অতি আধুনিককালে কালিয়া নামেও একটি স্থান দেখানো হয়।[৪৯] প্রথম পর্যায়ে কালিয়া থানার কার্যালয় ছিল বড়োকালিয়ায়। আর থানার নাম ছিল 'বড়োকালিয়া'। এরপর যশোর মহকুমার অভয়নগর এবং ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা থানা নড়াইল মহকুমার সঙ্গে একত্রিত হয়ে নড়াইল মহকুমার প্রশাসনিক দেহ বৃদ্ধি পায়। এই সময় নড়াইল মহকুমাকে ৫টি থানা নিয়ে শাসিত হতে দেখা যায়।[৫০] ১৯৩৫ সালে নড়াইল মহকুমার সীমারেখার পরিবর্তন হয়। বিশেষত যশোর জেলার অভয়নগর থানার বিছালি ইউনিয়ন ও পেড়লি ইউনিয়ন দুটো সদর থানা ও কালিয়া থানার সাথে যুক্ত হলে নড়াইল মহকুমার কলেবর বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময় নড়াইল মহকুমার থানা সংখ্যা ছিল ৪টি। এবং ১৯৬০ সালের আগস্ট মাসের ১ তারিখে আলফাডাঙ্গা থানাকে নড়াইল মহকুমা থেকে পৃথক করে ফেলা হয়। এরপর নড়াইল মহকুমা ক্ষুদ্র মহকুমা বা সাব ডিভিশনে রূপ নেয়। এরপর ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধকালেও নড়াইল তার ক্ষুদ্র কলেবর নিয়ে অবস্থান করতে থাকে। ১৯৮৬ সালে নড়াইল মহকুমার অধিবাসীদের মিলিত সংগ্রামের ফলে নড়াইল একটি পূর্ণাঙ্গ মহকুমায় রূপ নেয়।

জমিদার-তালুকদার-গাঁতিদারদের বিবরণ

মুঘল শাসনামলে জায়গিরদার, জমিদার, তালুকদার গাঁতিদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বাধিকারীরা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থেকে মূলত রাজস্ব আদায়ের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলে আমরা জমিদারি প্রথার উল্লেখ দেখতে পাই। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে রামচন্দ্র নামের একজন জমিদারের কথা জানি। দিল্লির সালতানাতকে বিভক্ত করা হয়েছিল কয়েকটি ইকলিম বা প্রদেশ দ্বারা। কয়েকটি শিক দ্বারা বিভক্ত ছিল একটি ইকলিম। কয়েকটি কসবাহ বা খিত্তাহ্ দ্বারা বিভক্ত ছিল শিক। কয়েকটি ডিহি দ্বারা বিভক্ত ছিল একটি কসবাহ্। কয়েকটি কিসমত দ্বারা বিভক্ত ছিল একটি ডিহি। কয়েকটি গ্রামদ্বারা বিভক্ত ছিল ডিহি শেষোক্ত কয়েকটি প্রশাসনিক এলাকার মধ্যসত্বাধিকারীদের জায়গিরদার কিংবা জমিদার বলা হতো। মুঘল আমলে সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করা হয়েছিল কয়েকটি সুবা দ্বারা। সুবাকে ভাগ করা হয়েছিল সরকার দ্বারা। সরকারকে ভাগ করা হয়েছিল পরগণা দ্বারা। পরগনাকে ভাগ করা হয়েছিল তরফ দ্বারা। তরফকে ভাগ করা হয়েছিল মৌজা দ্বারা। মৌজা অর্থ গ্রাম। মুঘল আমলের শেষোক্ত কয়েকটি প্রশাসনিক বিভাগের রাজস্ব আদায় করতেন জমিদারেরা। জমিদার-জায়গিরদারেরা তাদের অধিক এলাকায় খাজনা আদায়ের জন্য বিভিন্ন রকম কর্মচারি নিয়োগ করতেন। সুলতানি ও মুঘল আমালের সামরিক কর্মচারিদেরও পাওনা মিটানোর জন্য জায়গিরদারি-জমিদারি দেওয়া হতো। বড়ো বড়ো জমিদার-তালুকদারেরা অনেক সময় দিল্লিতে বাদশাহের খাজনা আদায় থেকে বিরত থেকে নানা ধরনের গোলযোগের সৃষ্টি করতো। বিশেষ করে মুসলমান জমিদারদের বেলায় তা বেশি বেশি ঘটেছে। তাই সুবাদার মুর্শিদকুলি খান সুবা বাংলার অধিকাংশ জমিদারি অনুগত হিন্দুদের ইজারা দিয়েছিলেন। 'মুর্শিদকুলি খান সমগ্র বাংলাদেশের বড় ১৫টি জমিদারির মধ্যে তিনি ১৩টি বন্টন করেছিলেন হিন্দুদের মধ্যে এবং মাত্র ২টি দিয়েছিলেন মুসলমানদের মধ্যে। তা ছাড়া তিনি ২১টি ছোট জমিদারির মধ্যে ১৯টি বন্টন করেছিলেন হিন্দুদের মধ্যে এবং মাত্র ২টি জমিদারি দিয়েছিলেন মুসলমানদের মধ্যে।[৫১]

মুঘল শাসনামলে বাংলার মুসলমান জমিদার-জায়গিরদারদের মধ্যে খাজনা না দিয়ে বিদ্রোহ করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে সুবাদার মুর্শিদকুলি খানের চিন্তায় তা ধরা পড়ে। এই অবস্থায় তিনি মুসলমান জায়গিরদার জমিদারদের অনেকগুলো পরগনা একে একে নাটোরের রাজাকে ইজারা দিয়ে ছিলেন।[৫২] মুঘল আমলে সমাজের মর্যাদাশীল ব্যক্তিরাই জমিদারির অধিকারী হয়েছিলেন। জমিদারেরা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক তারা একটি অভিজাত সমাজ গঠন করেছিলেন। আর তখন ভূমিকর জনসাধারণের দেওয়ার ক্ষমতার মধ্যে ছিলেন ১৭৫৭ সালে বাংলার নবাব সরকারের পতন হলে এবং ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা ও বিহারের দেওয়ানি বা ইজারাদারি গ্রহণ করে। কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসায় মুনাফা সংগ্রহ ও ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ করা। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কোম্পানি সাধারণ মানুষের ওপর অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালাতে পাকে। মুঘল আমলে রাজস্ব সংগ্রহের ভার ছিল জমিদারদের ওপর। কোম্পানি জমিদারদের প্রধান প্রধান কাচারিতে তাদের নিযুক্ত একজন করে 'সুপারভাইজার' নিযুক্ত

করে। 'সুপারভাইজারেরা' সরকারি কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেশীয় জমিদারদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করতো। তাতে জনসাধারণ, জমিদার ও কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। কোম্পানির সুপারভাইজারদের প্রতি সন্তুষ্ট না থাকায় গভর্ণর জেনারেল হেস্টিংস সুপারভাইজারদের পদ লোপ করে ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত করেন। ১৭৭২ সালে বর্ধিত হারে নতুন করে আদায়ের জন্য জমিদারদের সাথে কোম্পানির সরকারের একটি পাঁচশালা বন্দোবস্ত হয়। এই চুক্তির বলে খাজনা আদায়ের জন্য কোম্পানি জমিদারদের সেনাবাহিনী দিয়ে সাহায্য করে। এরপর মুঘল আমলের অভিজাত জমিদার গোষ্ঠী তাদের জমিদারি হারাতে থাকে। অভিজাত জমিদারদের স্থলে ইংরেজ সরকারের দালাল, মুৎসুদ্দি, অত্যাচারী, নিপীড়ণকারী ও অতি সাধারণ বেনিয়া যারা বাংলার নবাবের বিরোধিতা করেছিল তারা জমিদারি লাভ করে। ঐ নতুন জমিদারেরা কোনো প্রকার ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু মনে করতো না। এই সময় বাংলা বিহার থেকে মুসলমানদের জমিদারি প্রায় বিলীন হয়ে যায়। পাঁচশালা বন্দোবস্তের ফলে জমিদারও কোম্পানির অবাধ লুণ্ঠনের জন্য ১৭৭০ সালে (বাংলা ১১৭৬) কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেখা দেয়। ঐ সময় বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। কোম্পানি মন্বন্তরের কোনো প্রতিকার না করেই ১৭৯৩ সালে 'বোর্ড অব ডাইরেক্টরস'-এর নির্দেশে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ঘোষণা করে। ঐ সময় নতুন জমিদারেরা নিজ নিজ এলাকায় 'রাজালোক' বনে যায়।

ঐ সময় থেকে কমপক্ষে একটি পরগণার ইজারাদারকে জমিদার হিসেবে গণ্য করা হয়। এই জমিদারেরা সরকারের দেয় রাজস্ব কালেক্টরিতে জমা দিতে বাধ্য থাকে। এ ছাড়া খণ্ড তালুক ও খণ্ড জমিদারির অংশ প্রাপ্ত গাঁতিদারেরাও কালেক্টরিতে তাঁদের রাজস্ব জমা দিতে বাধ্য ছিল। ঐ ৩ সংখ্যক মধ্যস্বত্যাধিকারী ছাড়াও বাংলা ও বিহারে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মধ্যস্বত্যভোগী জন্ম নেয়। যারা তাদের রাজস্ব (ভূমিরাজস্ব) নিজ নিজ পরগণার জমিদারির কাচারিতে দিতে বাধ্য থাকে।

বর্তমান নড়াইল জেলার মকিমপুর, নলদি, বেলফুলিয়া ও ইউসপুর পরগণার অংশ বিশেষ। কোম্পানি আমলের অন্যতম জমিদার নড়াইলের জমিদারদের এস্টেট এখানে সবচেয়ে বৃহৎ ছিল। তবু নড়াইলের জমিদারেরা সমগ্র নড়াইল জেলার জমিদার ছিলেন না। তাই সমগ্র নড়াইল জেলা কোনো একক জমিদারের আওতাভুক্তও ছিল না। এখানকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ইজারাদারগণ যে উপস্বত্ব ভোগ দখল করেছিলেন তারাই স্থানীয় জনসাধারণের কাছে জমিদারের সম্মানে সম্মানিত ছিলেন। নিজ নিজ এলাকায় ঐ সব জমিদারদের প্রতিপত্তি ও প্রচুর সম্মান ছিল।[৫৩] 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' পাঠে নড়াইল জেলা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আট শ্রেণীর মধ্যস্বত্ব ও উপস্বত্বভোগীর কথা জানা যায়। এবার আমরা নড়াইল জেলার ১ম শ্রেণীর ও ২য় শ্রেণীর ইজারাদার, জমিদার, তালুকদার ও গাঁতিদারদের বিবরণ দেব। বিশেষ করে যে সব ইজারাদার তাদের ভূমি রাজস্ব কালেক্টরিতে জমা দিতেন।

নড়াইল জমিদারি এস্টেট : নড়াইল জমিদারদের এই অঞ্চলে আগমনের কথা আগেই বলা হয়েছে। জমিদারদের পূর্ব পুরুষ ছিলেন রূপরাম দত্ত। রূপরাম নাটোরের জমিদারের অধীনে সামান্য চাকুরি করতেন। সেই সূত্রে তার পুত্র কালীশংকর দত্ত ও

নাটোর সরকারে লাঠিয়ালের চাকুরি গ্রহণ করেন।[৫৪] কালীশংকর নাটোর জমিদারের বিশ্বস্ততার মধ্য দিয়ে অসৎপথ অবলম্বন করে স্বনামে, বেনামে ও তার পুত্রদের নামে রাণী ভবানীর অনুগ্রহে জমিদারির সূত্রপাত করেন। কালীশংকর নড়াইলের আলাদাতপুর তালুক প্রথম ইজারা নিয়েছিলেন। কালীশংকর নাটোরের জমিদার রাণী ভবানীর সুপারিশে মুর্শিদাবাদের মিরজাফর বংশীয় নবাবের কাছ থেকে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে কালীশংকর তার জমিদারির সীমা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হন। বিশ্বাসের অপব্যবহারে মাধ্যমে কালীশংকর নাটোর রাজ্যের জমিদারির অন্তর্গত পরগনা তেলিহাটি, বিনোদপুর, রূপপাত, তরফ কালিয়া ও অন্যান্য মহাল নিজের অধিকারে আনতে সমর্থ হন। কালীশংকর ছলেবলে কৌশলে যে কোনো ভাবে সম্পত্তি ও সম্পদ লাভে যত্নবান ছিলেন। নাটোর অবস্থানকালে এক সময় দুষ্কর্মের জন্য কারাভোগও করেছিলেন তিনি। কালীশংকরের উত্তর বংশধরেরা পূর্ব পুরুষের কলাকৌশল অবলম্বন করে অনেকগুলো পরগণা ও তরফের মালিক হয়েছিলেন। নড়াইল জমিদারদের অত্যাচার ও শোষণের পাশাপাশি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজের কথাও আমরা জানতে পারি। জমিদারেরা ছিলেন শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক। নড়াইলের ভিক্টোরিয়া কলেজ, নড়াইল কলেজিয়েট স্কুল প্রভৃতি নড়াইলের জমিদারদেরই প্রতিষ্ঠিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নড়াইলের জমিদারদের আমন্ত্রণে এসেছিলেন অযোধ্যার নবাবের লাক্ষ্ণৌ দরবারের সভা গায়ক ওস্তাদ নেসার হোসেন খাঁ। ওস্তাদ নেসার হোসেন খাঁ নড়াইলের জমিদার বাড়ি ও অন্যান্য জমিদারি কাচারিতে, ধ্রুপদ, ঠুমরি, দাদরা পরিবেশন করেছিলেন। ঐ সব অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন নড়াইলের অন্যান্য জমিদার, তালুকদার ও গাঁতিদারেরা। মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন, ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে নড়াইলের জমিদার বাড়িতে ও তাদের প্রতিষ্ঠিত নীলকুঠিতে অবস্থান করেছিলেন। সাহিত্য সম্রাটের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নড়াইলের জমিদার পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী নিয়েই লেখা। বঙ্কিমচন্দ্র নড়াইলের অদূরে নড়াইলের জমিদার রতন রায়ের নির্মিত ঘোড়াখালি নীলকুঠিতে অবস্থান করেছিলেন। নড়াইলের জমিদার 'হরলাল রায়', কৃষ্ণকান্তের উইলের 'হরনাথ রায়' এবং ঘোড়াখালি নীলকুঠি 'প্রসাদপুর কুঠি' বলেই জানা যায়।[৫৫]

নড়াইল জমিদার পরিবারের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন জমিদার রামরতন রায়। রতন বাবুর জমিদারি আমলে তিনি ইংরেজ নীলকরদের সাথে পাল্লা দিয়ে বৃহত্তর যশোর, বৃহত্তর খুলনা, বৃহত্তর ফরিদপুর, বৃহত্তর কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকায় নীলকুঠি স্থাপন করে নীল ব্যবসায় মনোযোগী হন। রামরতন রায় আউড়িয়া, আফরা, তুষারডাঙ্গা, ঘোড়াখালি, ধোপাদি, শ্রীরামপুর, শৈলকুপা, কুমারগঞ্জ প্রভৃতি বিখ্যাত নীলকুঠির মালিক ছিলেন। ঘোড়াখালি নীলকুঠিতে একজন ইংরেজ ম্যানেজার রেখে রামরতন রায় নীলচাষের তত্ত্বাবধান করতেন। রামরতন রায়ের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই জমিদার পরিবারের সন্তান ধীরেন্দ্রনাথ রায় এই যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী শেখ মোহম্মদ সুলতানের প্রথম জীবনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দেশবিভাগের (১৯৪৭) অনেক আগেই নড়াইলের জমিদারেরা কোলকাতার কাশিপুরে বিশাল অট্টালিকাময় বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৫১ সালে

দেশে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হলে জমিদারদের বংশধরেরা ধীরে ধীরে চিরকালের জন্য দেশত্যাগী হন। আর তারা রেখে যান দেশে বিশাল বিশাল প্রাসাদ, চিত্রা নদীর তীরে অবস্থিত বাঁধাঘাট, মঠ, মন্দিরসহ বিভিন্ন কীর্তিরাজি।

হাটবাড়িয়ার জমিদার : নড়াইল শহরের অদূরে চিত্রা নদীর পশ্চিম তীরে হাটবাড়িয়া অবস্থিত। নড়াইলের জমিদারদের পূর্বপুরুষ কালীশংকর দত্তের এক পুত্র জয়নারায়ণের পুত্র জমিদার গুরুদাস রায় নড়াইল থেকে প্রায় দুই মাইল দক্ষিণ দিকে হাটবাড়িয়ায় প্রাসাদবাড়ি নির্মাণ করে জমিদারি করতে থাকেন। নড়াইল জমিদারদের হাটবাড়িয়া অংশের নাম ছিল 'হাটবাড়িয়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়া এষ্টেট'। নড়াইল জমিদারও হাটবাড়িয়া জমিদারদের মধ্যে দীর্ঘকাল মামলা মোকদ্দমা ও গোলযোগ ছিল। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্তের উইলে সেই গোলযোগের কাহিনীই স্থান পেয়েছে। হাটবাড়িয়ার জমিদারেরা নড়াইলের জমিদারদের মতোই শিক্ষা সমাজসেবা ও রাজনীতিতে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। ১৯৫১ সালে জমিদারি প্রথা রহিত হলে হাটবাড়িয়ার জমিদার বাড়ি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। পুরাতন অট্টালিকাগুলোর অবশিষ্টাংশও হাটবাড়িয়ায় নেই। শুধু প্রাচীনকালের একটি ভাঙ্গা মন্দির কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ইতনার রায় জমিদার : লোহাগড়া থানার ইতনা গ্রামে মুঘল আমলের পরমানন্দ রায় মুঘল বাহিনীর একজন বীর সৈনিক ছিলেন। পরমানন্দ তার পৌত্রীকে যশোরের জমিদার প্রতাপাদিত্যের পৌত্র বিজয়াদিত্যের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমান ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ এলাকায় পরমানন্দ রায়ের প্রাচীন জমিদারি ছিল। রাজা মুকুন্দরাম রায়েরও সেনাপতি ছিলেন পরমানন্দ রায়। পরমানন্দ রায় তার স্ত্রী দয়াময়ীর নামে ইতনা গ্রামে একটি সুন্দর মঠ তৈরি করেছিলেন। যার ধ্বংসাবশেষ আজো বিদ্যমান।[৫৬] ভুলক্রমে ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র এটাকে সীতারাম রায়ের বিজয় স্তম্ভ বলেছেন। মুঘল আমলে সীতারাম রায় নলদি পরগণার ইজারা নিলে সীতারাম ইতনায় পরমানন্দ রায়ের বংশধরদের জমিদারি ও সহায় সম্পদ দখল করেন। ঐ সময় হতেই ইতনার রায় জমিদার বংশ ধ্বংসমুখে পতিত হয়। তাই পরমানন্দ রায়ের অনেক কীর্তিই সীতারামের নামে চালু রয়েছে। 'দয়াময়ী স্মৃতি মন্দিরকে'কে স্থানীয় লোকেরা সীতারামের মায়ের স্মরণে মন্দির বলে মনে করেন। ধারণাটি ভুল।

রাজাপুরের মোল্লা জমিদার : লোহাগড়া থানার লক্ষ্মীপাশার সন্নিকটে একটি মোল্লা পরিবার সুলতানি ও মুঘল শাসনামলে জায়গিরদারি ও জমিদারি করতেন। রাজাপুরের মোল্লা পরিবার মান-সম্পন্ন প্রতিপত্তি ও সম্পদে শীর্ষস্থানের অধিকারী ছিলেন। এই পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে লোহাগড়ার রায়-মজুমদার পরিবারের সদস্যরা আরবি-ফার্সি শিখে মুঘল সরকারে চাকুরির যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। মোল্লাদের জমিদারি ও প্রতিপত্তি সেই কোম্পানি আমলের প্রথম দিকেই নিঃশেষ হয়েছে। তবে লক্ষ্মীপাশার ঐতিহাসিক মোল্লার মাঠ ও মোল্লার বাগ এই প্রাচীন জমিদারদের কীর্তি হিসেবে আজো বিদ্যমান।

শালনগরের চাকলানবিশ জমিদার : লোহাগড়া থানার চাকলানবিশ জমিদারি খুব প্রাচীন। এই জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামভদ্র চাকলানবিশ। রামভদ্রের প্রতিষ্ঠিত

দোলমন্দিরের গায়ে প্রতিষ্ঠাকাল ১১৩০ বাংলা সন অংকিত আছে। সুবাদার আলিবর্দী খানের শাসনামলে নবাব সরকারের চাকুরি সুবাদে ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান রামভদ্র জায়গির ও দেবোত্তর সম্পত্তি লাভ করে জমিদার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। সম্ভবত সূর্যাস্ত আইন কিংবা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রামভদ্রের বংশধরেরা তাদের জমিদারি হারিয়ে ছিলেন। শালনগরে রামভদ্র চাকলানবিশের অনেকগুলো ধর্মমন্দির কোনো ভাবে টিকে আছে।

লাহুড়িয়ার খাঁ ও মোল্লা জমিদার : পূর্বেই আলোচিত হয়েছে লোহাগড়া থানার লাহু-ড়িয়ার লাহোরি খার কর্মকাণ্ড। লাহোরি খাঁ মুঘল শাসনামলে জায়গির পেয়েছিলেন। তার জায়গিরদারি লাভের আগে এই লাহুড়িয়া গ্রামে সুলতানি আমলের এক প্রাচীন জমিদার পরিবারের কথা জানা যায়। তারা মোল্লা বংশীয় বলে আজো পরিচিত। যা হোক, জায়গিরদার লাহোরি খাঁ ও উক্ত মোল্লা জমিদারেরা ইংরেজ কোম্পানি শাসনামলে তাদের জমিদারি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যান। লাহোরি খাঁর দৌহিত্র সৈয়দ খাঁর কবর লাহুড়িয়া গ্রামে বিদ্যমান।[৫৭]

রায়গ্রামের ঘোষ জমিদার : লোহাগড়া থানার রায়গ্রামের নবগঙ্গা নদীর তীরে রায়গ্রামের ঘোষ জমিদার পরিবারের প্রাচীন কোটাবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। মুঘল সরকারের সেনাবাহিনীর সদস্য সীতারামের লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান রামরূপ বা মৃন্ময় ঘোষ এই জমিদার পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। রামরূপ মেনাহাতি নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। বিদ্রোহী সীতারামের পক্ষে যুদ্ধকালে মেনাহাতি মণিরামের হাতে নিহত হন। মেনাহাতি নিহত হলে তাঁর ভ্রাতা রামশংকর মুঘলের অধীনতা স্বীকার করে পুনরায় জমিদারি লাভ করেন। রায় গ্রামের ঘোষ জমিদারেরা দেশ বিভাগের আগেই যশোর শহরে বসবাস শুরু করেন।

কোটাকোল সরকার তালুকদার : কোটাকোলের সরকার তালুকদারেরা প্রাচীন তালুকদার বলে পরিচিত। সরকার পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মুঘল সরকারের কর্মচারি ছিলেন। কর্ম সুবাদে ঐ ব্যক্তি মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সরকার তালুকদার পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কোটাকোল গ্রামে একটি জোড় বাংলা ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন। স্থানীয় লোকের ধারণা, ঐ বংশের শেষ বংশধর শংকর দেবদেবী বিগ্রহ গোপনে দেশের বাইরে পাচার করে দেয়। চর- কোটাকোলের নীলকুঠি ও তার বিদ্রোহ সম্বন্ধে জানা যায়। কোটাকোলের সরকারেরা ছিলেন ঐ কুটির সমর্থক এবং এক সময়ের মালিক ছিলেন।

নলদি জমিদার : নলদি ঐতিহাসিক স্থান। প্রাচীন স্থান হিসেবেও নলদিকে গণ্য করা হয়। সুলতানি ও মুঘল শাসনামলে 'গাজিরমোকাম' প্রাসাদ দুর্গে কাজী ময়েযউদ্দিনের পূর্ব পুরুষেরা প্রশাসক ও কাজি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আজো গাজির মোকামে প্রাচীন রাজপ্রসাদ, মসজিদ, ঈদগাহ, দরবার হল, কবরস্থানের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। সীতারাম রায় নলদি পরগণার ইজারা নিলে প্রাচীন নলদির কাজি পরিবার দুর্বল হয়ে পড়ে। পরে মহামারির ভয়ে নলদি ত্যাগ করে কাজী পরিবার নবগঙ্গা নদীর পরপারে বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করে। প্রাচীন জায়গিরদার ও জমিদার হিসেবে নলদি কাজি পরিবারের বিশেষ অবস্থান রয়েছে। মুঘল সম্রাট আকবরের দেওয়া তায়দাদ

কাজি পরিবারে আজো বিদ্যমান।[৫৮]

কলাবাড়িয়ার মোল্লা জমিদার : কালিয়া থানার ঐতিহাসিক কলাবাড়িয়া গ্রামের ঐতিহ্যবাহী মোল্লা জমিদার পরিবার বেশ প্রাচীন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই জমিদার পরিবারের পূর্ব পুরুষ নড়াইল জেলার মহিশাপাড়ায় আগমন করেন। তিনি ছিলেন বাগেরহাট বিজেতা খানজাহান আলীর সহোদর। এই ব্যক্তি জাহান্দার বা জামদার খাঁ নামেই পরিচিত। বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার গোপীনাথপুরের বড়োবাড়িতে তার মাজার বিদ্যমান। জাহান্দারের অন্যতম পুত্র ওয়ালি মাহমুদ খাঁ এক অভিযানে কালিয়া থানার প্রাচীন কালীগঙ্গা ও নলিয়া নদীর মাঝখানে শিবপুর এলাকায় এক সামরিক অভিযান করেন। প্রতিপক্ষ এলাকা ত্যাগ করে। এই প্রতিপক্ষ হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়ি শিবপুর গ্রামের বারোকুড়োর মাঠে দেখতে পাওয়া যায়। জনশ্রুতি, এখানে স্থানীয় লোকের একটি মেয়েকে ওয়ালি দ্বিতীয় বিয়েতে আবদ্ধ করেন। এবং শিবপুর গ্রামের পূর্বদিকে নলিয়া নদীর তীরে ২৭ বিঘা জমির উপর একটি কেল্লা নির্মাণ করেন।[৫৯] ঐস্থান 'কেলাবাড়া' নামে পরিচিতি লাভ করেন। ঐ 'কেলাবাড়া' পরবর্তীকালে কলাবাড়িয়া গ্রাম নামে পরিচিতি পেয়ে আসছে। সুলতানি আমলের জায়গিরদার ছিলেন জাহান্দার খান। জনশ্রুতি, তিনি 'কিশোয়ার খাঁ' উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন 'সরকার-ই-লস্কর' বা আঞ্চলিক শাসক। আঞ্চলিক শাসক বা অভিজাত শক্তিমান ব্যক্তিদের সেই আমলে 'ঠাকুর' সম্বোধন করা হতো। জাহান্দারের পুত্র ওয়ালি মাহমুদ খাঁর 'কেলাবাড়া' এখন পরিত্যক্ত তবে লোকেরা শত শত বছর ধরে ঐ কেলার ভিটিকে ঠাকুরভিটে বা ঠাকুরভিটি বলে থাকে। বিশাল কেলাবাড়ায় জাহান্দারের পুত্র প্রাচীন জায়গিরদার ওয়ালি মাহমুদ মসজিদ ও মক্তব স্থাপন করেছিলেন।[৬০] সুলতানি শাসনামলে কেলাবাড়া ছিল ডিহি। কয়েকটি কিসমাত বা গ্রামের সমন্বয়ে প্রশাসনিক ইউনিট ডিহি গঠিত হতো।[৬১] ওয়ালির প্রথম পক্ষের একমাত্র পুত্র নাসির মাহমুদ কেল্লাবাড়ার ডিহিদার ছিলেন। নাসির মাহমুদকে খাঁ এবং মোল্লাহ দুটো উপাধিতেই সম্বোধন করা হতো। মোল্লাহ আরবি শিক্ষিত পণ্ডিতকে বলা হয়। নাসির মাহমুদের ৪ পুত্র সিরাজউদ্দিন, জয়েনউদ্দিন, আয়েনউদ্দিন ও সুবানউদ্দিন কেলাবাড়া (পরবর্তীকালে কলাবাড়িয়া)-এর উত্তর সীমান্তে ডাঙ্গার মধ্যে বসতি স্থাপন করেন মুঘল শাসনামরে। তাদের ঘরবাড়িতে ডাঙ্গা ভরে যায় বলে ঐ জমিদার পরিবারকে 'ডাঙ্গায়ভরা জমিদার' কিংবা বিকৃত করে 'ডোংগায়ভরা জমিদার' পরিবার বলা হয়। সুলতানি শাসনামলের প্রশাসনিক ইউনিট ডিহিকে মুঘল আমলে তরফ বলা হতো।[৬২] মুঘল আমলে কেলাবাড়া থেকে যেমন স্থানের নাম কলাবাড়িয়া হয় তেমনি তরফ কলাবাড়িয়া নামে পরিচিতি পায়।[৬৩] তখন তরফের মালিক বা জমিদার ছিলেন জায়েনউদ্দিন মোল্লা। আজো লোক মুখে মোল্লারতরফ শব্দটি চালু আছে। জায়েন-উদ্দিনের ৭ পুত্রের মধ্যে বড়ো মিয়া চাদ মাহমুদ ও মেঝো মিয়া কোরেশ মাহমুদ মোল্লাহ বর্তমান খুলনা, নড়াইল, বাগেরহাট ও গোপালগঞ্জ জেলার বেশ কিছু মহালের জমিদার ছিলেন। স্বাধীন নবাব সরকার (নবাব সিরাজ)-এর পতনের পরে শক্তিমান চাদমিয়া ও কোরেশ মাহমুদ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (১১৭৬ বাংলা সন, ইংরেজি ১৭৭০) প্রজার স্বার্থে যশোরের চাঁচড়ার রাজ জমিদারের দুইখানা চালের নৌকা লুট করে

ক্ষুধাতুর জনতাকে বিলিয়ে দেন।[৬৪] ঐ শক্তিমান জমিদার পরিবারকে নিয়ে নানা ধরনের কিংবদন্তি ও কিসসা কাহিনী আজো প্রচলিত আছে–তার একটি হলো :

পুটিমারি, দেবদুন বাঐসোনা কলাবেড়ে কান্দর
মানষির মদ্যি চাদ কোরেশ আর সব বান্দর।[৬৫]

বড়ো মিয়া চান মোল্লা ও কোরেশ মাহমুদ সমান জমাজমির অংশিদার ছিলেন। এই দুই ভাইয়ের মৃত্যুর পরে এই জমিদারি সম্পত্তি ৩টি ভাগে বিভক্ত হয়। কোরেশ মাহমুদের একমাত্র জীবিত পুত্র মুহম্মদ জকি মোল্লা হিস্যা অনুসারে অর্ধেক বা ১/২ অংশ সম্পত্তির অধিকারী হন। বড়োমিয়া চাদ মোল্লার ৪ পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র বক্তার মুন্সি মূল জমিদারির ১/৪ অংশ, জ্যেষ্ঠ রওশন মোল্যাহ, গোলাম হোসেন মুন্সি ও কালু মোল্লা ১/৪ অংশ সম্পত্তির মালিক হন। গোলাম হোসেন ও কালু মোল্লাকে জমিদারি সম্পত্তির সামান্য অধিকারী করা হয়। এই ভাবে জকি মোল্লার জমিদারি অংশকে বড়ো তরফ, বক্তার মুন্সির অংশ মধ্যম তরফ এবং আরশাদ মোল্লার অংশ ছোট তরফ হিসেবে গণ্য হয়। কলাবাড়িয়ার এই ঐতিহ্যবাহী জমিদার পরিবার জনসাধারণের অনেক উপকার সাধন করেছিল।[৬৬] গরিব প্রজার স্বার্থে অত্যাচারী প্রজাকে নিপীড়নের কিছু ঘটনা এলাকায় প্রচলিত থাকলেও তাদের শক্তিমত্তা ও জনকল্যাণ বিশ্রুত হওয়ার নয়। এই জমিদার পরিবার থেকে বড়োমিয়া চাদ মোল্লার ও কোরেশ মাহমুদ-এর বড়ো দাগের দানের কথা জানা যায়। তারা তাদের এক জ্ঞাতিকে ৭ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। এছাড়া তাদের দান করা আয়মা, চেরাগি ও চাকরান জমি আজো গরিব জনসাধারণ ভোগ করে চলেছে। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম পাদে জন্ম নেওয়া মুহম্মদ জকি মোল্লা এই বংশের সবচেয়ে শক্তিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন বড়ো তরফের সত্বাধিকারী। এবং নিজ নামের 'জকি মোল্লা এস্টেটের' একমাত্র জমিদার। তিনি নিয়মিত একাধিক অশ্ব, ছিপ ও লাঠিয়ালদের দ্রুত গমনের জন্য বাচাড়ি নৌকা রাখতেন। তার বদন্যতায় অনেকেই উপকৃত হয়েছেন। জকি মোল্লার কলাবাড়িয়া গ্রামের বিশিষ্ট গাঁতিদার শেখ মোলামের কন্যাকে বিয়ে করেন। মোলামের ভ্রাতুস্পুত্র বড়োমিয়া শেখ আকবরের সমন্বয়ে কলাবাড়িয়া নীলকুঠির মালিক কুঠিয়াল এম এন কাসিন ডানলপকে বিতাড়িত করেন। সম্ভবত ডানলপ জকি মোল্লার নিকট থেকে নীলচাষের জন্য জমি ইজারা নিয়েছিলেন। ডানলপের সাথে জকি মোল্লার সম্পর্ক খারাপ ছিল না। কিন্তু নীলকর ডানলপের অত্যাচারে তিনি রুষ্ট হন এবং ডানলপের পতন ঘটে।

জকিমোল্লার পৌত্র মুহম্মদ সামাদ মিয়া ফরিদপুর জেলার ভূষণা পরগণার দুটো বৃহৎ তালুকের মালিক ছিলেন। যে তালুকের দখল নিয়ে সুলতানি ও মুঘল আমলে শত শত বছর ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল। জকি মোল্লা এষ্টেটের শেষ মালিক ছিলেন (১৯৫১ পর্যন্ত) জকির প্রপৌত্র মুহম্মদ আবদুর রাজাক মিয়া। কলাবাড়িয়ার মোল্লা জমিদার পরিবার তাঁদের ঐতিহ্য অনুসারে গ্রামে চুলকাটার জন্য নাপিত, খবরাখার ও ঢোল শহরত করার জন্য দাই, বস্ত্র পরিস্কার করার জন্য ধোপা (শেষ ধোপা নড়াগাতির রজনী) ও মসজিদে ইমামতি করার জন্য মুন্সি ও মাছ সরবরাহ করার জন্য জেলে পরিবারকে প্রচুর জমিদান করেছিলেন। এই ছাড়া প্রাতিরক্ষার জন্য গাজি বংশীয় লোকদেব চাকরান জমি

দিয়েছিলেন তারা। আজো এই জমিদার পরিবারের দানে অনেকেই পুষ্ট। জমিদারি বিভাগ এবং অংশীদারিত্বের জন্য কলাবাড়িয়া মোল্লা জমিদার পরিবারের অবস্থান স্থল 'মোল্লাপাড়া' কিংবা 'দশানিপাড়া' বলে খ্যাত। এইভাবে তাদের জমিতে বসবাস করতে দেওয়া মাঝিদের 'দশানির মাঝি' এবং মাঝি পাড়াকে 'দশানিপাড়া' বলে।[৬৭]

কলবাড়িয়ার সরকার জমিদার : কলবাড়িয়া গ্রামে খড়রিয়া মেজজিলা সিণ্ডিকেট কোঃ লিঃ হতে ৫৬ বিঘা নিষ্কর জমি পেয়ে শীতল সরকারের প্রপিতামহ কলবাড়িয়ায় গাঁতিদারি পান। শীতল সরকারের পূর্ব পুরুষেরা জেলে ও পরামানিকদের নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। এই পরিবারের সদস্যরা দানদক্ষিণা দিয়ে বেশ খ্যাতি অর্জন করেন। পূজাপার্বণে তাদের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কলবাড়িয়া স্কুল প্রতিষ্ঠায়ও এই পরিবারের কিছু জমিদান করা আছে। এই পরিবারের বসতি দেওয়া মাঝিরা 'ছয়ানিপাড়ার মাঝি' বলে পরিচিত। সরকার পরিবারের জমিদারির অংশ হিসেবে তাদের বসতি এলাকাটি 'ছয়আনি পাড়া' নামে খ্যাত হয়েছে।

কামালপ্রতাপের মুন্সি জমিদার : লোহাগড়া থানার কামালপ্রতাপের মুন্সিদের জমিদারি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। মুন্সি বরকাতুল্লাহর পুত্র যথাক্রমে তমিজউদ্দিন, মফিজউদ্দিন, ইরফানউদ্দিনও ইমদাদউদ্দিন বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। উক্ত সহোদরদের মধ্যে তমিজউদ্দিন ছিলেন সদরে আলা, মফিজউদ্দিন সাবজজ, ইরফানউদ্দিন জমিদার ও ইমদাদউদ্দিন মুন্সেফ ছিলেন। জমিদার ইরফানউদ্দিন তফসিরা মৌজার মালিক ছিলেন। মুন্সি জমিদার পরিবারের ৩টি বিশাল দিঘি কামালপ্রতাপ গ্রামে আজো বিদ্যমান থেকে ঐ পরিবারের কীর্তি ঘোষণা করছে।

মাউলির দত্ত তালুকদার : মাউলি গ্রামটি বেশ প্রাচীন। কালিয়া থানার একটি গ্রাম মাউলি। মুঘল আমলে কোনো ব্যক্তি এলাকাটি 'মাওলি' বা ইজাবাদারি সম্পত্তি হিসেবে পেয়েছিলেন। সে ইতিহাস জানা যায় না। তবে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত মাউলির তালুকদার কিংবা গাতিদার চন্দ্রনাথ বাবুর খ্যাতি কিংবা কুখ্যাতি শোনা যায়। অত্যাচারী ছোট জমিদার হিসেবে চন্দ্রনাথ আজ এলাকাবাসীর কাছে এক বিস্মৃতি।[৬৮]

পুঁটিমারির শিকদার গাঁতিদার : কোলকাতার জানবাজারের বিখ্যাত জমিদার রাণী রাসমণির এষ্টেটের সঙ্গে জনৈক ওটু শিকদারের ভালো সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। অন্য মতে, ওটু শিকদার ঐ এষ্টেটের গোপালগঞ্জ কাচারির একজন সামান্য কর্মচারি ছিলেন। পরবর্তীকালে ওটু শিকদার মকিমপুর পরগনার পুটিমারি মহালের গাঁতিদারি পেয়ে ঐ স্থানে বসতি স্থাপন করেন। ওটু শিকদারের বংশধর পরশউল্লাহ শিকদার শক্তিমান গাঁতিদার হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

কলাবাড়িয়ার শেখ গাঁতিদার : কলবাড়িয়া গ্রামের আরেকটি প্রাচীন গাঁতিদার পরিবারের নাম জানা যায়। এই পরিবারে অবস্থিতি এখন কলবাড়িয়া গ্রামের নলিয়া নদীর পশ্চিমপারে। যতোদূর জানা যায়, মুঘল শাসনামলেও এই শেখ পরিবারের প্রতিপত্তি ছিল। এই পরিবারের শক্তিমান গাঁতিদার শেখ মোলাম স্বাধীন চেতা ও কোম্পানি শাসনের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছিলেন। শেখ মোলাম একমাত্র কন্যাকে বিয়ে দিয়েছিলেন সেই যুগের শক্তিমান জমিদার মুহম্মদ জকি মোল্লার সঙ্গে। শেখ মোলামের ভ্রাতুষ্পুত্র বড়োমিয়া শেখ গোলাম আকবরও গাঁতিদার হিসেবে খ্যাতি অর্জন

করেছিলেন। তিনি কলবাড়িয়া নীলকুঠির কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন।[৬৯]

শিঙ্গাশোলপুরের রায় জমিদার : শিঙ্গাশোলপুরের রায় বংশীয় জমিদারেরা কোম্পানি শাসনামলে তালুকদারি পেয়েছিলেন। তাদের বাড়ির ধ্বংসস্তূপ তাদের বিগত দিনের সম্মান ও প্রতিপত্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কলোড়ার মিত্র জমিদার : নড়াইল থানার মিত্র বংশীয় জমিদার পরিবারের বেশ সামাজিক প্রতিপত্তি ছিল। মিত্র পরিবার আর্থিক দিক দিয়ে নড়াইলের জমিদার পরিবারের সমকক্ষ ছিল না তবে বংশীয় আভিজাত্যে মিত্র বংশ ছিল শ্রেষ্ঠ।

রামচন্দ্রপুরের মিয়া জমিদার : নড়াইল থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামের মিয়া পরিবার অভিজাত জমিদার পরিবার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। মিয়া জমিদারেরা একটি বনেদি মুসলিম পরিবার হিসেবে খ্যাত। মুঘল শাসনামলের এই জমিদার পরিবার ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ পর্যন্ত তাদের প্রতিপত্তি রক্ষা করতে পেরেছিল।

মালিডাঙ্গার চৌধুরী জমিদার : নড়াইল থানার মালিডাঙ্গা গ্রামের মুসলিম চৌধুরী জমিদার পরিবার প্রাচীন জমিদারদের পরিবারগুলোর একটি। মোট ৯ পাখি জমির ওপর ছিল চৌধুরীদের কোঠাবাড়ি। বাড়ির চারপাশে ছিল গড় কাটা। এবং অনেকগুলো পুকুর। বাড়ির চারিপাশ দেওয়াল দ্বারা রক্ষিত ছিল। মুঘল আমলের এই জমিদার পরিবার উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। শোনা যায়, ১৮৬১ সালে মালিডাঙ্গার চৌধুরীদের বাড়ি ভেঙ্গে তৎকালীন নড়াইল এসডিওর বাসভবন তৈরি করা হয়, এই তথ্য চৌধুরী পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের একজন আদম চৌধুরী জানিয়েছেন।

বোড়ামারার কাজি গাঁতিদার : নড়াইল থানার বোড়ামারা গ্রামের কাজি পরিবারের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন কাজি বদিউজ্জামান। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্থানীয় জমিদারকে খাজনা দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। এবং বদিউজ্জামান দিল্লির মুঘল সম্রাটের বংশধর বলে দাবী করতেন। মাইচপাড়া গ্রামের মসজিদের ভিত অমুসলমানেরা ভেঙে ফেললে বদিউজ্জামান বাধা দেন। এবং নড়াইলের জমিদার ধীরেন রায়কে দিয়ে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়েছিলেন। কাজি বদিউজ্জামান মাইচপাড়া ও তুলোরামপুর স্কুলের জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন।

নোয়াগ্রামের সৈয়দ জমিদার : লোহাগড়া থানার মণ্ডলগাতি গ্রামে মুঘল শাসনামলে 'মির' নামধারী একটি শাসক কর্মচারী পরিবার বসতি স্থাপন করে। মুঘল কর্মচারীদের উপাধি ছিল 'মির'। যেমন মির সামান, মির বুকাইলি, মির-ই-নওয়ারা প্রভৃতি। এই পরিবারটিও এই পর্যায়ের। ১৭০৭ সালের দিকে কোনো মুঘল দেওয়ান মির পরিবারের একটি সুন্দরী মেয়েকে জোরপূর্বক বিয়ে করতে চায়। শক্তিমান দেওয়ান মধুমতি নদী হয়ে ইছামতি বিলের মধ্যে দিয়ে আসার সময় বিভিন্ন শাওলা ও দামে তার নওয়ারা বা নৌকা আটকিয়ে ফেলে। ইতোমধ্যে মেয়েটির বাবা মির সাহেব বিপদ থেকে মুক্তির জন্য সিজদায় পড়ে থাকেন। দেওয়ানের কাছে সিজদায় পড়ে থাকার সংবাদ পৌঁছালে তিনি মেয়েটিকে হরণ করার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন। এবং মেয়েটির পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। একটি বিস্তৃত ডাঙ্গা মিরদের নিষ্কর দান করেন। সেই ডাঙ্গাটি আজো মিরেরডাঙ্গা নামে পরিচিতি পেয়ে আসছে। আর মির বংশীয় লোকেরা পরবর্তীকালে

সৈয়দ বংশ বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। গাঁতিদারও সম্মানিত পরিবার হিসেবে নোয়াগ্রামের সৈয়দেরা নড়াইলে বিশেষ পরিচিত।[৭০]

মিরেপাড়ার মিরনওয়ারা জায়গির পরিবার : যতদূর ধারণা করা যায়, দিল্লির সম্রাট আকবরের শাসনামলে নড়াইল থানার বর্তমান মিরেপাড়া গ্রামে চাঁদ মির ও তারা মির নামের দুই সহোদর নওয়ারা মহলের জায়গির পেয়ে আগমন করেন। এই মির পরিবারের নাম অনুসারে মিরেপাড়া নামের উৎপত্তি। আজো ১৭ একর জমি নিয়ে যে চাঁদের ভিটে বিদ্যমান তা ৯টি ছোট ছোট ভিটেয় বিভক্ত। মির জায়গিরদারদের খনন করা প্রাচীন দিঘিও ছোট ইটের প্রাচীন দরদালানের ধ্বংসাবশেষ আজো রয়েছে। মির জায়গিরদার পরিবারের প্রাচীন কীর্তিরাজি প্রায় আধ মাইল এলাকা জুড়ে দেখতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, চাঁদ মির ও তারা মির নড়াইল এলাকায় আগমন করেন বারোজাতির লোকজন নিয়ে। আজো মিরেবাড়ির ভিটেগুলোর নামকরণের সাথে সেই বারো জাতির চাকরান পাওয়া গোষ্ঠীগুলোর নাম জানা যায়। প্রাচীন জায়গিরদার মিরেরবাড়ির সংলগ্ন ভিটেগুলো বিশ্রুত ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়। এক সময় এখানে ছিল বিরাট জনবসতি। পরবর্তীকালে তা জনশূন্য হয়ে পড়ে। আলোচ্য ভিটেগুলোর নাম যথাক্রমে : ১. মুচির ভিটে ২. গোয়ালেভিটে ৩. হিজলতলার ভিটে ৪. চাপড়ার ভিটে ৫. হাটভিটে ৬. সড়াতলার ভিটে ৭. নাসিরের ভিটে ৮. ধোপাভিটে ৯. সুতার ভিটে ১০. দাই ভিটে ১১. পাটনি ভিটে ১২. কাহার ভিটে ১৩. কিতাবদি-মাহাতাবদির ভিটে। বিশাল দিঘির দক্ষিণ পাশে ছিল কবরস্থান। ঐ স্থানে তারা মিরের ছোট ইটের বাঁধানো কবর ছিল। আনুমানিক ১৩৫০ সালে দুর্গাপদ চক্রবর্তী নামীয় জনৈক ব্যক্তি তারা মিরের বাঁধানো কবরটির ইট উঠিয়ে ফেলেন। যত দূর ধারণা করা যায়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় তাঁরা মিরের উত্তরাধিকারীরা জমিদারি হারিয়ে অন্যত্র চলে যান। তাঁরা মিরের বিশাল সম্পত্তিকে হাটবাড়িয়ার জমিদার দেবীমাতা কালীর নামে রেকর্ড করেন। পরবর্তীকালে মিরের মহল ভদ্রবিলার ঋষীকেশ ঘোষের স্ত্রী নলিনীবালা ঘোষের নামে গেলে তিনি 'রাধাকৃষ্ণের সেব্য' বলে নির্ধারণ করেন। কিংবদন্তি আছে, মিরেপাড়ায় অবস্থান করার কিছুকাল পরে চাঁদমির মৃত্যুবরণ করেন। অন্যমতে, এলাকায় মহামারি দেখা দিলে চাঁদমির স্থান ত্যাগ করেন। আর কখনো ফিরে আসেন নি। বর্তমান প্রজন্মের লোকেরা মিরেপাড়ার মিরের ভিটের চাঁদ মির এবং তারা মিরের প্রকৃত ইতিহাস জানে না। তাই এই দুই শক্তিমান বীর সহোদরকে ডাকাত বলে অনুমান করে। এমনকি মিরের ভিটেকে ডাকাতির ভিটেও বলে থাকে। পূর্বে আলোচিত উজিরপুর সুলতানি শাসনামলে ছিল খাজনা আদায়ের কেন্দ্র। এমন কি মুঘল কর্মচারি রাজা সত্রাজিতের সময়ও তা বহাল ছিল। পরবর্তীকালে চাঁদ মির, তারা মির মুঘল কর্মচারী হিসেবে খাজনা আদায় কেন্দ্র উজিরপুরের অদূরে মিরেপাড়ায় স্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে চাঁদ মির ও তারা মির ছিলেন মুঘল সেনাবাহিনী তথা নওয়ারা মহলের সামরিক কর্মচারী।[৭১]

লোহাগড়ার সরকার জমিদার : লোহাগড়ার বারুজীবী সমাজের সরকার বংশীয় লোকেরা মুঘল নওয়ারা বহরের কর্মচারী ছিলেন। এই পরিবার মুঘল আমলেই কিছু জায়গিরজমার অধিকারী ছিলেন। সম্ভবত লোহাগড়ার কালনা কেন্দ্রিক নওয়ারা বহরের মির-ই-নওয়ারা ছিলেন। এই বংশের কৃতিপুরুষ যদুনাথ মজুমদার এক সময় যশোরের

সরকারি উকিল ছিলেন। এই বংশের এক ব্যক্তি মজুমদার, এক ব্যক্তি সরকার ও অন্য ব্যক্তি রায় উপাধি পেয়েছিলেন। এই ৩টি পরিবারের লোকেরা পাশাপাশি বসতি স্থাপন করে ছিলেন। এই যৌথ পরিবারের রাধানাথ মজুমদার, রামপ্রসাদ রায়, পদ্মলোচন মজুমদার, দীননাথ রায়, জয়চন্দ্র রায়, সত্যমন্ত সরকার বিভিন্ন নীলকুঠির কর্মচারী হিসেবে অনেক অর্থের মালিক হয়েছিলেন। রাধানাথ মজুমদার ছিলেন এ্যালেন কোহেন ডানডালপের অধীনে বিভিন্ন সময়ে তেলজুড়ি, উলো ও মাদারতলা নীলকুঠির দেওয়ান বা বড়োবাবু। রামপ্রসাদ চরমল্লিকপুর কুঠির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পরে ঐ নীলকুঠি মকিমপুর জমিদারের নিকট বিক্রয় করেন। পদ্মলোচন মজুমদার চরমল্লিকপুর নীলকুঠির আমিন ছিলেন। তিনি অত্যাচারীও ছিলেন। নীলবিদ্রোহের পরে প্রাণভয়ে পদ্মলোচন বৃন্দাবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দীননাথ রায় জোড়াদহ কনসারনের সাহাপুর ও পরে ডানলপ সাহেবের বিজয়নগর কুঠির দেওয়ান ছিলেন। জয়চন্দ্র রায় প্রথমে জোড়াদহ কুঠির দেওয়ান পরে তেলজুড়ি ও বড়োজিয়ালা নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন। লোহাগড়ার রায়-মজুমদার-সরকার পরিবারের অনেক লোক শিক্ষাদীক্ষায় উন্নতি লাভ করেছিলেন। দেশ বিভাগের আগে ও পরে তারা লোহাগড়া ত্যাগ করে ভারতে বসতি স্থাপন করেন।[৭২]

ফেদির শেখ তালুকদার : নড়াইল জেলার ফেদি ও সংলগ্ন এলাকার বিশিষ্ট তালুকদার ছিলেন ফাজল শেখ। তিনি স্থানীয় নীলকুঠির নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজার পক্ষে বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। নবগঙ্গা নদীর পরপারের ঘোষ জমিদারেরা ফেদির নীলকুঠিয়ালকে নীলচাষের জন্য জমি ইজারা দিয়েছিলেন।[৭৩]

সার্কেলডাঙ্গার মির জায়গিরদার : নড়াইল থানার সার্কেলডাঙ্গা গ্রামে সুলতানি শাস-নামলে একজন জায়গিরদার ছিলেন। সুলতানি শাসনামলে ১০ জন সেনানির অধিপতিকে বলা হতো সারখেল। প্রাচীন সুলতানি আমলের সেনাপতি মির বংশীয় ছিলেন। তিনি মির জয়েনউদ্দিন। এই সারখেল দিল্লি সরকারের অধীন বেশ বড়ো ধরনের জায়গিরদারি-জমিদারি পেয়েছিলেন। সারখেলের বড়ো কীর্তি হলো বিশাল বিশাল দুটো দিঘি। সেই দীঘির পাশ দিয়ে এক সময় কালীগঙ্গা নদী প্রবাহিত ছিল।[৭৪]

শিয়ারবরের চাকলানবীশ জমিদার : লোহাগড়া থানার শিয়রবর গ্রামের চাকলানবীশ পবিবার জমিদার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তারা অতি জাঁকজমকের সাথে পূজো অর্চনা করতেন। মানুষের কল্যাণে ও দানধ্যান করতেন।

তথ্য নির্দেশ

১. যশোরাদ্যাদেশ, হোসেনউদ্দিন হোসেন, পৃ. ২
২. যশোরাদ্যাদেশ, হোসেনউদ্দিন হোসেন, পৃ. ৪
৩. বাংগালীর ইতিকথা, আখতার ফারুক, ১৯৬৯, পৃ. ৯
৪. কালিয়া উপজেলা পরিক্রমা, মহসিন হোসাইন, পৃ. ৩
৫. কালিয়া উপজেলা পরিক্রমা, মহসিন হোসাইন, পৃ. ৪
৬. খুলনা জেলা, মোঃ নূরুল ইসলাম
৭. যশোরাদ্যাদেশ, হোসেনউদ্দিন হোসেন, পৃ. ৪

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩, ৪
৯. মানিক বিশ্বাস (৪৬), সাবেক ইউ পি চেয়ারম্যান, মাউলি, কালিয়া
১০. শা. ম. আনয়ারুজ্জামান, লাহুড়িয়া, থানা : লোহাগড়া
১১. জয়নাল আবেদীন (৪০), সাংস্কৃতিককর্মী, ইতনা, লোহাগড়া, ১৯৮৫
১২. জয়নাল আবেদীন (৪০), সাংস্কৃতিককর্মী, ইতনা, লোহাগড়া
১৩. লোহাগড়া উপজেলা সংকলন '৮৪, অধ্যাপক সাঈদুর রহমান, পৃ. ৯
১৪. লোহাগড়া উপজেলা সংকলন '৮৪, অধ্যাপক সাঈদুর রহমান, পৃ. ১০
১৫. চরিতাভিধান : বৃহত্তর ফরিদপুর, সাঈদাজামান ও মহসিন হোসাইন
১৬. লোহাগড়া উপজেলা সংকলন '৮৪, অধ্যাপক সাঈদুর রহমান, পৃ. ১১
১৭. যশোরাদ্যাদেশ, হোসেনউদ্দিন হোসেন, পৃ. ৯
১৮. প্রাগুক্ত, ৯
১৯. প্রাগুক্ত, ১০
২০. কালিয়া উপজেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মহসিন হোসাইন, পৃ. ২৯
২১. শেখ আবদুস সবুর, প্রাক্তন উপজেলা চেয়ারম্যান, লোহাগড়া
২২. যশোরাদ্যাদেশ, হোসেনউদ্দিন হোসেন, পৃ. ৪২
২৩. সুন্দরবনের ইতিহাস, এ.এফ.এম. আবদুল জলীল
২৪. নমশূদ্র সমাজের বিখ্যাত ব্যক্তি কবিয়াল বিজয় সরকার বলেছেন, বল্লাল সেনের অত্যাচারে তার পূর্ব পুরুষেরা যশোর শহরের উত্তরদিকে কোনো স্থানে বসতি স্থাপন করেন।
২৫. History of Bengal (1) D. Mohr Ali, P 102
২৬. ১২৩ হিজরির একটি শিলালিপি, মেহরাব আলী
২৭. যশোরাদ্যাদেশ, হোসেনউদ্দিন হোসেন, পৃ. ১০০
২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০
২৯. হযরত খান জাহান আলী (রহ), এ.এফ.এম. আবদুল জলীল, পৃ. ৬৮
৩০. ধূসর অতীত, আবুল কালাম সামসুদ্দীন
৩১. বাহারিস্তান-ই-গায়বী (১ম খণ্ড) মির্জা নাথান, পৃ. ২৫০
৩২. আবদুল জলীল মিয়া (৮০), গ্রাম : গোপীনাথপুর, গোপালগঞ্জ, ১৯৮৩
৩৩. মুহম্মদ মোশারফ মোল্লা (৮০) আজিজুল মৃধা (৬৫), গ্রাঃ কলাবাড়িয়া, থানা : কালিয়া, নড়াইল
৩৪. দশানিপাড়া বা মোল্লাপাড়ায় জাহান্দার ও ওয়ালি মাহমুদের বংশধরেরা বিদ্যমান
৩৫. যশোরাদ্যাদেশ, হোসেনউদ্দিন হোসেন, পৃ. ২৯
৩৬. বাহারিস্তান-ই-গায়বী (অনুবাদ ; ১ম খণ্ড), মির্জা নাথান, পৃ. ১৪
৩৭. যশোরাদ্যাদেশ, হোসেনউদ্দিন হোসেন, পৃ. ৩০, ৩১
৩৮. বাহারিস্তান-ই-গায়বী (১ম খণ্ড) মির্জা নাথান, পৃ. ১২৮
৩৯. বর্তমান লেখকের সংগ্রহে ডিহি কলাবাড়িয়ার কাগজপত্র আছে
৪০. ওয়ালি মাহমুদ খাঁ জাহান্দার খাঁ-র অন্যতম পুত্র
৪১. বাকা সরদার (৭২) রায়পুর, কালিয়া, ১৯৮১
৪২. শ্রী হীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, সচিত্র ছেলেদের যশোহর, ১৯৫০ পৃ. ২৭

৪৩. আবদুল মান্নাফ মোল্লা, (৯০), সাবেক প্রেসিডেন্ট, কলাবাড়িয়া ইউনিয়ন, কলাবাড়িয়া, কালিয়া
৪৪. যশোরাদ্যাদেশ, হোসেনউদ্দিন হোসেন,
৪৫. কালিয়া উপজেলা পরিক্রমা, মহসিন হোসাইন, পৃ. ৯
৪৬. The Daily Statesman, 2nd May, 1881
৪৭. কালিয়া উপজেলা পরিক্রমা, মহসিন হোসাইন, পৃ. ৯
৪৮. Statistical Report on Jessore, 1901
৪৯. প্রাগুক্ত
৫০. Statistical Repoit on Jessore. 1931
৫১. টাঙ্গাইলের ইতিহাস. খন্দকার আবদুর রহিম, পৃ. ১৯৭৪
৫২. নাটোরের স্মারক গ্রন্থ
৫৩. কালিয়া উপজেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মহসিন হোসাইন, পৃ. ৫৫
৫৪. নাটোর স্মারক গ্রন্থ
৫৫. শতাব্দীর সাক্ষী, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৯
৫৬. শ্রী হীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, সচিত্র ছেলেদের যশোহর
৫৭. সৈয়দ নূরুল আজিম (৭০) হাফেজ, লাহুড়িয়া, লোহাগড়া ১৯৮৭
৫৮. ড. ওসমান গনি (৯১), লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া, ১৯৮৭
৫৯. আজিজুল্লাহ মৃধা (৬২), কলাবাড়িয়া, পশ্চিমপার, কালিয়া
৬০. কালিয়া উপজেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মহসিন হোসাইন, পৃ. ৮০
৬১. প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা গ্রন্থ
৬২. প্রাগুক্ত
৬৩. ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাচীন দলিলপত্র
৬৪. কালিয়া উপজেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মহসিন হোসাইন, পৃ. ৫৭
৬৫. আজিজউল্লাহ মৃধা (৬২), কলাবাড়িয়া, পশ্চিমপার ও কালিয়া উপজেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মহসিন হোসাইন, পৃ. ৫৭
৬৬. আবদুল মান্নাফ মোল্লা (৯০), গ্রাম : কলাবাড়িয়া, থানা : কালিয়া
৬৭. আবদুল মান্নাফ মোল্যা (৯০). গ্রাম : কলাবাড়িয়া, থানা : কালিয়া, বাকা সরদার (৮২), গ্রাম : রায়পুর, থানা : কালিয়া
৬৮. মুহম্মদ জাফর মিয়া (৭৫) ও মানিকচন্দ্র বিশ্বাস : প্রাক্তন, ইউ পি চেয়ারম্যান, গ্রাম : মাউলি, থানা: কালিয়া, ১৯৮৬
৬৯. শেখ কালোমিয়া (৫৩), কলাবাড়িয়া, কালিয়া, ১৯৯১
৭০. এ্যাডভোকেট সৈয়দ গোলাম মোস্তফা (৫৪), সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা, ১৯৮৬
৭১. হাবিব কাজী (৫২) ও মুহম্মদ শহিদ কাজী (৩৮), গ্রাম : পোলোই ডাঙ্গা, থানা : নড়াইল, ১০৮২
৭২. রায়-মজুমদার-সরকার বংশের ইতিবৃত্ত, অবিনাশচন্দ্র সরকার
৭৩. আবদুর রহমান (২৮), গ্রাম : ফেদি, থানা : নড়াইল
৭৪. কালিয়া উপজেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মহসিন হোসাইন, পৃ. ৩২

সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস

ইতিহাসের প্রাচীন ধারা অনুসারে বলা যায়, 'বঙ্গ জাতির' লোকেরা আদিকালে উপবঙ্গ বা গাঙ্গেয় 'ব-দ্বীপে' বসবাস করতো। আধুনিক নৃ-বিজ্ঞানীদের মতে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রধানত আদি অষ্ট্রেলীয় ও আলপাইন এই জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত ধারা। কিছুকাল পরে মংগোলীয় জনগোষ্ঠীর রক্তধারা এখানকার জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে যায়। কোচ, মেচ, গারো, চাকমা, হাজং প্রভৃতি মংগোলীয় জনসমষ্টির রক্তের প্রভাব বাংলাদেশের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান। নড়াইল জেলায় অধিক মানবগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করেছিল বলে ধারণা করা যায়। এই জেলার সুপ্রচলিত কয়েকটি অষ্টিক শব্দ তা-ই প্রমাণ করে। সেই অষ্টিক শব্দগুলো নিম্নরূপ : লাঙ্গল, টেংগারি, চাষ, ধান, কার্পাস, কদলি, কদম্ব, জাম্বুরা, বেগুন, লাউ, নারিকেল, সুপারি ইন্দুর, ময়ূর, মুকুট প্রভৃতি। গণ্ডা, কুড়ি, ও পণ অষ্টিক শব্দ। অঙ্গ বঙ্গ পুণ্ড্রও অষ্টিক ভাবজাত।[১]

নড়াইল জেলার জনসমষ্টিতে নানাজাতির মিশ্রণ ঘটা সত্ত্বেও তাদের অবয়বে ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। যাদের আদিবাস অষ্ট্রেলিয়ায় আধুনিক গবেষণায় তাদের ভেড্ডি বা ভেড্ডিপ্রতিম নরগোষ্ঠী বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সাঁওতাল, মুণ্ডি, শূদ্র– পৌণ্ড্র, বাগদি, চণ্ডাল বা চাড়াল এমনকি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে ভেড্ডি জাতির উপাদান বিদ্যমান। অনার্য-দ্রাবিড়েরাও ভেড্ডি প্রতীম জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ তথা নড়াইল জেলায় আর্যজাতির প্রবেশের পূর্বে কয়েকটি সভ্য জাতির বাস ছিল। এরা হলো, দামিল, নিষাদ ও কিরাত।

দামিল জাতির লোকেরা এ-দেশে শহর ও নগর পত্তন করে। নিষাদ জাতির লোকের পরবর্তীকালে নাগ ও পরে কোল ভীল নামে পরিচিত পায়। কিরাত জাতির লোকেরা মংগোলীয় বা ভোটচিনা গোষ্ঠীর লোক। বাংলায় যখন পূর্ণ সভ্যসমাজ বিদ্যমান তখন আর্যদের আগমন হয়। রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের ভাষায় : 'আর্যজাতির সবচেয়ে বড়ো অবদান বাংলায় তাদের আনীত অশ্ব। একমাত্র এই সৌন্দর্যশালী জন্তুর উপর নির্ভর করে মুষ্টিমেয় মানুষ নিষাদ, দামিল ও দুঃসাহসী কিরাত জাতিকে পদানত করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশব্যাপী বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এরপর দামিলগণ বৈশ্য ও গৃহপতি হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ভাষা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে তারা আর্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করত।'

এই বৈশ্য সমাজ আজো হিন্দু জাতির মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দু হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশ তথা নড়াইল জেলায় বিদ্যমান। হিন্দু জাতি সমূহের সমীকরণের সময় বৈশ্য সমাজকে বঙ্গেশ্বর রাজা বল্লাল সেন বিশেষ-গুরুত্ব দান করেছেন। কুলিন বা অভিজাত বৈশ্যরা 'নবশাখা' নামে পরিচিত– 'বল্লালচরিত' গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে :

গোপো মালী তথা তৈল তন্ত্রী মোদক বারুজী
কুলাল : কর্মকারশ্চ প্রামাণিক : নব শায়কা : ॥২

অর্থাৎ : তিলি মালী তাম্বলী গোপ প্রামাণিক গোছালী,
কামার কুমার পুটুলী এই নব শাখাবলী।

তবে যে নিষাদ, কিরাত ও দামিল জনগোষ্ঠী বাঙালির প্রথম সভ্যতার উদগাতা তারা আজ অবহেলিত।

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্রের ভাষায় : 'মহাভারতের যুগে এই দেশ অনার্যভূমি বলিয়া বিবেচিত হতো। মহাভারতে আছে যে, ভীম পুণ্ড্রভূমি ও বংগদেশ জয় করেন।...ইহা ব্যতীত চণ্ডাল বা চন্দালগণ বরেন্দ্র হইতে আসিয়া উপবঙ্গে নানা স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছে। তাহারা এখন নমঃশূদ্র বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়।' প্রাচীণকালে নিষাদ, কিরাত, দামিল জাতিসমূহ ছাড়াও পুণ্ড্র ও চণ্ডাল জাতি উপবঙ্গে তথা নড়াইল জেলার কোথাও কোথাও বসতি গড়ে তোলে। চণ্ডাল বা নমোজাতি উপবঙ্গে প্রাচীনকাল থেকে আছে। মহাভারত ও অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থে এদের অচ্ছ্যুত ইতর জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শাস্ত্রকার মনুর সিদ্ধান্ত : 'শূদ্রের ধন সম্পদে অধিকার নাই। শূদ্রের অর্জিত সম্পদ ব্রাহ্মণে কাড়িয়া লইতে পারে। শূদ্র ব্রাহ্মণের সাথে এক আসনে বসতে চাইলে কটি দেশে লোহা পুড়াইয়া দাগ দিতে হইবে। বেদ পড়িতে চাইলে অথবা শুনিতে চাইলে জীব কেটে দেওয়া হইবে এবং কাণে সীসা গলিয়ে ঢেলে দিতে হইবে।' নৃতাত্ত্বিক বিচার ও বিশ্লেষণ করলে ব্রাহ্মণ নমো দুটো ভিন্ন নরগোষ্ঠী বা জাতি। আর্য-ব্রাহ্মণেরা এদেশে আগমনের পুর্বেও চণ্ডাল জাতির বসতি ছিল। নড়াইল জেলার ব্রাহ্মণ সমাজ পূর্বের মতো নমঃশূদ্র চণ্ডালদের জাতিগত বিদ্বেষ নিয়ে আচার-আচরণ করে থাকে।

অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব থেকে পৌণ্ড্র ও চণ্ডাল জাতি রাজশক্তির প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। বৌদ্ধ পাল বংশের শাসনাবসানের পরে কর্ণাটক দেশীয় সেন বংশীয় শাসন বাংলায় কায়েম হয়। দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। আমাদের ধারণা, ঐ সময় উপবঙ্গ তথা নড়াইল জেলায় বৌদ্ধ ধর্মানুগ লোকবসতি ছিল। সমাজে হিন্দু ধর্মের বিশেষ প্রভাব পড়ে নাই। হিন্দু ধর্মীয় রাজশক্তি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কিংবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইখতিয়ারউদ্দিন কর্তৃক গৌড় বাংলা বিজিত হয়। এই সময় বহু বৌদ্ধ দেশত্যাগী হয়। অনেকেই হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে। আবার কিছু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সাম্যবাদী রাজশক্তির ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা এভাবে ব্যক্ত হয়েছে :

হিন্দু কুলে কেহ হেন হইয়া ব্রাহ্মণ
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।

অর্থাৎ " হিন্দু কুলের ব্রাহ্মণ স্বইচ্ছায় যবন হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে 'যবন' বা যবনাঞ্চ' শব্দদ্বারা বিদেশী বা বিদেশীধর্ম বুঝানো হয়েছে। মুসলিম আগমনের আগে ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা 'যবন' বলতে গ্রীসের অধিবাসীদের বুঝাতো। পরবর্তীকালে বিদেশাগত মুসলমানদের উপরও যবন শব্দটি আরোপিত হয়েছে।

সেন শাসনামলে সমাজ অমানবিক ও পাশবিক আচার-আচরণে কলুষিত হয়েছিল। রাজা বল্লাল সেন লাম্পট্যের জন্য কুখ্যাত হয়ে আছেন। ঐ সময়কার কাব্য গ্রন্থ

দেহতত্ত্ববাদের উৎকৃষ্ট প্রমাণ। রাজারা সেটাকে আদর্শ বলে ধরে নিয়েছিলেন। এটা নিশ্চিত যে উপবঙ্গ তথা নড়াইলের প্রাচীন অধিবাসীরাও তা অনুসরণ করেছিল।

অর্থাৎ : 'দিনের বেলায় বউটি কাকের ডাকে ভয় পায় অথচ রাত্রিবেলায় অভিসার যাত্রায় যতো দূরেই যেতে হোক না কেন তাতে সে পিছপা নয়।' চর্যাগীতিগুলোর অন্ত র্নিহিত ভাব যা-ই থাক, এটা সমাজ চিত্রও বটে। উদ্ধৃত চর্যাগীতিকাংশ নাথধর্মের সাধনসঙ্গীত।

'শূন্যপুরাণে' ব্যক্ত হয়েছে হিন্দুদের অত্যাচারে জর্জরিত বৌদ্ধধর্মদেবতা 'যবনরূপ' ধারণ করে বাংলায় মুসলমান ধর্ম প্রচার করলো। এবং বাংলাদেশ অধিকার করলো। আর হিন্দুদের দেবতারাও একে একে মুসলিম ধর্মনায়ক হয়ে আবির্ভূত হলেন। এবার 'শূন্যপূরাণ' থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হলো :

ধর্ম হৈল্যা জবনরূপি, শিরে পরে কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপি আ উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম॥

নিরঞ্জন নিরাকার, হৈল ভেস্তে অবতার
মুখেতে বলেত দম্বাদার।
জতেক দেবতাগণ সবে হয্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার॥

ব্রহ্মা হৈল মহামত, বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
অদম্ফ হৈল সুলপানি।
গণেশ হৈল্যা গাজী, কার্তিক হৈল্যা কাজী
ফকির হৈল্যা জত মুনি॥[৩]

সুলতানী শাসনামলে ফার্সি ও বাংলা সাহিত্যের বিশেষ প্রসার ঘটেছিল। মুসলিম শাসনামলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা পায়। কিন্তু ইতোপূর্বের শাসকেরা বাংলা ভাষার প্রতি ছিল খড়গ হস্ত–তাদের রচিত শাস্ত্র বিধান ছিল এমন :

অষ্টাদশ পূরনানী রামস্যা চরিতানি চ
ভাষায়াং মানব শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

অর্থাৎ : 'অষ্টাদশ পূরাণ এবং রামের চরিত্র যারা মানবের ভাষায় শ্রবণ করবে তাদের স্থান হবে রৌরব নরকে।' স্বাধীন সুলতানি শাসনামলেই রামায়ণ, মহাভারত বাংলায় অনুবাদ হলো। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের হলো যাত্রা শুরু।

ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে অসংখ্য পাঠান জীবন-জীবিকার তাগিদে বাংলামুখী হন। দিল্লিতে পাঠান সুলতানি শাসনের অবসান হলে মুঘলবিরোধী পাঠান বীরেরা দলে দলে বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আমরা নানা ভাবে তথ্য সংগ্রহ করে জেনেছি, নড়াইল এলাকার অধিকাংশ মুসলমানের পূর্ব পুরুষেরা বহিরাগত। ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টারের

ভাষায় : 'এক সময় পাঠান মুসলমানদের আড্ডায় পরিণত হয়েছিল বাংলা।' তাই ধর্মান্তকরণের ব্যাপকতা অনুমানও করা যায় না। ঐতিহাসিক এ এফ এম আবদুল জলীলের মতে, এদেশে ধর্মান্তরিত মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগেরও কম। পারিবারিক ও গোষ্ঠীগতভাবে খোঁজখবর নিয়ে জানা যায় নড়াইল জেলায় ধর্মান্তরিত মুসলমানের সংখ্যা অতি নগণ্য।

উপমহাদেশ তথা বাংলায় ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ফারসি ছিল সরকারি ভাষা। তাই এই দেশে সরকারি চাকরির অনুকূলে প্রায় ৬ শত বছর ফারসির চর্চাও ব্যবহার অব্যাহত ছিল। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে অভিজাত লোকেরা ফারসি চর্চা করতো। এ ছাড়া ইসলামের সুফিবাদ বা একাত্নবাদ বা মরমিবাদ বহু চিন্তাশীল মানুষের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এর মধ্যে গুরু নানক (বাংলার বাইরে), শ্রী গৌরাঙ্গ, রাজা রামমোহন, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। সমাজের উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর লোকেরা ফারসি গজল- শের রপ্ত করতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তও কোলকাতার হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে বন্ধুদের আড্ডায় ফার্সি গজল গাইতেন।[৪] চৈতন্য চরিতামৃত' পাঠে আমরা জানতে পারি দুরাচার জগাই ও মাধাই পর্যন্ত রুমির 'মসনবী' কণ্ঠস্থ করে আবৃত্তি করছে। উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে :

জগাই মাধাই ওরা দুরাচার দুইজনে
মসনবী পড়ে আর থাকে নলবনে।[৫]

আলোচ্য নড়াইল জেলার হিন্দু ও মুসলমান অভিজাত ব্যক্তিদের সকলেই ভালো করে ফারসি ভাষা আয়ত্ব করেছিলেন। এবং পারসিক সংস্কৃতিও তাদের অজান্তে তারা গ্রহণ করেছিলেন।

মুঘল শাসনামলে সম্পদশালী ব্যক্তিদের মধ্যে আভিজাত্য ও কৌলিণ্যের প্রকাশ বেশি বেশি অনুভব হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ছিল তখন অল্প। খানাপিনা পোষাক-পরিচ্ছদ হিন্দু ও মুসলমান জমিদার ও জায়গিরদারেরা মুঘলদের অনুসরণ করতো। সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান পুরুষ ধুতি ও একপাট্টা ব্যবহার করতো। স্ত্রীলোকেরা শাড়ি ও সেমিজ ব্যবহার করতো। অভিজাত ধনী জমিদার, জায়গিরদার, তালুকদার, গাঁতিদারেরা পাগড়ি, শেরওয়ানি, স্যালোয়ার, কোর্তা, ওভার কোট, বেনিয়াম প্রভৃতি পোষাক হিসেবে ব্যবহার করতেন। অভিজাত মহিলারা কামিজ, শেমিজ, ওড়না ও নেকাব পরিধান করতেন। হিন্দু মহিলাদের মধ্যে পর্দার বাড়াবাড়ি ছিল না। হিন্দুরা মুঘল শাসনামলে কিছুটা সংরক্ষিত জীবন যাপন করতো। হিন্দু মসনবদার, জায়গিরদার ও অন্যান্য অভিজাতেরা সম্রাটের নির্দেশে জিম্মির চিহ্নস্বরূপ বেনিয়মের ফিতা বাঁধার নির্দেশ পেয়েছিলেন বাঁ দিক থেকে।[৬] আর মুসলমান অভিজাতেরা বেনিয়ামের ফিতা বাঁধতেন ডানদিকে। অন্ত্যজ হিন্দুরা শরীরে লেংটি ব্যবহার করতো। গায়ে কখনো কখনো পরতো ফতুয়া।

দালানকোঠা নির্মাণে সুলতানি ও মুঘল আমলে পারসিক রীতি গ্রহণ করা হতো। সাধারণ মানুষ চৌচালা ও দোচালা গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করতো। আর তা তৈরি করা হতো বাঁশের খুঁটি, হোগলা, নলখাগড়া ও শনদ্বারা। পোলো ও চোগান খেলা সমাজে প্রচলিত ছিল। তাস ও পাশা খেলায় আরামপ্রিয় লোকেরা অভ্যস্থ ছিল। এখন তাসের

সংখ্যা ৫২। কিন্তু ঐ সময় ৮৮ খানা তাসের খেলা হতো। যুদ্ধবিদ্যায় বা লড়াইয়ে পারদর্শী বলে হিন্দুরা মুসলমানদের 'ন্যাড়ে' বলে উপহাস করতো। 'ন্যাড়ে' কথাটি লড়াকু বা 'লড়িয়ে' শব্দ থেকে এসেছে। মুসলমানেরা হিন্দুদের 'বোতপূজারী' ও 'ব্যাভিচারী' বলে অবহেলা করতো। হিন্দুরা প্রাচীনকালে গ্রীক আক্রমণকারীদের 'যবন' বা বিদেশী বলতো। পরবর্তীকালে যবন শব্দটি তারা মুসলমানদেরও বুঝাতে বলতে থাকে। হিন্দুরা ইউরোপীয়দের ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত করে। মুসলমানেরা হিন্দুদের 'মালাউন' বা অভিশপ্ত বলে আখ্যায়িত করে।

১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধ অভিনয়ের পরে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে হিন্দুরা অখুশি হয় নাই। পক্ষান্তরে, মুসলমানেরা হারানো রাজ্য ও প্রতিপত্তির জন্য ইংরেজদের বিরোধিতা করতে থাকে। হিন্দুসমাজ শাসকের ভাষা ইংরেজিকে গ্রহণ করে। মুসলমান ইংরেজিকে বর্জন করে। এইভাবে হিন্দু সমাজের সামাজিক উৎকর্ষ সাধন হয়। মুসলমান ধীরে ধীরে গরিব ও প্রাচুর্যহীন হয়ে পড়ে। হান্টার সাহেব ১৮৭১ সালে তার 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে লিখেছেন, '১৭০ বছর পূর্বে একজন সদবংশজাত মুসলমানের পক্ষে গরিব হওয়া ছিল অসম্ভব। বর্তমানে তার পক্ষে ধনবান হওয়া একরূপ অসম্ভব।'

মুসলমান ইংরেজি শিক্ষা ত্যাগ করার জন্য আর্থিক ও সামাজিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। বাংলায় ইংরেজ শাসনামলে হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা সমান হলেও চাকুরির বেলায় মুসলমানেরা হিন্দুদের তুলায় ১/৭ অংশেরও কম ছিল। এই সমস্ত কারণে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ বাস্তবরূপ লাভ করে।

ইংরেজ শাসনামলে সামাজিক বিধান অনুসারে হিন্দু সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি আচারণীয় জাতি ও অন্যটি অনাচারণীয় জাতি। নড়াইল জেলায় আচারণীয় জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ (নয়টা শাখা অর্থাৎ তেলি, মালি, প্রামাণিক ইত্যাদি)। এ ছাড়া কুণ্ডু, ঘোষ মাহিস্য প্রভৃতিও আচারণীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে গণ্য হয়। নড়াইল জেলায় অনাচারণীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, নোমো (চণ্ডাল), মুচি, মালো, কড়াল, রাজবংশী, জেলে, মেথর, বাউতি, বাগদি, চামার, বুনো, কাওরা ইত্যাদি। আচারণীয় জাতি সমূহকে উচ্চবর্ণ ও অনাচারণীয় জাতিকে নিম্নবর্ণ বা তপশিলী জাতি বলা হয়। উচ্চবর্ণের লোকদের সাথে নিম্নবর্ণের লোকদের কোনো জলাচার নাই। সামাজিক ভাবেও তারা পৃথক।

ইসলাম ধর্মে অনাচারণীয় বা অচ্যুত বলে কোনো বিধান নেই। তবে কয়েকটি পেশার লোকেরা সাধারণত বিয়েশাদি তাদের নিজ নিজ পেশাধারী লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। অন্য মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে তারা বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হলেও কোনো ধর্মীয় সংঘাত হয় না। তবে এই ধরনের বিয়ে বিরল ঘটনা। এমন পেশাদার গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বাজনদার, দাই, বেদে, কুলু, নিকেরি, মালিতা, জোলা ইত্যাদি।

এক সময় নড়াইল জেলার বিভিন্ন নদী পথে হার্মাদ বা পর্তুগিজ ও মগাদস্যুরা অধিবাসীদের উপর অত্যাচার করতো। ঐ অত্যাচারের মধ্যে ধর্ষণও ছিল একটি। ধর্ষণজনিত এই কলঙ্ককে বলা হতো 'মোগো পরিবাদ' কিংবা 'ফিরিঙ্গ পরিবাদ'। আর পরিবাদিদের 'মোগো' নামে অভিহিত করা হতো। ঐ মোগেদের সাথে তাদের নিজ নিজ

সমাজ এমনকি আপন ভাইয়ের পরিবার পরিজনের সাথেও মেলামেশা থাকতো না। পরবর্তীকালে 'মোগোদে'র একটি পৃথক সমাজও গড়ে ওঠে। স্বসম্প্রদ্রায়ের মোগোদের মধ্যে ছেলে মেয়েদের বিয়ে অনুষ্ঠিত হতো। নড়াইল জেলায় আজো 'মোগো'দের অস্তিত্ব বিদ্যমান।

লোহাগড়া থানার নলদি-কালাচাঁদপুরের আদুরাম সাহা তৎপুত্রত্রয় দ্বারিকানাথ, পঞ্চানন, কুঞ্জবিহারীসবহ তাদের উত্তর বংশধর অমূল্য, বাদল প্রভৃতি মোগো সমাজের অন্তর্ভুক্ত। কালনায় কয়েকঘর 'মোগোসাহা' ছিল। কিছুদিন আগে তারা ভারতে গমন করেছে। নলদি বাজারের পূর্বপার্শ্বে 'মোগোচণ্ডাল' বা 'মোগোনোমো' ছিল। তারা ঐস্থান ত্যাগ করেছে। লোহাগড়া থানার চোরখালি গ্রামে 'মোগোবারুজীবী' ছিল। এই মোগো বারুজীবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজেন্দ্রনাথ দাস, নিশিকান্ত দাস প্রমুখ। লোহাগড়া থানার ধোপাদহে কয়েকঘর মোগোকায়স্থ ছিল। ১৯৪৭ সনের দেশ বিভাগের পরে এরা ভারতে গমন করেছে। উল্লেখ করা যায়, মোগো সমাজগুলির বসতি ছিল নদীর তীরে। ঐ নদীর তীরেই মগ-পর্তুগিজদের গমনাগমন সহজ ছিল। আর ঐ স্থানেই তারা কলংকিত হয়েছে লোহাগড়া থানা, নড়াইল থানা বিশেষত কালিয়া থানার বেন্দা ও তার পাশ্ববর্তী এলাকায় বেশ কিছু মোগো পরিবাদি ছিল। অনেকেই তাদের তথ্য বা সংবাদ গোপন করেছে।

হিন্দু মুসলমান দুটো ধর্মীয় সম্প্রদ্রায় ছাড়াও নড়াইল জেলায় প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের কিছু অনুসারী আছে। তারা কেউ মারা গেলে লাশ আগে উঁচুস্থানে বেধে রাখা হতো। এখন মাটির তলে খাড়া পুতে রাখে। সাধারণত চামার, মুচি ও বাগদিদের মধ্যে এই আচারণ দেখা যায়। আর্থিক সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে তারা শত শত বছর ধরে অবহেলিত। এই জনগোষ্ঠীগুলো 'সিলেট দেবনাগরী' জাতীয় একটি লৌকিক ভাষায় কথা বলে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পরে এরা তাদের পূর্ব ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। তাই এরা নিজেদের হিন্দু সমাজের লোক বলেও পরিচয় দেয়। নিঃসন্দেহে এই 'ঋষি, মুচি', বাগদি, বুনোরাই বাংলার আদি জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র অংশ।

নড়াইল জেলায় খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বির সংখ্যা খুব সামান্য। নড়াইল জেলায় বহিরাগত খৃষ্টানপাদ্রিরা ইংরেজ শাসনামলে লোকদের খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তারা সফলকাম হয় নি। তবে কালিয়া থানার পদুমা গ্রামে ১২৫ বছর আগে একটি খ্রিষ্টান মিশনারি স্থাপিত হয়। ঐ গ্রামের সমর বাড়ৈ (বিশ্বাস) সহ কয়েকজন নোমো হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। নানা কারণে ঐ মিশনারি ঐ স্থানে থাকতে পারে নি। আজো পদুমা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষিণপার্শ্বেব ভিটাটি 'মিশনভিটে' নামে পরিচিতি পায়। এ ছাড়া নড়াইল জেলার কুমারগঞ্জ—শংকরপুরে শতাব্দীর প্রথম দিকে একটি নীলকুঠি স্থাপিত হয়। ঐ কুঠির ম্যানেজার ছিলেন একজন ফরাসি নাগরিক ডি-ব্যারেজ। ডি-ব্যারেজের পুত্র জন ডি-ব্যারেজ এখানকার একজন বুনো-বাগদির মেয়েকে বিয়ে করেন। জন ডি-ব্যারেজের দুই ছেলে যথাক্রমে, ম্যালকম ও মাইকেল ডি-ব্যারেজ। ম্যালকম নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলেও মাইকেলের সন্তানাদি আজো নড়াইলের একমাত্র খৃষ্টান পরিবার হিসেবে গণ্য হয়। বর্তমান টমাস ডি-ব্যারোজ, নরম্যান ডি-ব্যারোজ প্রমুখ খ্রিষ্টান সদস্য কুমারগঞ্জ-শংকরপুরে বসবাস করছেন। এদের

সংখ্যা ৩০ জনের বেশি নয়।[৭]

অতীতে নড়াইল জেলার অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। চাষিরা ধানি জমিতে প্রচুর ফসল ফলাতো। দুধ, মিষ্টি ও মাছের জন্য লোহাগড়া থানা ও কালিয়া থানা বিখ্যাত ছিল। বিশেষ করে কালিয়া থানার কলাবাড়িয়া গ্রাম ও পদুমা গ্রামে প্রচুর মাছ ধরা পড়তো। কিন্তু সেই অবস্থার দুঃখজনক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। প্রায় ৮০ বছর আগেও সামুদ্রিক কড়ির সাহায্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হতো। সে সময় ৫টি কড়ির মূল্য ছিল ১ পয়সা। পরবর্তীকালে ৮টি কড়ির মূল্য ছিল ১ পয়সা।[৮] নড়াইল জেলায় শহরায়ন, শিল্পায়ণ ও কাঁচা মুদ্রার সহজ আগমনে জেলাবাসীর সনাতন মূল্যবোধের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এই পরিবর্তনের ভালো ও মন্দ দুটো দিকই বর্তমান।

তথ্যনির্দেশ

১. কালিয়া উপজেলা পরিক্রমা, মহসিন হোসাইন, পৃ. ৪
৪. যশোহর-খুলনার ইতিহাস (১ম খণ্ড) শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পৃ. ২৭৩
৩. যশোহর-খুলনার ইতিহাস, শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পৃ. ২৮৭
৪. বৈরীস্রোতে মধুসূদন, সাঈদা জামান ও মহসিন হোসাইন পৃ. ৮০
৫. রুমীর মসনবী (অনুবাদ), মনিরুদ্দিন ইউসুফ, ভূমিকাংশ, ১৯৬৭
৬. সিয়ারে মুতাখখারিন (অনুবাদ), আবদুল কাদের, ১৯৬২
৭. নরম্যান ডি-ব্যারেড (৫৪), শংকরপুর, থানা : নড়াইল ১৯৮০
৮. ড. ওসমান গনি (৯০), লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া

অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ও আন্দোলন

১৭৫৭ সালে মুঘল নবাব সরকার শিথিল হয়ে পড়ে। ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের নিকট থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা বা সুবা বাংলার ইজারা গ্রহণ করে। এইভাবে উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্বের সূচনা হয়। ১৮৩৫ সালে ইংরেজ কোম্পানি সরকার মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে তাদের ইজারাচুক্তি নবায়ণ করে। ১৭৯৩ সালে কোম্পানি সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে এদেশবাসীকে নিপীড়ন শুরু করে। মুসলমান সমাজ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বাদি ভূমিকা পালন করে। পক্ষান্তরে, নতুন নতুন জমিদারি প্রাপ্ত হিন্দু সম্প্রদায় আর্থিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে এগিয়ে যায়। দুঃখ ভারাক্রান্ত মুসলমান সমাজ তাদের হারানো রাজ্য, গৌরব ও সম্মান উদ্ধারের জন্য ফকির বিদ্রোহে যোগ দেয়। ফকির বিদ্রোহে মুসলমান সমাজ ব্যর্থ হয়। তাই বলে তারা তাদেব হারানো গৌরব ও প্রতিপত্তি লাভে নিরাশ হয় নি। এরপর বাংলার মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায় স্বাধীনতা ও মুক্তি আন্দোলনের জন্য দুইজন নেতার পেছনে সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করে। এরা হলেন, ওহাবি আন্দোলনের নেতা তিতুমির ও ফারায়েজি আন্দোলনের নেতা হাজি শরিয়তউল্লাহ। এই দুটো আন্দোলনের প্রভাব বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। বর্তমান বৃহত্তর যশোরের বিভিন্ন এলাকায় ফারায়েজি ও ওহাবি আন্দোলনের প্রভাব পড়ে। ধারণা করা যায়, নড়াইল জেলার কয়েকটি নীলকুঠিতে বিদ্রোহের জন্য তিতু মীরের অনুসারীরা যোগ দিয়েছিলেন। এই বিদ্রোহগুলো হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর ৪০ দশকের দিকে। ১৮৩১ সালে তিতু মীরের মুজাহিদ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে ঐ বাহিনীর একজন সদস্য শাহ বাহলোল মল্লিক নিজ গ্রাম খুলনার আদাঘাট হতে পালিয়ে বর্তমান কালিয়া থানার কলাবাড়িয়া গ্রামের মোল্যাপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। শাহ বাহলোল মল্লিকের উত্তর বংশধরেরা 'শেখ' বংশ পদবি নিয়ে কলাবাড়িয়া গ্রামে বসবাস করছেন। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে বৃহত্তর যশোর জেলাবাসী ওহাবী আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ বিতাড়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইংরেজ সরকারের তথাকথিত দুর্নীতিদমন বিভাগ তাদের কথিত বিদ্রোহী ওহাবীদের কিছু ঘোষণাপত্র যশোর জেলা হতে উদ্ধার করে। কোম্পানি শাসনের প্রথম দিকে থেকে যশোর তথা নড়াইল জেলায় অনেক নীলকুঠি স্থাপিত হয়। যশোরে প্রস্তুত নীলের বিদেশীবাজার থাকায় এই অঞ্চলে ইউরোপের বিভিন্ন কোম্পানি ও দেশীয় কিছু জমিদার-গাঁতিদার এখানে নীলচাষে উদ্যোগী হন। এর প্রেক্ষিতে যশোর তথা নড়াইল জেলায় প্রচুর নীলকুঠি স্থাপিত হয়। প্রজাসাধারণ অত্যাচার নিপীড়ণের জবাবে বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়। তাই নড়াইল জেলার নীলচাষ ও নীলবিদ্রোহ জেলাবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। এবার নীলচাষ ও নীলবিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোকপাত করা হলো :

নড়াইল জেলার নীলচাষ ও বিদ্রোহ

বেনিয়া ইংরেজ শাসনামলের নীলচাষ এবং প্রজা নিপীড়ণের কাহিনী আজো বাংলাদেশের মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত আছে। সাধারণ মানুষ সে কালের নীলগাছ ও নীল উৎপাদন সম্বন্ধে ধারণা রাখে না। কিন্তু নীলকরদের অত্যাচার, লুণ্ঠন, খুন, রাহাজানি ইতিহাসের পাতায় একটি কলংকের অধ্যায় হয়ে আছে। মুঘল নবাব সরকারের পতনের পরে ১৭৭৭ সালে জনৈক ফরাসি বণিক লুইবোনড নীল উৎপাদন প্রণালী বাংলায় আমদানী করেন। ঐ সালেই লুইবোনড বাংলার তালডাঙ্গা ও গোমুলে দুটো নীলকুঠি স্থাপন করেন। লুইবোনড মুসলমানদের কবরস্থান খরিদ করে মৃতের হাড়ের সাহায্যে চূণ প্রস্তুত করতেন। ঐ চূণ বিক্রি করে লুই অর্থের মালিক হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা ভালো, নীল উৎপাদনে চূণের বিশেষ ব্যবহার ছিল। ১৮১০ সালে যশোর তথা বর্তমান নড়াইল জেলায় নীলচাষ শুরু হয়। বৃহত্তর যশোর জেলায় এই নীল চাষ কমবেশি ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১]

সে যুগে নীল চাষ অতি লাভজনক বলে ইংরেজ কোম্পানি সরকারের সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীরা নিজ নিজ পেশায় ইস্তাফা দিয়ে নীলচাষে প্রবৃত্ত হয়। এ ছাড়া কিছু দেশীয় জমিদার, তালুকদার ও গাঁতিদার ইংরেজদের মতো নীলকুঠি স্থাপন করেন কিংবা জমি ইজারা দিয়ে নীল চাষের সমর্থন জুগিয়ে ছিলেন। নড়াইলের যে সব জমিদার, তালুকদার ও গাঁতিদার নীল চাষে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন তারা হলেন, নড়াইলের জমিদার পরিবার বিশেষত রামরতন রায়, হাটবাড়িয়ার জমিদার, রায়গ্রাম কলাগাছির ঘোষ জমিদার পরিবার, লোহাগড়ার রায় মজুমদার সরকার জমিদার পরিবার, কোটাকোলের সরকার তালুকদার পরিবার, কলাবাড়িয়ার মোল্যা জমিদার পরিবার প্রমুখ। কলাবাড়িয়ার জমিদার জকি মোল্যা প্রথম দিকে নীলকর এম এন কামিল ডানলপকে নীলকুঠি নির্মাণে জমি ইজারা ও অন্যান্য সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে কুঠিয়ালদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে বিদ্রোহীদলের সাথে যোগ দিয়ে নীলকর বিতাড়নের প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে জানা যায়। নড়াইলের বিশিষ্ট জমিদার রামরতন রায় ইংরেজ কুঠিয়ালদের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেই নীলকুঠি স্থাপন করেছিলেন।

ইংরেজ কোম্পানি সরকার ইংরেজ নীলকর ও দেশীয় নীলকুঠিয়ালদের নানা ভাবে সাহায্য করতো। ইতিপূর্বে দেশীয় নবাব সরকারের পতন হওয়ায় অসহায় জনসাধারণের দুঃখকষ্ট জানানোর আর কোনো জায়গা রইলো না। নীলকর ও তাদের দেশীয় পদলেহী কর্মচারীদের শোষণ অত্যাচারে বর্তমান বৃহত্তর যশোর জেলা তথা নড়াইল জেলা শোকাবহ শ্মশানে রূপ লাভ করে। কৃষকের ইচ্ছার বাইরে নীলকরেরা কৃষকদের ধানপাট চাষ করা জমিতে নীলের দাগ দিয়ে আসতো। প্রাপ্ত তথ্য মতে, এক বিঘা জমিতে নীল উৎপাদন হতো ৮ থেকে ১০ বাণ্ডিল। ১০ বাণ্ডিল নীলের মূল্য দেওয়া হতো ১ টাকা। পরে টাকায় ১০ বাণ্ডিলের স্থলে ৪ বাণ্ডিল করা হয়েছিলো। এই বিচারে হিসাব করে দেখা গিয়েছে, নীলচাষিরা নীলচাষ করে মারাত্মক লোকসানি হয়েছে। অসংখ্য চাষি পরিবার নীল চাষ করে অনাহারে অর্ধাহারে জীবন কাটাতো। সেই সময়ে কতো মানুষ যে নীরব মন্বন্ত রে জীবন হারিয়েছে তা জানবার কোনো উপায় নেই। অনেক নিরপেক্ষ ইংরেজ ঐতিহাসিক ও সরকারি কর্মকর্তা নীল চাষকে কৃষকের মরণফাঁদ হিসেবে বর্ণনা

করেছেন। আর নীলকে বলেছেন কৃষকের 'নীলরক্ত'।

নড়াইল জেলার কতো নির্দোষ ও শ্রমজীবী মানুষ যে কুঠির সাহেবদের কাছে লাঞ্ছিত ও রক্তাক্ত হয়েছে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। নড়াইল জেলার কতো কৃষক যে নীলকরদের অত্যাচরে প্রাণ হারিয়েছে তারো খতিয়ান পাওয়া যায় না। কৃষকেরা যখন একেবারে সর্বহারা পর্যায়ে যায় তখন তারা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। জীবনকে বাজি রেখে অত্যাচারের জবাব দিতে থাকে তারা। অষ্টাদশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে নড়াইল জেলায় ছোটো খাটো বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু ১৮৫৮ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পরে যে মহা নীলবিদ্রোহ দেখা দেয় তা ১৮৬১ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। ধারণা করা যায়, নড়াইল জেলায় প্রায় ১০০টি নীল চাষ কেন্দ্র ও নীলকুঠি-কারখানা ছিল উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রায় সবকটি নীলকুঠি ও কেন্দ্রে প্রজাবিদ্রোহ দেখা দেয়। যে কুঠিগুলোয় নীল বিদ্রোহের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে সেইগুলো ছাড়াও অন্যান্য নীলকুঠির সংগ্রহ করা তথ্য এখানে সন্নিবেশ করা হলো। প্রথমে আলোচিত হবে নীলকুঠির অবস্থিতি। এবং পরে আলোচনা করা হবে নীলবিদ্রোহের ঘটনাবলী।

লোহাগড়া থানা

উলো নীলকুঠি *: লোহাগড়া থানার লক্ষ্মীপাশা ইউনিয়নের উলো গ্রামে উলো নীলকুঠি অবস্থিত ছিল। লোহাগড়া থানার মধ্যে উলোকুঠির অবস্থিত ছিল বিস্তৃত। এখানে ছিল কানসারনের প্রধান কার্যালয়। এই কানসারনের অধীনে ছিল কামাল-প্রতাপ নীলকুঠি, সারল নীলকুঠি, চরকোটাকোল নীলকুঠি ও মাউলি (কালিয়া) নীল উৎপাদন কেন্দ্র।* সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই উলোয় নীলকুঠি স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা নীলকরের নাম জানা যায় নি। তবে পরবর্তীকালে কুঠিয়াল ছিলেন মি. ব্যান্ড ও ডানলপ।[২] উলো কুঠির কুঠিয়ালদের অত্যাচারে উলোর পার্শ্ববর্তী অন্তত ১২/১৩টি গ্রাম সন্ত্রস্ত ছিল। উলো কুঠির কুঠিয়াল ব্যাণ্ড সাহেবই 'বানকানার খাল' খনন করেছিলেন, যা আগে আলোচিত হয়েছে। এই উলো কুঠিতে প্রচণ্ড প্রজাবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। লক্ষ্মীপাশার অধিবাসী ডা: ওসমান গণি পিতামহ কালুমিয়া উলো কুঠির আমিন ছিলেন। বর্তমান দিঘলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পার্শ্ব দিয়ে পশ্চিম দিকে যাওয়ার পথে উলো নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কুঠির কাছে একটি সুউচ্চ টাওয়ারের অস্তিত্ব আজো বর্তমান। উলো কুঠির দেওয়ান ছিলেন লোহাগড়ার রাধানাথ মজুমদার।

সারল নীলকুঠি : উলো নীলকুঠির উত্তরদিকে তালবাড়িয়া গ্রামের সন্নিকটে সারল গ্রামে একটি নীলকুঠির সন্ধান পাওয়া যায়। জায়গাটি জঙ্গলপূর্ণ। মূল ভবন আর নেই। ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে নীল জ্বাল দেওয়ার হাউসগুলো। প্রজাবিদ্রোহের সময় এই কুঠির ক্ষতি সাধন হয়। এই কুঠির কুঠিয়ালের নাম জানা যায় নি।

নোয়াগ্রাম নীলকুঠি : বর্ধিষ্ণু গ্রাম নোয়াগ্রামেও একটি নীলকুঠির সন্ধান পাওয়া যায়। এই কুঠিতে নীল বিদ্রোহ দেখা দেয়।[৩]

আমডাঙ্গা নীলকুঠি : মধুমতি নদীর পশ্চিমতীরে সুপ্রাচীন আমডাঙ্গা গ্রামে একটি নীলকুঠি স্থাপিত হয়। আমডাঙ্গা নীলকুঠি নদীভাঙ্গনে ধ্বংস হয়েছে। তবে এই কুঠির

কুঠিয়াল হের সাহেবের অনেক অত্যাচারের কাহিনী শোনা যায়।

চরকোটাকোল নীলকুঠি : কোটাকোল ইউনিয়নের চরকোটাকোল গ্রামে নদীর তীরে আজো একটি নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কোটাকোলের সরকার তালুকদারেরা এই কুঠি স্থাপন করেছিলেন। কিংবা জমি ইজারা দিয়ে তালুকদারেরা কুঠিয়ালদের সাহায্য করেছিল। কুঠির জায়গাটি এখন বাঁশঝাড় ঘিরে রেখেছে। নীল জ্বালানোর হাউজ আর নেই। তবে কুঠিয়ালদের রোপণ করা একটি প্রাচীন কাঁঠাল গাছ কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।[৪]

লক্ষ্মীপাশা নীলকুঠি : নবগঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে লক্ষ্মীপাশায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরেজ কুঠিয়াল উইলিয়াম জোনস একটি নীলকুঠি স্থাপন করেছিলেন। বর্তমান লোহাগড়া লক্ষ্মীপাশা নদীর ঘাট বরাবর ছিল নীলকুঠি। এখন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। খেয়াঘাটের বাঁ পার্শ্বে ২০ বছর আগেও কুঠিয়াল জোন্‌স-এর পাকা কবর দেখা যেতো। জানা যায়, জোনস সাহেব ১৮৩৫ সালে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। জোনসের সময়কালে না হলেও পরবর্তীকালে লক্ষ্মীপাশা নীল কুঠিতে প্রজাবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। ডা. ওসমান গণির বিশাল বাড়িটি পূর্বেকার নীল কুঠির জায়গার ওপর স্থাপিত।

মল্লিকপুর নীলকুঠি : লক্ষ্মীপাশা ইউনিয়নের মল্লিকপুর গ্রামের কাজিপাড়ায় নবগঙ্গা নদীর পশ্চিমতীরে একটি নীল কুঠি স্থাপিত হয়েছিল। মল্লিকপুর নীলকুঠির ম্যানেজার ছিলেন মল্লিকপুরের গোলক ভট্টাচার্য। মল্লিকপুর কুঠিতে হাটবাড়িয়ার জমিদারদের অংশ ছিল। জমিদার রামপ্রসাদ রায় লোহাগড়া গ্রামের পদ্মলোচন মজুমদারকে প্রথম কুঠির আমিন নিযুক্ত করে নীলকুঠি স্থাপন করেন। পরে কুঠিটি তিনি বিক্রয় করতে বাধ্য হন।[৫]

কুমারডাঙ্গা নীলকুঠি : ইতনা ইউনিয়নের কুমারডাঙ্গা গ্রামে প্রাচীন মধুমতি নদীর পূর্ব তীরে একটি নীলকুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়। যতোদূব জানা যায়, কুমারডাঙ্গা নীলকুঠির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এম সি মুনিয়র। ধ্বংসস্তূপে পরিণত নীলকুঠি আজো দেখা যায়। কয়েকটি নীল জাগের হাউস ও চুল্লি কুমারডাঙ্গা কুঠিতে বিদ্যমান।

রাধানগর নীলকুঠি : ইতনা ইউনিয়নের রাধানগর হাটের পূর্বদক্ষিণ কোণে নীলকর এম সি মুনিয়র আরেকটি নীলকুঠি প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ নীলকুঠির বিশেষ কোনো চিহ্ন নেই। তবে ৮০ হাত দীর্ঘ একটি পরিদর্শন টাওয়ার আজো অক্ষত অবস্থায় দেখা যায়। রাধানগরহাট নীল রপ্তানির বন্দর হিসেবে ব্যবহার হতো।[৬]

ইতনা নীলকুঠি : কুমারডাঙ্গা ও রাধানগর নীলকুঠিদ্বয়ের সঙ্গে কুখ্যাত নীলকর এম সি মুনিয়র ইতনায়ও নীলকুঠি প্রতিষ্ঠা করেন। ইতনা গ্রামের পূর্বপার্শ্বে নীলকুঠির নীলভিটে আজো দেখতে পাওয়া যায়। এই কুঠিতে নীল বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। কুঠির শেষ কুঠিয়াল ছিলেন এডওয়ার্ড ম্যাককারসান।[৭]

আখড়াবাড়ি নীলকুঠি : দিঘলিয়া ইউনিয়নের আখড়াবাড়ি গ্রামে নবগঙ্গা-বানকানার তীরে একটি নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। উঁচু ভিটার উপরে নীলকুঠির ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভাঙা ইট দেখতে পাওয়া যায়। লুটিয়া গ্রামের জনৈক ঘোষ এই কুঠির জমাদার ছিলেন।

লাহুড়িয়া-ত্রৈলক্ষপাড়া নীলকুঠি : লাহুড়িয়া ইউনিয়নের কালিগঞ্জ বাজারের উত্তরপার্শ্বে প্রাচীন মধুমতি নদীর তীরে ত্রৈলক্ষপাড়ায় নীলকুঠি ছিল। কুঠির বিশেষ চিহ্ন

নেই। তবে এখানে পড়ে আছে ইটের স্তূপ ও নীলকর সাহেব পরিবারের কয়েকটি কবর। এই কুঠির মিঃ ক্যালি স্থানীয় বাজার প্রতিষ্ঠা করে তার নামেই বাজারের নামকরণ করেন।[৮]

এড়েন্দা নীলকুঠি : নবগঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে প্রাচীন জনপদ এড়েন্দায় একটি নীলকুঠি ছিল। নদী ভাঙ্গনে কুঠির কোনো চিহ্ন নেই। তবে নীলচাষের সহায়ক বুনো সম্প্রদায়ের লোকেরা এখনো আছে। এড়েন্দা কুঠিতে নীলবিদ্রোহ হয়েছিল।

কালিয়া থানা

কলাবাড়িয়া নীলকুঠি : কলাবাড়িয়া নীলকুঠি কলাবাড়িয়া গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। এক সময় নলিয়া নদী থেকে একটি ছোট নদী দক্ষিণ পূর্বদিক দিয়ে কলাবাড়িয়া নীলকুঠির উত্তরপূর্ব পার্শ্ব দিয়ে আরো দক্ষিণে প্রবাহিত হতো। সেই নদীটি প্রায় ৯০ বছর আগে ভরাট হয়ে গিয়েছে। কলাবাড়িয়া নীলকুঠি এখন 'গাজির কুঠি' নামে পরিচিত।[৯] যতদূর জানা যায়, ১৮৪০ সালের দিকে কলাবাড়িয়া নীলকুঠিতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই কুঠির মালিক ছিলেন নীলকর এল এম কামিন ডানলপ। কলাবাড়িয়া নীলকুঠির ২টি নীলজ্বালের হাউস এখনো দেখতে পাওয়া যায়। কুঠির দেওয়ালের গায়ে ছোটো বড়ো নানা জাতীয় বৃক্ষলতা দেখতে পাওয়া যায়। কলাবাড়িয়া কুঠির দেওয়ালের গাথুনি ২২´´ –২৩´´। এই কুঠিতে ৩টি ধাচের ইষ্টক দেখতে পাওয়া যায়। সেইগুলোর পরিমাপ হলো যথাক্রমে :

	দৈর্ঘ	প্রস্থ	উচ্চতা
১নং ইট	১০´´	৫ $\frac{১}{২}$´´	৩´´
২নং ইট	১০´´	৫´´	১ $\frac{১}{২}$´´
৩নং ইট	১২´´	৫ $\frac{১}{২}$´´	২ $\frac{১}{২}$´´

বাঐসোনা নীলকুঠি : নড়াগাতি কাটা নদীর পশ্চিম তীরে বর্তমান বাঐসোনা হাটের পশ্চিম পার্শ্বে এবং বাঐসোনা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে বনবেষ্টিত অবস্থানে কালিয়া থানার বৃহৎ নীলকুঠির অবস্থান। এই কুঠিতে আজো বড়ো বড়ো ৮টি নীলজ্বালের হাউজ বিদ্যমান। এই কুঠিতে কোনো বিদ্রোহ না হওয়ায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত এখানে নীল উৎপাদন হতো। হাউসগুলোর উত্তরপার্শ্বে সরকারের ভিটে নামে একটি স্থান দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবত এখানে দেশীয় কোনো গোমস্তা বসবাস করতো। ১৯৮১ সালে নীলকুঠির পার্শ্বে পুকুর খননের সময় হাজার হাজার ইট পাওয়া গিয়েছে। একটি অশথ বৃক্ষের বেষ্টিত মূলে জড়িয়ে আছে নীল জ্বালানোর বৃহৎ কড়াই। এই কড়াইয়ে নীল জ্বালানো হতো। বাঐসোনা নীলকুঠির কুঠিয়ালের নাম জানা যায় নি। এখানে পাওয়া ইটগুলোর পরিমাপ যথাক্রমে :

	দৈর্ঘ	প্রস্থ	উচ্চতা
১নং ইট	১০´´	৫ $\frac{১}{২}$´´	৩´´
২নং ইট	১২´´	৫ $\frac{১}{৩}$´´	২ $\frac{১}{২}$´
৩নং ইট	১০´´	৫´´	১ $\frac{১}{২}$´´

দেবদুন নীলকুঠি : নড়াগাতি হতে জয়নগর উচ্চ বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে দেবদুন নীলকুঠির অবস্থান। প্রাচীনকালে দেবদুন নীলকুঠির অবস্থান ছিল মধুমতি ও নড়াগাতি নদীর সঙ্গমস্থলে। জানা যায়, দেবদুন নীলকুঠির বিস্তৃর্ণ এলাকায় নীলচাষ করা হতো। নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষের পার্শ্বে স্থানীয় লোকেরা ঘরবাড়ি নির্মাণ করেছে।[১০]

নড়াগাতি নীলকুঠি : নড়াগাতি কাটা নদীর পশ্চিম তীরে অমৃতনগর, জমিদারি কাছারির দক্ষিণ পার্শ্বে নড়াগাতি নীলকুঠির অবস্থান। এই কুঠিতে নীলজাগ দেওয়ার ৪টি হাউস প্রায় অক্ষত অবস্থায় দেখা যায়। সম্ভবত নড়াগাতির কুঠির একটি দালান এখন কাচারি বাড়ি। ধারণা করা হয়, রাণী রাসমণি এষ্টেটের পক্ষ থেকে এই নীলকুঠি স্থাপন করা হয়েছিল। এই কুঠির ম্যানেজার ছিলেন মিঃ লুইচ। কুঠির দেওয়ালের গাঁথুনি ২৩˝। এখানে দুই ধাচের ইট ও সমান টালির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সে গুলোর পরিমাপ দেওয়া হলো:

	দৈর্ঘ	প্রস্থ	উচ্চতা
১নং ইট	১০˝	৫½˝	৩˝
২নং ইট	১২˝	৫½˝	২½´
টালি	১৮˝	১২´	১½˝

নড়াগাতি নীলকুঠিতে ব্যাপক নীল বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল।[১১]

টোনা নীলকুঠি : বড়দিয়া বাজার হতে টোনা যাওয়ার পথে বড়দিয়া মুন্সি মানিক মিয়া মহাবিদ্যালয়ের পূর্ব উত্তর কোণে রাস্তার দুপাশে টোনা নীলকুঠি বিদ্যমান। মহাবিদ্যালয়ের পশ্চিমপার্শ্বে স্থানীয় এক ব্যক্তি মাটি খননের ফলে কয়েক হাজার ইট পেয়েছে। কুঠির পশ্চিম উত্তর কোনে 'বুনোভিটা' নামের একটি ভিটায় কুঠির সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই কুঠির নীলকরের নাম জানা যায় নি। এই কুঠিতে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল।

মাধবপাশা নীলকুঠি : নবগঙ্গা নদীর পূর্বতীরে থানা পরিষদ রাস্তার পশ্চিমপারে জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় মাধবপাশা নীলকুঠি আজো দেখতে পাওয়া যায়। এখানে একটি উঁচু টাওয়ার দাঁড়িয়ে কালের সাক্ষ্য বহন করছে।

নোয়াগ্রাম নীলকুঠি : বর্তমান নবগঙ্গা ও প্রাচীন চিত্রা নদীর সঙ্গমস্থলে নোয়াগ্রাম ইউনাইটেড একাডেমীর পেছনে নীলকুঠির অবস্থান ছিল। কুঠিটি নোয়াগ্রাম নীলকুঠি নামে পরিচিত। এই কুঠির শুধুমাত্র একটি পাকা ফ্লোর আজো দেখতে পাওয়া যায়।

চাঁচুড়ি নীলকুঠি : প্রাচীন চিত্রা নদীর দক্ষিণ পারে চাঁচুড়ি বাজারের দক্ষিণ সীমানা ঘেষে নড়াইল-কালিয়া রাস্তার উত্তরপার্শ্বে চাঁচুড়ি নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। চাঁচুড়ি নীল কুঠির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন স্থানীয় গাঁতিদার চারুদত্ত। নদীর তীরে বাঁশের হাটের কাছে নীলকর সাহেবদের কবরের চিহ্ন দেখা যায়।

সুমেরুখোলা নীলকুঠি : চিত্রা নদীর পূর্বতীরে রঘুনাথপুরের পার্শ্বে সুমেরুখোলা নীলকুঠি স্থাপিত হয়েছিল। কুঠির স্থানটিতে ভাঙাচোরা ইট বর্তমান। নদীর ঘাটে একটি স্থানকে লোকে নীলের ঘাট বলে আজো চিহ্নিত করে।[১২]

কাঠাদুরা নীলকুঠি : নবগঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে কাঠাদুরা গ্রামে নীলকুঠি দেখতে পাওয়া যায়। এই নীলকুঠির মালিক ছিলেন নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়। শোনা

যায়, মনিরুদ্দিন খাঁ নামীয় জনৈক পাঠান এই কুঠির নায়েব ছিলেন। মনিরুদ্দিনের বংশধরেরা আজো ফকির বংশীয় নামে পরিচিত। নীলকুঠির স্থানটিকে স্থানীয় লোকেরা 'নড়ালের ভিটে' নামে পরিচিত করে।[১৩]

পাটনা নীলকুঠি : নলিয়া নদীর পূর্ব তীরে পাটনা বড়ো ঘাটের অদূরে পাটনা নীলকুঠি স্থাপিত হয়েছিল। একটি উঁচু স্থানকে লোকেরা নীলকুঠির স্থান হিসেবে সনাক্ত করে থাকে। স্থানীয় লোকেরা তাদের জমিকে 'নীলের জমি' 'নীলের ভূঁই' ও 'নীলের চল্লা' বলে আখ্যায়িত করে।

মাউলি নীলকুঠি : মাউলি গ্রামের মধ্য দিয়ে ম্যাগাডাম রাস্তা বেয়ে উত্তরমুখী হলে ডানপার্শ্বে একটি প্রাচীন বট ও প্রাচীন কালের একটি দিঘি দেখতে পাওয়া যায়। দিঘিটিকে লোকেরা নীলেরদিঘি বলে। এখানে একটি নীলকুঠি ছিল। তবে সেই কুঠির কোনো চিহ্ন আজ আর পাওয়া যায় না।[১৪]

লক্ষ্মীপুর নীলকুঠি : কালিয়া থেকে রঘুনাথপুর ও নড়াইল যাওয়ার রাস্তায় ৩ মাথা মোড়ের বাঁ পার্শ্বে ছিল লক্ষ্মীপুর নীলকুঠি। এই কুঠিতে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। লক্ষ্মীপুর নীলকুঠির স্থানটি এখনো ঘন বসতবাড়ির স্থলে সনাক্ত করা যায়।

নড়াইল থানা

নড়াইল নীলকুঠি : এখন পরিত্যক্ত মহকুমা প্রশাসকের বাসভবনটি এক সময় নীলকুঠি ছিল। স্থানটি চিত্রানদীর পশ্চিম তীরে মহিশাখোলা মৌজার মধ্যে অবস্থিত। বর্তমান জেলা প্রশাসকের নতুন ভবন যে স্থানে তৈরি হয়েছে তা এক সময় নীলকর সাহেবদের ঘোড়ার আস্তাবল ছিল।[১৫]

হাটবাড়িয়া নীলকুঠি : হাটবাড়িয়ার প্রাচীন জমিদার বাড়ির সোজা বিপরীতদিকে চিত্রানদীর পূর্বপারে হাটবাড়িয়া নীলকুঠি ছিল। এখন সেই স্থানে কিছু প্রাচীন ভাঙা ইটের স্তূপ দেখতে দেখতে পাওয়া যায়। হাটবাড়িয়া নীলকুঠির প্রতিষ্ঠাতা হাটবাড়িয়ার জমিদার বলে জানা যায়।[১৬]

মহারাগ নীলকুঠি : চিত্রানদীর পূর্বতীরে মহারাগ গ্রামে একটি নীলকুঠি ছিল। কুঠির স্থলে ভাঙা ইটের স্তূপ ও একটি উঁচু টাওয়ার আজো দেখতে পাওয়া যায়।

আউড়িয়া নীলকুঠি : চিত্রানদীর পূর্বতীরে আউড়িয়া নীলকুঠির অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এই কুঠির প্রতিষ্ঠাতার নাম জানা যায় না। অনেকে অনুমান করেন আউড়িয়া কুঠির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাটবাড়িয়ার জমিদার।

নলদি নীলকুঠি : নড়াইল জেলার প্রাচীন স্থান নলদিতে একটি নীল কুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। স্থানীয় তালুকদার এই নলদি কুঠির নীল ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়।

ফেদি নীলকুঠি : নবগঙ্গা নদীর দক্ষিণতীরে ফেদি গ্রামে একটি নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। কুঠিয়ালের প্রাচীন অশ্বশালার চিহ্ন আজো আছে। জনৈক ফেডি সাহেব এই কুঠির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কুঠির ম্যানেজার ছিলেন রেমন্ড। স্থানীয় ফাজেল শেখ নামের একজন গাঁতিদারের নেতৃত্বে ফেদি কুঠিতে নীলবিদ্রোহ দেখা দেয়। রায়গ্রামের ঘোষ জমিদারেরা ফেদি নীল কুঠির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

তুজারডাঙ্গা নীলকুঠি : চিত্রানদীর তীরে তুজারডাঙ্গা একটি নীলকুঠি ছিল বলে স্থানীয় লোকেরা তথ্য দিয়েছেন। ওখানে নীলচাষও নীল উৎপাদন হতো।[১৭] চিত্রানদীর দক্ষিণ পারে তুজারডাঙ্গা নীলকুঠির উপরে শাহবাদ মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে।

সিংগে-হাড়গড়া নীলকুঠি : নবগঙ্গা নদীর দক্ষিণতীরে সিংগে-হাড়গড়া গ্রামে একটি নীলকুঠি ছিল। তথ্য পাওয়া যায়, ঐ কুঠির মালিক ছিলেন নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়। এক সময় নীলবিদ্রোহ এই কুঠিতেও ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে শোনা যায়, স্থানীয় বীর কৃষকদের সাথে তাদের পরিবারের সাহসী নারীরাও কুঠিয়ালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়। নারী বাহিনী হাড়ি-ঘড়ার চাড়া ও কাঁধা দিয়ে কুঠিয়াল ও তার সমর্থকদের আক্রমণ করে। এই জন্য সিংগের এই নীলকুঠিকে হাড়িঘড়া বা 'হাড়গড়া' নীলকুঠি বলে।

সরসপুর নীলকুঠি : সরসপুর গ্রামে চিত্রানদীর দক্ষিণ তীরে হাটের সঙ্গে যুক্ত একটি নীলকুঠি ছিল। এখন এই নীলকুঠির স্থলে বসতি ও স্কুল স্থাপিত হয়েছে।

আফ্রার নীলকুঠি : বুড়ি ভৈরব ও কাজলা নদীর সঙ্গম স্থলের উত্তর তীরে আফ্রা গ্রামে একটি বড়ো নীলকুঠি ছিল। কয়েক বছর আগেও নীলকুঠির বিরাট বিরাট ইমারত দেখা যেতো। আফ্রা গ্রামের অদুদ মোল্যার পিতা মোক্তার মোল্যা ঐ কুঠিবাড়ি ক্রয় করেছিলেন। কোনো এক সময় ঐ কুঠি থেকে মোহর মোল্যা গোপন সম্পদ পাওয়ায় তাদের শারীরিক ক্ষতি সাধন হয়। এরপর নীলকুঠির ইমারতগুলো ভেঙে ফেলানো হয়। এখনো নীলকুঠির ভিটির উপর বড়ো বড়ো ড্রেন ও চৌবাচ্চা দেখা যায়।

গড়েরহাট নীলকুঠি ও বামনখালি নীলকুঠি : চিত্রা ও কাজলা নদীর ত্রিমোহনায় ৩টি থানার অবস্থান। চিত্রানদীর উত্তর পূর্বদিকে মাগুরা জেলার শালখা থানার বামনখালি নীলকুঠি। এবং উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বে ঐ থানার গড়ের হাট নীলকুঠি। নদীর দুই পারে দুটো নীলকুঠি। এছাড়া ত্রিমোহনার দক্ষিণ তীরে নড়াইল জেলার মাগুরা গ্রামের সীমানা এর পাশেই রয়েছে সুপ্রাচীন মাইচপাড়া গ্রাম। উল্লিখিত নীলকুঠি দুটো বর্তমান মাগুরা জেলার ভূমিতে স্থাপিত হলেও নড়াইল এলাকায ঐ কুঠি দুটোর অধীনে নীলচাষ হতো। নড়াইল এলাকার ধানি জমিতেও নীলের দাগ দেওয়া হতো। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গড়ের হাট ও বামনখালি নীলকুঠি দুটো দেখতে গিয়েছিলেন। বঙ্কিম বাবু এই দুটো নীলকুঠি দেখার অভিজ্ঞতাকে তার রচনার মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন বলে স্থানীয়ভাবে প্রবল কিংবদন্তি চালু রয়েছে।

মালিডাঙ্গা নীলকুঠি : মালিডাঙ্গা নদীর পাশে প্রবাহিত প্রাচীন শিয়েপাগলা খাল বা নদীর তীরে একটি নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ আজো দেখা যায়। নীলকুঠি সংলগ্ন একটি সুপ্রাচীন বটগাছ আজো দেখা যায়। মাত্র ২৫ বছর আগেও মালিডাঙ্গা নীলকুঠির ইমারত দেখা যেতো। এখন কিছু ভাঙ্গা দেয়াল এবং পাকা ফ্লোর দেখতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা মালিডাঙ্গা নীলকুঠির ভিটায় নতুন নতুন ঘরবাড়ি তৈরি করেছে। মালিডাঙ্গা নীলকুঠিয়ালের নাম ছিল মি. মরেল।

চাঁচড়া নীলকুঠি : নড়াইল-যশোর রোডের পাশে চাঁচড়া গ্রামের গাবতলা রাস্তার ডানপাশে একটি নীলকুঠি ছিল। এখানে আজো নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। হায়দারসহ অন্য কয়েকজন লোক চাঁচড়া নীলকুঠির ভিটের ওপর বাড়ি নির্মাণ করে

বসবাস করছে।

মিরেপাড়া নীলকুঠি : নানা কারণে মিরেপাড়া গ্রামটি ঐতিহাসিক মূল্য বহন করে। এই গ্রামে আজো বিদ্যমান রয়েছে মুঘল আমলের চাঁদ আলি মির ও তারা আলি মিরের স্মৃতিবহ ঐতিহাসিক মিরের ভিটে ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ভিটেসমূহ। চিত্রানদীর পূর্ব দক্ষিণ তীরে এখানে একটি নীলকুঠি ছিল। যতো দূর জানা যায়, মিরেপাড়া নীলকুঠিটির মালিক ছিলেন হাটিবাড়িয়ার তৎকালীন জমিদার। কারণ হিসেবে বলা যায়, নীলকুঠির পাশেই ছিল হাটবাড়িয়ায় জমিদারদের কাচারিবাড়ি। কিছুকাল আগেও মিরেপাড়া নীলকুঠির দেওয়াল দেখা যেতো। এখন সেখানে গড়ে উঠেছে মিরেপাড়া কমুউনিটি সেন্টার।

কুমারগঞ্জ-শংকর পাশা নীলকুঠি : কুমারগঞ্জ নীলকুঠির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কুঠিয়াল এডওয়ার্ড সাহেব। এডওয়ার্ডের পুত্র ছিলেন কুঠিয়াল আর্থার। আর্থারের পুত্র জন ব্যারোজ স্থানীয় এক বাগদি মেয়েকে বিয়ে করে 'পচা সাহেব' খেতাব পান। এরপর এই নীলকর পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে। ব্যারোজের পুত্র ছিলেন ম্যালকমও মাইকেল। তাদের বংশধরেরা আজো শংকরপাশা গ্রামে বসবাস করছে। এই নীলকুঠির কুঠিয়ালেরা অত্যাচারী ছিলে। ঘোড়াখালি নদীরতীরে নীলকুঠির ধ্বসে যাওয়া ইমারত আজো দেখা যায়। এই কুঠি হতে প্রাপ্ত একটি ইটের পরিমাণ ১৩″ × ৭″ × ৩½″। সম্ভবত কুমারগঞ্জ নীলকুঠি ছিল একটি কানসারণ। এখানে প্রায় ৩ পাখি জমির উপরে বিশাল কুঠি নির্মাণ করা হয়েছিল। নীলকুঠির প্রাচীন ভিটি থেকে বর্তমান মালিক স্থানীয় মুন্সি আবুল হোসেন ৫০০০ হাজার ইট উদ্ধার করেছেন। কুমারগঞ্জ নীলকুঠিতে আজো অযত্ন অবহেলায় বুনো নীলের গাছ 'নীলঝুপি' জন্মাতে দেখা যায়।

বাগশ্রীরামপুর নীলকুঠি : নবগঙ্গা নদীর দক্ষিণতীরে বাগশ্রীরামপুর গ্রামে একটি নীলকুঠি গড়ে ওঠে। স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে জানা যায়, স্থানীয় গাঁতিদার ও ব্যবসায়ী ভুবনমোহন মিত্র ইংরেজ ম্যানেজার রেখে এই কুঠিতে নীল উৎপাদন করতেন। এই কুঠির মালিক ছিলেন ভুবনমোহন মিত্র। নদীরতীরে নীলকুঠির সুবাদে এখানে একটি বড়ো বাজার গড়ে ওঠে। আজো এখানে ইংরেজ সাহেবের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সেই সাথে দেখা যায়, ভুবনমোহনের পাকাবাড়ি।

কাঁঠালবাড়িয়া নীলকুঠি : মাইচপাড়া বাজার হতে ১ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে চিত্রা নদীরতীরে কাঁঠালবাড়িয়া গ্রামে একটি নীলকুঠি ছিল। এখনো কাঁঠালবাড়িয়া নীলকুঠির ভাঙা দেওয়াল ও ভাঙা ভাঙা ইট দেখতে পাওয়া যায়। কুষ্টিয়ার আমলা সদরপুরের নীলকুঠি ও ঘোড়াখালি নীলকুঠির কর্মকাণ্ডের সাথে কাঁঠালবাড়িয়া কুঠির যোগাযোগ ছিল। এক সময় নড়াইলের নীলকুঠি জমিদার রামরতন রায়ের সঙ্গে ইংরেজ কুঠিয়ালের বিবাদ সৃষ্টি হয়। অতি কৌশলে নড়াইলের জমিদার ঐ বিবাদে জয়ী হয়েছিলেন বলে জানা যায়। স্থানীয় লোকদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়, কুষ্টিয়ার আমলা সদরপুরের বেশ কিছু কর্মচারি নীলকুঠিয়ালের চাকুরির সুবাদে এই কাঁঠালবাড়িয়া নীলকুঠিতে অবস্থান করে। কাঁঠালবাড়িয়া গ্রামের সুধন্য বিশ্বাস ঐ সময়কার কোনো নীলকর্মচারীর উত্তর বংশধর।

বড়োগাতি নীলকুঠি : চিত্রানদীব পশ্চিম দক্ষিণতীরে সিংগাশোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অদূরে বড়গাতি গ্রামে একটি নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই কুঠি

বড়োগাতি নীলকুঠি নামে পরিচিত। এখানে নীলকর পরিবারের একাধিক পাকা কবর দেখতে পাওয়া যায়। এই কুঠিতেও নীলবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। কুঠিয়ালের নাম ছিল ডেভিড ডিরোজিও। ডেভিডের রক্ষিতা ছিল টিউলিপ।

ঘোড়াখালি নীলকুঠি : নড়াইল জেলা শহর থেকে প্রায় ২ মাইল উত্তরদিকে ঘোড়াখালি ও চিত্রানদীর সঙ্গমস্থলে ঘোড়াখালি নীলকুঠির বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এই ঘোড়াখালি নীলকুঠিকে প্রাসাদপুর নীলকুঠি নাম দিয়ে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুবিখ্যাত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন। ঘোড়াখালি নীলকুঠির মালিক ছিলেন নড়াইলের বিখ্যাত জমিদার রামরতন রায়। এই কুঠির যথেষ্ট জাঁকজমক ছিল। ঘোড়াখালি নীলকুঠি বিলুপ্ত হয়েছে। তার বিশালচত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভাঙাচোরা ইট। আর কুঠির অবস্থানের দক্ষিণ পার্শ্বে আছে নীলকর সাহেবের পরিবার পরিজনের কবর। কারণ রামরতন রায় ঘোড়াখালি কুঠিতে একজন ইংরেজ কর্মচারী রেখে প্রজা নীপিড়নের মধ্য দিয়ে নীলচাষ করতেন। সম্ভবত ঘোড়াখালি নীলকুঠিটি জমিদার বাবু ইংরেজ মালিকের কাছ থেকেই ক্রয় করেছিলেন।[১৮]

মাইচপাড়া নীলকুঠি : মাইচপাড়া সীমান্তে নদীর তীরে একটি নীলকুঠি দেখতে পাওয়া যায়। কুঠিটি বর্তমান মাগুরা জেলা ও নড়াইল জেলার সীমান্তে বিদ্যমান। এই কুঠিতেও প্রজাবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল বলে জানা যায়।[১৯]

কামালপ্রতাপ নীলকুঠি : কামালপ্রতাপ গ্রামে একটি বড়ো ধরনের নীলকুঠি ছিল যা আজো বিদ্যমান। কামালপ্রতাপ কুঠিটি উলো নীলকুঠির আওতায় একই কানসারণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২০]

তালবাড়িয়া নীলকুঠি : তালবাড়িয়া গ্রামের মাঝামাঝি স্থলে একটি নীলকুঠির অবস্থান আজো দেখতে পাওয়া যায়। তালবাড়িয়া কুঠিতে ব্যাপক প্রজা বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। উলো কানসারণের আওতায় ছিল তালবাড়িয়া নীলকুঠি। তালবাড়িয়া নীলকুঠির প্রাচীন দেওয়াল ও পাকা ফ্লোর আজো দেখতে পাওয়া যায়।[২১]

নীল বিদ্রোহ

সারা বাংলার কৃষক-প্রজা নীলকরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভেতরে ভেতরে জ্বলে ওঠার অপেক্ষায় থাকে। নড়াইলের নিরুপায় ও হতদরিদ্র চাষিরা নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারবার মামলা- মোকাদ্দমা করেও কোনো প্রতিকার পায় নি। কারণ কোম্পানি সরকারের ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারকেরা ছিলেন নীলকরদের স্বজাতি, স্বভাষী ও বন্ধু। তাই প্রজা নিপীড়ণের মোকদ্দমা একটি হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতো। আর নীলকর সাহেবরা তাদের অত্যাচার নিপীড়ণ পূর্বাপর বহাল রাখার জন্য 'Indingo Planters Association'[২২] নামে একটি সমিতি গঠন করে। এই সমিতির সদস্য নীলকরেরা জোর করে প্রজার নামে একরারনামা লিখিয়ে নিতেন। আর চুক্তি ভঙ্গের দায়ে চাষির নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করতেন। সেই সময়ে যশোর জেলায় একটি ছড়া প্রচলিত ছিল। সেই ছড়ার মধ্যে নীলকরদের অত্যাচারের সংবাদ পাওয়া যায় :

জমির শত্রু নীল, কাজের শত্রু ঢিল
আর কৃষকের শত্রু পাদরি হিল।[২৩]

নীলচাষে অবাধ্য কৃষকদের হাজতে আটকে রাখা হতো। কৃষকেরা নিরুপায় হয়ে কোনো এক রাত্রে পরিবার পরিজন নিয়ে দেশান্তরে বেরিয়ে যেতো। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলায় কয়েকবার বিদ্রোহ দেখা দেয়। নিচে সেই বিদ্রোহসমূহের কাল উদ্ধৃত করা হলো :

১. বীর তিতুমীরের নেতৃত্বে ১৮২৩ সাল থেকে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

২. ১৮৪০ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত দুদুমিয়ার নেতৃত্বে নীলকরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ।

৩. ১৮৫৯ সাল থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে বাংলার সর্বত্র প্রজাসাধারণের নেতৃত্বে ব্যাপক নীল বিদ্রোহ।

ও ৪. ১৮৮৯ সালের মাগুরা-মুহম্মদপুর ও কুষ্টিয়া এলাকার সর্বশেষ নীলবিদ্রোহ।

নড়াইল জেলায় ১৮৪০ থেকে ৪২ সালের মধ্যে নীলবিদ্রোহ হওয়ার কথা জানা যায়। তবে এই বিদ্রোহ যে তিতুমীরের প্রভাবিত বিদ্রোহ তা মনে হয় না। নড়াইল জেলায় ১৮৫৯-১৯৬১ সালের বিদ্রোহ হয়েছিল ব্যাপক বিদ্রোহ।

আমাদের প্রাপ্ত তথ্য মতে, নড়াইল জেলার ৩টি থানার মধ্যে লোহাগড়া থানায়ই নীলবিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল সবচেয়ে বেশি। এই থানায় যে সমস্ত নীলকুঠিতে প্রজা বিদ্রোহ দেখা দেয় সেই কুঠিগুলো হলো : ১. উলো ২. সারল ৩. আমডাঙ্গা ৪. চরকোটাকোল ৫. লক্ষ্মীপাশা ৬. এড়েন্দা ৭. মল্লিকপুর ৮. ইতনা, ৯. নোয়াগ্রাম ও ১০. লাহুড়িয়া-ত্রৈলক্ষপাড়া।

১৮৫৯-১৮৬১ সালের কৃষক বিদ্রোহে উলো, সারল ও চরকোটাকোল এলাকার অত্যাচারিত কৃষক সমাজ নোয়াগ্রাম নিবাসী শেখ শাহ নিয়ামতউল্লাহর নেতৃত্বে নীলবিদ্রোহে যোগ দেন। এই বিদ্রোহী দলের অন্যান্য বিদ্রোহী নেতা ছিলেন বয়রা গ্রামের ইউসুফ লস্কর, আমাদা গ্রামের সাবের খাঁ ও বাসের খাঁ, তালবাড়িয়া গ্রামের আজিম মোল্লা, নোয়াগ্রামের শুকুর মাহমুদ প্রমুখ।

নোয়াগ্রামের জনৈক মহম্মদ শেখের পিতামহকে উলোর নীলকুঠিতে কুঠিয়ালের লোকজন ধরে নিয়ে কুঠিয়ালের নির্দেশে ভীষণভাবে প্রহার ও পদাঘাত করলে এই এলাকায় নীলবিদ্রোহের সূচনা হয়। কুখ্যাত নীলকর ডানলপ সাহেব (তার সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে) কৃষকদের বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয়। প্রথম দিনের যুদ্ধে নীলকর বাহিনী শেখ নিয়ামতউল্লাহর বাড়িতে চড়াও হয়ে তার বসতবাড়ি বিনষ্ট করে। সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দেয়। নীলকর বাহিনীর পক্ষে গাদার বন্দুক, হাতি, ঘোড়া, কিছু দেশীয় লাঠিয়াল ও বুনোরা যোগ দিয়েছিল। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে কামালপ্রতাপ নীলকুঠিতে নীলকর ব্যান্ডের বিরুদ্ধে কৃষক বাহিনী কুঠি আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে ব্যান্ডও তার সহযোগিরা পালিয়ে যায়। কামালপ্রতাপ কুঠিতে কৃষকবাহিনী আগুন ধরিয়ে দেন। নীলকরের পক্ষে কয়েকজন লাঠিয়াল হতাহত হয় বলে জানা যায়।[২৪] মিঃ ব্যাণ্ড ঘোড়ায় চড়ে কামালপ্রতাপ নীলকুঠি ত্যাগ করে।

দক্ষিণ-মধ্য বঙ্গের প্রায় সমস্ত কুঠিতে প্রজাদের বিরুদ্ধে নীলকর এল, এম কামিন ডানলপ নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধ করেছে। যশোর-খুলনা- ফরিদপুর যেখানেই প্রজাবিদ্রোহ হতো

ডানলপ সেখানেই উপস্থিত হতো। মানুষের চরিত্রে যতোগুলো দোষ থাকতে পারে ডানলপের সবটাই ছিল। এই ব্যক্তি দীর্ঘদিন বিখ্যাত শরিয়তউল্লাহর পুত্র দুদুমিয়ার বিরুদ্ধেও লড়াই করেছিল। বর্তমান ফরিদপুর জেলার মকসেদপুর থানার চাঁদেবহাট নীলকুঠিতে ডানলপ গজারিয়া গ্রামে নিহত হয়। যা হোক, কামালপ্রতাপে ব্যান্ডের পরাজয়ের সংবাদে ডানলপ রংপুর থেকে বেশি বেশি শক্তিশালী লাঠিয়াল এনে কামালপ্রতাপ, সারল ও উলো কুঠিতে নিয়োগ করে। ডানলপের যুদ্ধ প্রস্তুতিতে শেখ নিয়ামতউল্লাহ ও অন্যান্য নীলবিদ্রোহীরা অধিক শক্তি সঞ্চয় করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ডানলাপ ও ব্যান্ডের বাহিনীতে ছিল মদপান করিয়ে দেওয়া পাগলা হাতি। নীলবিদ্রোহীদের জন্য ভয়ংকর ছিল হাতির আক্রমণ। কারণ হাতির গতিরোধ করা ছিল তাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার। এক সময় বিদ্রোহীরা একটি বিশেষ কৌশল গ্রহণ করলেন তা হলো, যুদ্ধের স্থলে বিরাট আগুনের কুণ্ডলি জ্বালিয়ে লোহার রড উত্তপ্ত করে হাতিকে আক্রমণ করা। এছাড়া বাঁশের সরু অগ্রভাগ ধারালো অস্ত্র দ্বারা সুচালো করা হয়। নির্দিষ্ট দিনে উলো নীলকুঠির উত্তর-পশ্চিম কোণে নীলকর বাহিনী ও কৃষক বাহিনীর মধ্যে মরণপণ যুদ্ধ হয়। কৃষক বাহিনী গরম রড ও সুচালো বাঁশের অগ্রভাগ দিয়ে হাতির শূড়ে আঘাত করলে হাতিগুলো যন্ত্রণায় পালাতে থাকে। হাজার হাজার উন্মত্ত মারমুখী বিদ্রোহী কৃষকের ভয়ে নীলকর বাহিনী উত্তরদিকে পিছু হটতে থাকে। নীলকর বাহিনী হাজার হাজার বিদ্রোহী কৃষকের দিকে গাদা বন্দুক চালাতেও সাহসী হয় নি। হাতির শূড়ে আঘাত করতে সবচেয়ে বেশি পারদর্শিতা দেখিয়ে ছিলেন বীরকৃষক মাহমুদ বা মাউন। হাতির শূড়ে সফল আঘাত করার জন্য মাহমুদের নাম হয় শূরমাহমুদ। কৃষকদের কাছে পরাজিত হয়ে ব্যান্ড ও ডানলপ লক্ষ্মীপাশার কুঠিতে আশ্রয় নেয়। ঐ এলাকায় আর কোনো দিন নীলকরেরা অত্যাচার করতে পারে নি। কিছুদিন পরে এই এলাকা থেকে নীলচাষ বন্ধ হয়ে যায়। ঐ দিনের যুদ্ধে নীলকরবাহিনী পরাজিত হলে বিদ্রোহী কৃষকেরা উলো, সারল, কামালপ্রতাপ ও চরকোটাকোল নীলকুঠি ধ্বংস করে দেয়। ঐ সময় সাহেবদের সহযোগী ছিল লোহাগড়া গ্রামের অধিবাসী উলো কুঠির দেওয়ান বা বড়োবাবু রাধানাথ মজুমদার এবং ঐ গ্রামের অধিবাসী চরমল্লিকপুর কুঠির আমিন পদ্মলোচন মজুমদার।

মল্লিকপুর কাজিপাড়া নীলকুঠির অদূরে পাঁচু সরদার নামীয় একজন মুসলমান লাঠিয়াল ও যোদ্ধা মল্লিকপুর নীলকুঠিও লক্ষ্মীপাশা নীলকুঠির ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। মল্লিকপুর কুঠি হতে লক্ষ্মীপাশায় ঘোড়ায় চড়ে গমন কালে পাঁচু সরদারের কৃষকবাহিনীর হাতে কুঠিয়াল নিহত হয়। এই নিহত নীলকর সাহেবের নাম জানা যায় নি।

মল্লিকপুর ও লক্ষ্মীপাশা কুঠির পোষা লাঠিয়াল ছিল রাজুপুর গ্রামের শেখ তমিজউদ্দিন খালাসি। নীলবিদ্রোহী পাঁচু সরদারকে তমিজউদ্দিন হত্যা করে। তমিজউদ্দিন খালাসির অশিতিপর বৃদ্ধ পৌত্র বাগু খালাসি (৮০) বর্তমান লেখকের কাছে তার পিতামহ কর্তৃক পাঁচু হত্যার তথ্য স্বীকার করেছেন। তিনি আরো জানান, ঐ হত্যার দায়ে তমিজউদ্দিনের ১৪ বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল।[২৫]

এড়েন্দা নীলকুঠিতেও ব্যাপক নীলবিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া যায়। কাশিপুর গ্রামের

শক্তিমান লাঠিয়াল সোবানউল্লাহ এড়েন্দা কুঠির খালাসির কাজ করতেন। নীলকর সাহেবের আদেশে স্বদেশী কৃষকের ওপর অত্যাচার করতে করতে সোবান ক্ষেপে গিয়ে একদিন সাহেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। নীলকর তার অন্য লাঠিয়াল পদ্মবিলা গ্রামের কালু জমাদ্দারকে লেলিয়ে দেয়। সোবানউল্লাহ খালাসির প্র-পৌত্র ইশারত খালাসি (৮৮) ওরফে মুন্সি মোঃ রাজ্জাক বর্তমান লেখককে জানান, সোবানউল্লাহ এড়েন্দা কুঠির ইংরেজ নীলকরকে হত্যা করেন। এবং তাঁর বংশধরেরা কান্দারপাড় ও খুলনার সারছন গ্রামে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন।[২৬]

মধুমতি নদীর তীরে আমডাঙ্গা নীল কুঠির কুঠিয়াল ছিলেন মি. হের। সম্ভবত আমডাঙ্গা কুঠি ডানলপের অধীনে ছিল। আমডাঙ্গা নিবাসী চৌধুরী মাহমুদ চৌধুরী গরু নীলের ক্ষেত নষ্ট করলে ঘোড়ার চড়া অবস্থায় ডানলপ চৌধুরী মাহমুদকে চাবুক মারে। চাবুক ধরে টান দিলে ডানলপ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যায়। এরপর চৌধুরী মাহমুদ চৌধুরী ও ডানলপের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে নীলকরবাহিনী পরাজিত হলে বরকন্দাজের চাকুরি চলে যায়। চৌধুরী মাহমুদকে হত্যা করার জন্য নীলকরেরা হরেকৃষ্ণপুর (মুহম্মদপুর) থেকে লাঠিয়াল আনায়। এবং ২০০ শত যোদ্ধাসহ চৌধুরী মাহমুদের বাড়ি আক্রমণ করে। চৌধুরী মাহমুদ মাত্র ১৭ জন কৃষক বীরকে নিয়ে ২০০ জনের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করেন। শেষ পর্যন্ত নীলকরবাহিনী পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকেরা বলেন, কন্যাদহের খালের পূর্বদিকে যে নাওদাড়া নামের খাল ছিল ঐ স্থানে চৌধুরী মাহমুদ দুজন নীলকরকে হত্যা করেন। এরপর তিনি এলাকা থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। কিছুদিন আগেও চৌধুরী মাহমুদের দৌহিত্র মহিরউদ্দিন বা মহির মাতব্বর জীবিত ছিলেন।

লাহুড়িয়া ত্রৈলক্ষপাড়া নীলকুঠিয়ালের নাম ছিল মি. ক্যালি। ক্যালির বরকন্দাজ বাহিনীতে বহিরাগত দুই ভাই ভরসমোহন ও হরষমোহন চাকুরি নেয়। স্থানীয় লোকদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করায় কুঠির সাহেব ক্যালি ভরসমোহনের মাথা থেকে লালপাগড়ি কেড়ে নেয়। এই ভরসমোহনই কৃষকদের নেতৃত্ব দিয়ে লাহুড়িয়া কুঠি ধ্বংস করেন। এবং মি. ক্যালিকে হত্যা করেন। নীলবিদ্রোহী ভরসমোহনের উত্তর বংশধরই স্থানীয় ইউ পি-র সাবেক চেয়ারম্যান হারুন জমাদ্দার।[২৭]

কালিয়া থানার নীলকুঠির মধ্যে ৫টি নীলকুঠিতে বিদ্রোহ দেখা গিয়েছিল বলে জানা যায়। এই ৫টি কুঠি হলো যথাক্রমে, ১. কলাবাড়িয়া নীলকুঠি ২. নড়াগাতি নীলকুঠি ৩. টোনা নীলকুঠি ৪. চাঁচুড়ি নীলকুঠি ও ৫. লক্ষীপুর নীলকুঠি।

কলাবাড়িয়া নীলকুঠির মালিক ছিলেন এল. এম. কামিন ডানলপ। যতোদূর ধারণা করা যায়, ডানলপ সাহেবকে কুঠি তৈরিতে জমি ইজারা ও অন্যান্য সহযোগিতা করেছিলেন স্থানীয় জমিদার মুহম্মদ জকি মিয়া। বর্তমান কলাবাড়িয়া উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠ থেকে দক্ষিণদিকে নীলকুঠি পর্যন্ত বিশাল এলাকায় নীল চাষ হতো। এখানে উল্লেখ করা যায়, কলবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠটি প্রাচীন কাল থেকে মোল্যা জমিদার পরিবারের খাসজমি ছিল। মাঠের পূর্ব-দক্ষিণে বসতি পাওয়া জেলে সম্প্রদায়কে এই মোল্যা পরিবার লাখেরাজ জমিদান করে বসতি দান করেন। বর্তমান মাঠটিও চাকরান জমি হিসেবে জেলেদের ছিল। স্কুল প্রতিষ্ঠাকালে জেলেদের ঐ পরিমাণ জমি মাঠ থেকে

দিয়ে স্কুল স্থাপনের সূচনা হয় বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে। যা হোক, মোল্যা জমিদারির বড়ো তরফের মালিক জমিদার জকি মোল্যা ঐ স্থানে নীলচাষের অনুমোদন দিয়েছিলেন। দক্ষিণপাড়ার রাঙামিয়া খালাসিও তার ৭ ভাই ডানলপের কুঠিতে খালাসির চাকুরি করতো। তারাগাজী বংশীয় বলে জানা যায়। তারা নীলজমির চাষাবাদ দেখা শুনা করতো। নীলকরেরা প্রথম কৃষকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলেও পরে তাদের অত্যাচারী চরিত্র উৎঘাটিত হয়। স্থানীয় লোকদের ওপর অত্যাচার করলে কলাবাড়িয়া পশ্চিমপারের বিখ্যাত গাঁতিদার শেখ মোলামের ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ গোলাম আকবর ডানলপের বিরুদ্ধে স্বোচ্চার হন। তাকে সহযোগিতা করেন প্রতিবেশি লাঠিয়াল কাছিম শিকদার, বদন শিকদার, শেখ গোলাম মনসুর প্রমুখ। স্থানীয় লোকেরা সাহেবের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হলে জমিদার মুহম্মদ জকি মোল্যা তার শ্বশুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ গোলাম আকবরের আহ্বানে এবং প্রজার স্বার্থে নীলবিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[২৮]

কলাবাড়িয়া নীলকুঠিতে ১৮৪০-১৯৪২ সালের মধ্যে নীলবিদ্রোহ দেখা দেয়। ডানলপের অশ্বারোহী বাহিনী ও বন্দুকধারী বরকান্দজবাহিনী কলাবাড়িয়া কুঠিতে জমায়েত হয়। সম্ভবত এই যুদ্ধে হাতিও ব্যবহার হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধে বন্দুকধারী সৈনিকেরা কোনো ভূমিকা নিতে সাহসী হয় নি। নীলকর পক্ষের দেশীও গোরা যোদ্ধাদের প্রায় ২০ জন আহত হয়। এ ছাড়া নীলকর পক্ষের লাঠিয়াল ছিরামদি ও কিরামদি (জরিপ ও করিম) নীলবিদ্রোহীদের হাতে বন্দি হয়। ছিরামদি ও কিরামদির বাড়ি ছিল নড়াইলের সন্নিকটে পোলোইডাঙ্গা গ্রামে। ছিরামদি ও কিরামদি তাদের বেয়াদবির কারণে বন্দী অবস্থায় নিহত হয়। এল. এম. কামিন ডানলাপ নীলবিদ্রোহীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে চিরকালের জন্য কলাবাড়িয়া নীলকুঠি ত্যাগ করে। কলাবাড়িয়া নীলকুঠি বর্তমান গাজি বা বিজয়ীদের নামকরণে 'গাজিরকুঠি' নামে পরিচিতি পেয়ে আসছে।[২৯]

নড়াগাতি নীলকুঠির কুঠিয়াল ছিলেন মি. লুইচ। রামপুরা নিবাসী পবন চৌধুরীর জমিতে নীলচাষকে কেন্দ্র করে নড়াগাতি নীলকুঠিতে নীলবিদ্রোহ দেখা দেয়। জোতদার পবন চৌধুরী, বাগু খাঁ প্রমুখ টানের জমিতে নীলচাষে অস্বীকৃত হলে পবন চৌধুরীর বাড়ি লুইচ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। এরপর পবন চৌধুরী, বদন চৌধুরী, মোহন চৌধুরী, বাগু খাঁ প্রমুখ কৃষক নেতার নেতৃত্বে হাজার হাজার বিদ্রোহী চাষি নড়াগাতি নীলকুঠি আক্রমণ করেন। মি. লুইচ নিজেই ঘোড়ায় চড়ে তার বরকন্দাজ বাহিনী পরিচালনা করেন। কিন্তু তিনি আহত ও বন্দি হন। নড়াগাতি কুঠিতে চিরকালের জন্য নীলচাষ বন্ধ হয়। নড়াগাতি কুঠিতে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল ১৮৫৯ থেকে ১৮৬১ সালের মধ্যে।

টোনা নীলকুঠিতে ব্যাপক নীলবিদ্রোহ হয়েছিল। ঐ বিদ্রোহে টোনার নীলকুঠিয়াল চাষিদের দ্বারা হত্যা হয়। স্থানীয় লোকেরা আজো গলাকাটা সাহেবের গল্প করে থাকে। এখানকার নীলকর কিংবা নীলকর সাহেবের ইতিহাস জানা যায় নি। মাগুরার বরিশাট থেকে এজন নীলবিদ্রোহী তমিজউদ্দিন মিয়া টোনায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। অনেকে এই বিদ্রোহের ইন্ধনদাতা হিসেবে তমিজউদ্দিনের নাম উল্লেখ করেন।[৩০]

চাঁচুড়ি নীলকুঠিতেও প্রজাবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল অনেকে ধারণা করেন, এখানকার কুঠিয়াল নীলবিদ্রোহী প্রজাদের দ্বারা নিহত হয়েছিল। স্থানীয় লোকেরা গলাকাটা সাহেবের সাদাভূতের কাহিনী আজো বলে ফেরে।

লক্ষ্মীপুর নীলকুঠিতে স্থানীয় হাশিম শিকদার, তার পিতা দাদনতলার নাসিমউদ্দিন ও উতারউদ্দিন লক্ষ্মীপুর নীলকুঠির কুঠিয়াল ও তার কর্মচারীদের তাড়িয়ে কুঠিটি দখল করে নেন। নড়াইল থানা এলাকায় বেশি সংখ্যক নীলকুঠিতে বিদ্রোহ দেখা দেয় নি। তবে নীল চাষ নিয়ে সেখানে যে দারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নাই। স্থানীয় লোকেরা নড়াইলে বিদ্রোহ করতে না পারাব কারণ হলো নড়াইলের স্থানীয় জমিদার ও হাটবাড়িয়ার জমিদারেরাই কুঠিয়াল ছিলেন। নড়াইলের জমিদার রতন রায় যশোর, ফরিদপুর, খুলনা ও পাবনা জেলায় নিজে নীলকুঠি স্থাপন করে কৃষকের রক্ত শোষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এই ভাবে স্বীয়স্বার্থের জন্য ইংরেজ কুঠিয়ালদের সাথে বাংগালি রামরতন রায়ের সংঘর্ষ হতো। রামরতন সুযোগ বুঝে কখনো কখনো স্থানীয় চাষীদের লেলিয়ে দিতেন ইংরেজ কুঠিয়ালের বিরুদ্ধে। এজন্য কেউ কেউ তাকে নীলবিদ্রোহীর দলভুক্ত করতে চান। কিন্তু ধারণাটি সম্পূর্ণ উল্টো। রামরতন রায়ের দুইজন কুঠির ম্যানেজার হলেন, ঝিনেদা নিবাসী অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঘোড়াখালিতে নিযুক্ত ইংরেজ ম্যানেজার জেমস্ মাইস। মাইসের জন্য রতন রায় ঘোড়াখালিতে রীতিমতো পাকা বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন।[৩১]

ইংরেজ কুঠিয়াল ও বাংগালি কুঠিয়ালেরা শ্রমসাধ্য নীলচাষের জন্য সাঁওতাল পরগণা থেকে স্বল্প পারিশ্রমিকে বিকৃত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আদিবাসীদের এনে নড়াইল জেলার বিভিন্ন কুঠির পাশে বসতি দিয়েছিলেন। নীলচাষ শেষ হয়েছে কিন্তু সাওতাল পরগনার আদিবাসীরা বুনো-বাগদি পরিচয় পেয়ে জেলার বিভিন্ন স্থানে আজো আছে মানবেতর অবস্থায়। এই বুনো-বাগদি জাতির লোকেরা নড়াইল সদর থানায় নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়ের অত্যাচারের সমর্থ যোগানোর জন্য নড়াইলে নীলবিদ্রোহ খুব শক্তিশালী রূপ নেয় নি। মাঝে মধ্যে তা ছাইয়ে ঢাকা আগুনের মতো জ্বলে উঠতো। আমরা আগেই বলেছি ঘোড়াখালি নীলকুঠি ছিল রামরতন রায়ের প্রতিষ্ঠিত। রতন বাবু ইংরেজ সাহেবদের ম্যানেজার রেখে প্রজাদের জোর করে নীলচাষ করাতেন। ইংরেজ সাহেবরা স্বভাবে অত্যাচারী তেমনি স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদারের সমর্থনে ও তার কুঠিতে চাকুরি করার সুবোদে প্রজা সাধারণের ওপর অত্যাচার করতো। একবার একজন হিন্দু রমণী (বিধবা) কিংবা চাকরানি ঘোড়াখালি কুঠিতে হত্যা হয়েছিল এবং তাকে সম্ভ্রম দিতে হয়েছিল বলে স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে শোনা যায়। একবার ডুমুরতলার বনঘেরা রাস্তা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় মোল্যা বংশের কোনো সাহসী লোক বেতের শিষা লাঠির আগায় বেধে কুঠির সাহেবের মাথায় জড়ায়ে মাটিতে ফেলে দেন। এরপব কুঠির বরকান্দাজ বাহিনী ডুমুরতলা গ্রামে গিয়ে কৃষকদের ওপর অত্যাচার করে। ঐ সময় নড়াইলের জমিদাব পক্ষীয় নীলকর বাহিনীর সাথে স্থানীয় লোকের সংঘর্ষ হয়। তাতে কয়েকজন লোক হতাহত হয় বলে জানা যায়।

ডুমুরতলা গ্রামের কোনো এক মুসলমান ঘোড়াখালির একজন কুঠিয়ালকে ছ্যানদা দ্বারা আহত করে দেশান্তরী হয় বলে জোর প্রবাদ শোনা যায়। নীল চাষ ও নীলবিদ্রোহ চলাকালে নড়াইল এলাকার জমিদার রামরতন রায় প্রথম জীবনে একটি প্রজাবিদ্রোহের মোকাবেলা করেছিলেন। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন মালিডাঙ্গা গ্রামের প্রাচীন জমিদার খলিল চৌধুরী, এদোন চৌধুবী ও ডুমুরতলা গ্রামের খলিল মোল্যা। স্থানীয় প্রজাদের

উপর নীলচাষমূলক নিপীড়ণ ও জমিদারদের খামখেয়ালির কারণে তালুকদার গাঁতিদারদের উপর সেচ কর বাড়িয়ে দিলে প্রজাবিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ চলেছিল প্রায় ১ বছর। জমিদার বাহিনী মালিডাঙ্গার চৌধুরী বাড়িতে (প্রাচীন দালান কোঠা সম্বলিত) অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হাতির সাহায্যে আক্রমণ করতো। চৌধুরীদের লাঠিয়ালেরা গুরুল মেরে হাতিকে প্রতিরোধ করতো। এছাড়া চৌধুরী বাহিনী নড়াইলের জমিদার বাহিনীকে তীর, ধনুক, তরবারি নিয়ে আক্রমণ করতো। চৌধুরী বাহিনীর হাতির শূঢ় ক্ষত বিক্ষত হলে নড়াইলের জমিদারদের লাঠিয়াল বাহিনী পরাজয় বরণ করে।

ডুমুরতলা গ্রামের প্রাচীন গাঁতিদার খলিল মোল্যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর খাজনা দেওয়া ত্যাগ করলে রামরতন রায়ের সাথে তার দীর্ঘ সময়ের জন্য দাঙ্গা ও যুদ্ধ হয়। রতন বাবুর লাঠিয়ালেরা হাতি নিয়ে বারবার আক্রমণ করেও খলিল মোল্যাকে পরাজিত করতে পারে নি।

ইংরেজ কুঠিয়ালেরা ও বাঙ্গালি কুঠিয়ালেরা শ্রমসাধ্য নীলচাষের জন্য সাওতাল পরগণা থেকে স্বল্প পারিশ্রমিকে বিকৃত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আদিবাসীদের এনে নড়াইল জেলার বিভিন্ন কুঠির পাশে বসতি দিয়ে ছিল। নীলচাষ শেষ হয়েছে সেই অতীতে কিন্তু সাঁওতাল পরগণার আদিবাসীরা বুনো-বাগদি পরিচয় পেয়ে জেলার বিভিন্নস্থানে আজো মানবেতর অবস্থায় বসবাস করছে। এই আদিবাসী মানুষগুলো এক ঠিকানাহীন মানুষের উত্তরাধিকাব। আমরা জানি, বুনো-বাগদি লোকেরা বিচিত্র সব পশুপাখির মাংস আহার করে থাকে। এরা থাকে নড়াইল জেলার রূপগঞ্জ, দুর্গাপুর, রাধানাথপুর, দৌলতপুর, এড়েন্দা ও লক্ষ্মীপাশায়। নীলচাষ শেষ হলেও নীলচাষের স্মারক হিসেবে বুনোরা আজও টিকে আছে।

আধুনিক রাজনৈতিক আন্দোলন

১৯০৪ সালে ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন পূর্ব বাংলার কয়েকটি জেলা ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং পূর্ব বাংলার জনগণের উন্নয়নের জন্য ১৯০৫ সালের প্রথম দিকে একজন ছোটো লাটের অধীন পূর্ববঙ্গ-আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করেন। কিন্তু হিন্দুজাতীয়তাবাদী কংগ্রেস ও তাদের সমর্থক উপদলগুলো নতুন প্রদেশকে মেনে নিতে পারেন নি। সারাদেশে তারা আন্দোলনের সূচনা করেন। বহু অত্যাচারও অবিচারের সাক্ষী বাংলার নমঃ শূদ্র সম্প্রদায় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশকে যেমন শক্তভাবে সমর্থন করেন– তেমনি মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু নেতা ও নতুন প্রদেশের বিরোধিতা করতে থাকেন। ১৯০৫ সালে বারানসিতে কংগ্রেসের এক অধিবেশনে চরমপন্থী গ্রুপ নতুন প্রদেশের সমর্থকদের ওপর আক্রমণাত্মক ভূমিকা রাখার দাবি করে। পূর্ব বাংলার সেই সংকটে স্যার সলিমুল্লাহ নতুন প্রদেশের পক্ষে আপোসহীন সংগ্রামে লিপ্ত হন। চরমপন্থী কংগ্রেসী গ্রুপ রীতিমতো সাম্প্রদায়িক ভূমিকা পালন করে। এরপর সারা দেশে স্বদেশী আন্দোলন ক্রমশ স্বরাজ আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৯১৬ সাল হতে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি স্বরাজ আন্দোলন এবং হিন্দু মুসলিম ঐক্যের অগ্রগতি সাধনে চেষ্টা করেন। ১৯২০ সালের খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে

কংগ্রেস এগিয়ে এলে হিন্দু মুসলমান এক সাথে আন্দোলনমুখী হয়। নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানায় ঐ সময় কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আড়িয়ার গোপাল ফকির, আমডাঙ্গার আঃ হাকিম মুন্সি ও আঃ সালাম শিকদার বি এল, মোচড়ার শাহ মোকাররম আলী প্রমুখ। ঐ সময় লোহাগড়ায় কয়েকটি শ্লোগান খুব জনপ্রিয় ছিল, 'বন্দেমাতারমঃ, 'আল্লাহু আকবর' 'জয় হিন্দ', 'করেংগে ইয়ে মারেংগে'।[৩২] এই সময় চরম রাজনৈতিক চেতনা ধারণ করেছিলেন ইতনা গ্রামের নলিনী সেন ও জয়পুরের নীলমণি পোদ্দার।

নেতাজী সুভাষ বোসের অন্তর্ধানের পর বাংলা কংগ্রেসের নেতা আঃ রহিম লোহাগড়া স্কুলমাঠে ছাত্র জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতা শুনে ছাত্রজনতা উত্তেজিত হয়ে লোহাগড়ার নবগঙ্গা নদীর রাজারঘাটে তৎকালীন এম পি সাহেবের 'বোট' চড়ায় তুলে ফেলেন।

লোহাগড়া থানায় স্বরাজী ও সন্ত্রাসবাদীরাও ছিলেন। লোহাগড়ার বেশ কিছু যুবক 'অনুশীলন পার্টি'র সদস্য ছিলেন। একবার যশোরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট লারকিন ও কুখ্যাত পুলিশ সুপার এলিসন নলিনী সেন ও নীলমণি পোদ্দারকে ধরে প্রচণ্ড মারধোর করার পরে গায়ে চিটে গুড় লাগিয়ে তার ওপর তুলো বসিয়ে লোহাগড়ার বাজার ঘুরিয়ে ছিলেন। নড়াইলের চামরুল ঘাটের কাছে অনুশীলন পার্টির সদস্যরা পুলিশ সুপার এলিসনের আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নিয়ে কান কেটে দিয়েছিলেন। এলিসন পরে কুমিল্লায় বিপ্লবীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।[৩৩] কলিকাতার কুখ্যাত হলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙায় অংশ নিয়েছিলেন লক্ষ্মীপাশা গ্রামের ডা. ওসমান গণি প্রমুখ।

১৯২৮ সালে নেহেরু রিপোর্টে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন অস্বীকার করলে মুসলমানেরা একচেটিয়া মুসলিম লীগে যোগদান করতে থাকে। ঐ সময় ইতনায় চট্টগ্রামের অনুশীলন পার্টির জনৈক নেতা সত্যশরণ গৃহদস্তিদার অনুশীলন পার্টির বিপ্লবীদের ট্রেনিং দিয়েছিলেন। কুন্দসি গ্রামের 'পল্লীবাস' নামীয় বাগান বাড়িতে বিপ্লবীদের আড্ডা ছিল। ঐ সময় সন্ত্রাসী দলের সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন জয়পুর গ্রামের নীলমণি পোদ্দার, ইতনার নলিনী সেন, জয়পুরের সুরেন্দ্রনাথ পোদ্দার, পাচুড়িয়ার সৈয়দ হাসমত আলি, লোহাগড়ার খোন্দকার নজরুল ইসলাম, নলিনীর পুত্র অমিয় সেন, বিপ্লবী বটুক দত্তের স্ত্রী রিক্তা দত্ত প্রমুখ।[৩৪] ঐ সময় লোহাগড়া থানার দেশীয় পুলিশ কর্মচারী নারায়ণ বাবু মল্লিকপুর গ্রামের পাঁচু শেখের মাধ্যমে বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন।

১৯০৬ সালে স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ গঠিত হলেও কংগ্রেস সমর্থিত মুসলমানেরা মুসলিম লীগে যোগ দেন নি। ১৯২৮ সালে জওহার লাল নেহেরু 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট' অস্বীকার করলে সারা দেশের মুসলমানদের সঙ্গে নড়াইলের মুসলমান সমাজ মুসলিম লীগে যোগদান করে। ১৯৩৯ সালে মুসলিম লীগের থানা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন তোবারক হোসেন মোল্যা ও সম্পাদক নিযুক্ত হন মোচড়া গ্রামের শামসুল আলম। ১৯৪২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জে মুসলিম লীগের অধিবেশন হয় তখন নড়াইল জেলার অনেক কর্মী ও নেতা ঐ অধিবেশনে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে হোসেন শহীদ সরোয়ার্দি জেসিকো ইষ্টিমারে চড়ে লোহাগড়ায় আগমন করেন। তার সাথে ছিলেন হাসান সরোয়ার্দি। ঐ সময় মুসলিম লীগেব সভা হয়েছিল লোহাগড়া

বাজারের উত্তরপার্শ্বে তোবারক মোল্যার দোকানের সামনের বিস্তৃত এলাকায়। সভায় স্থানীয় নেতাদের মধ্যে ছিলেন যোগিয়ার জননেতা শামসুদ্দিন আহমদ ওরফে তারামিয়া ও আমডাঙ্গার সৈয়দ রুস্তম আলী। সরোয়ার্দি সাহেব সমগ্র নড়াইল এলাকায় বারবার সাংগঠনিক কাজে এসেছেন। যার ফলে, অন্ত্যজহিন্দু নমো ও মুসলমানদের মাথারমণি ১৯২৩ থেকে ১৯৩০ সালের তেভাগা আন্দোলনের নেতা নড়াইলের বাসিন্দা সৈয়দ নওসের আলি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন কৃষক প্রজাপার্টির বিশিষ্ট নেতা ও বাংলার মন্ত্রী। ১৯৪৬ সালে সৈয়দ নওসের আলী লক্ষ্মীপাশায় গেলে মুসলিম লীগের ঘোর সমর্থক ফজলে করিম তাকে গাড়ি থেকে নামতে দেন নি। সৈয়দ নওসের আলী অবিভক্ত ভারতের সমর্থক ছিলেন।

সমগ্র যশোর জেলা তথা নড়াইল জেলার কৃষক শ্রমিক পার্টির অবিসংবাদী নেতা ছিলেন নড়াইল থানার মির্জাপুর গ্রামের বাসিন্দা প্রখ্যাত সৈয়দ নওশের আলী। তে-ভাগা আন্দোলনের নেতা হিসেবে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন। নির্যাতিত নমঃ ও মুসলমান সমাজের অকৃত্রিম ভালোবাসা পেয়েছিলেন সৈয়দ সাহেব। জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনে তাঁর পছন্দের অর্থাৎ কৃষকশ্রমিক পার্টির লোকেরাই তর্কাতিতভাবে নির্বাচিত হতেন। সৈয়দ সাহেব নিজে এক সময় যশোর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, কলবাড়িয়া ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, বাংলা সরকারের মন্ত্রীও ছিলেন। তার মনোনীত কলবাড়িয়া গ্রামের বিশিষ্ট আইনজীবী আসাদুজ্জামান মিয়া ভারত বিভক্তির আগে নড়াইল টাউন কমিটি বা পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। সৈয়দ নওসের আলী সাহেবের বক্তব্য ছিল উৎপাদিত ফসলের ২ ভাগ পাবে বর্গাদার চাষি। আর বাকি ১ ভাগ পাবে জমির মালিক।[৩৫] নানা কারণে সৈয়দ নওসের আলী সাহেবের প্রথম তে-ভাগা আন্দোলন ব্যাহত হয়।

দ্বিতীয় বার নড়াইলে তে-ভাগা আন্দোলন শুরু হলে বিখ্যাত কৃষক নেতা নূর জালাল আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এছাড়া জননেতা অমল সেন ও চাষিদের নেতা মুন্সি মোদাচ্ছের তে-ভাগা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। চাষিদের দাবি আদায়ের শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯৪৫/৪৬ সালে নড়াইলের দুর্গাপুর মাঠের জনসভায়। ঐ সভায় অমল সেন উপস্থিত হয়েছিলেন সন্ধ্যাবেলায়–আন্দোলনে চরম সিদ্ধান্ত নেয়ার পরে।[৩৬] ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময় দ্বিতীয় পর্বের তে-ভাগা আন্দোলন চরম অবস্থায় পৌঁছায়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কারণে এই তে-ভাগা আন্দোলনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

লোহাগড়া থানার মতো কালিয়া থানায়ও প্রজার অধিকার আদায়ে স্থানীয় অধিবাসীরা সোচ্চার ছিলেন। কালিয়ার ভূপেষদাশ গুপ্ত খুলনা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। কালিয়ার বিখ্যাত আই সি এস শিল্পী উদয়শংকর ও রবি শংকরের পিতা শ্যামা শংকর হরচৌধুরী কালিয়ায় অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। কংগ্রেসীরা কালিয়া, বারোইপাড়া, পুরুলিয়া, গাজিরহাট, বড়দিয়া, খাশিয়াল, পাটনা প্রভৃতি এলাকায় অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতার জন্য জনমত সৃষ্টি করেন। কালিয়ার অধিবাসী গণেশচন্দ্র দাশগুপ্ত স্বদেশী আন্দোলনের নেতা ছিলেন। গণেশ বাবুর কর্মস্থল ছিল বরিশাল। মহাত্মা

গান্ধিজীর শান্তি মিশনে যোগ দিয়ে জীবন দিয়েছিলেন সুশীলকুমার ও রনেন্দ্রকুমার।[৩৭] কালিয়া গ্রামের তালুকদার নগেন্দ্রনাথ সেন উগ্র কংগ্রেসের বিশিষ্ট সমর্থক ছিলেন। এই নগেন্দ্রনাথ সেনের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় কু-খ্যাত বড়োনালের ক্যাইজে বা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সংগঠিত হয়।

কালিয়া থানায়ও সৈয়দ নওসের আলীর রাজনৈতিক প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। তিনি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের একান্তজন ছিলেন। সৈয়দ নওসের আলীর তে-ভাগা আন্দোলনের সাথে সব চেয়ে বেশি জড়িত ছিলেন জননেতা ও নড়াইলের আইনজীবী কলাবাড়িয়া গ্রামের এম. আসাদুজ্জামান।[৩৮] এম. আসাদুজ্জামান কৃষক প্রজাপার্টি থেকে নড়াইল টাউন কমিটি বা পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইতোপূর্বে নড়াইল জমিদার পরিবারের বাইরে কেউ নড়াইল টাউন কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতে পারেন নি। কালিয়া-কলাবাড়িয়া এলাকায় কৃষক প্রজাপার্টির নেতৃস্থানীয় সমর্থক ও নেতা ছিলেন, টোনা গ্রামের আ. হাকিম মোল্যা (পরে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের স্পিকার, সাহিত্যিক ও আইনজীবী), কলাবাড়িয়া পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মুহম্মদ দুদুমিয়া, টোনা গ্রামের মুন্সি মোজাহার আলি, দেবদুন গ্রামের কেষ্টধন বিশ্বাস, কলাবাড়িয়া গ্রামের ধলামিয়া তালুকদার, ইসমাইল হোসেন ফকির, শেখ আবদুল হামিদ, মুহম্মদ আবদুস সামাদ মোল্যা প্রমুখ। সেই সময় যুবকদের মধ্যে যারা কৃষক-শ্রমিক পার্টির সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করেছেন তারা হলো কলাবাড়িয়া গ্রামের শেখ আবদুল হাকিম, শেখ দেলোয়ার হোসেন, সৈয়দুজ্জামান মিয়া, বদরুদ্দিন মোল্যা, আবদুর রাজ্জাক মিয়া প্রমুখ।[৩৯]

চারণকবি মুন্সি মোজাহারউদ্দিন তে-ভাগা আন্দোলনের সমর্থনে প্রচুর গান ও কবিতা রচনা করেছিলেন। সেই গানে বৃহত্তর যশোর, বৃহত্তর খুলনা ও বৃহত্তর ফরিদপুর এলাকার তে-ভাগা আন্দোলনকারীরা বিশেষ উৎসাহিত হয়েছিলেন।

কৃষক প্রজাপার্টির তৎকালীন বিশিষ্ট নেতা ও তে-ভাগার আন্দোলনের নেতা, নড়াইল টাউন কমিটির প্রথম মুসলমান প্রেসিডেন্ট কলাবাড়িয়ার এম. আসাদুজ্জামান মিয়া স্থানীয় তহশিল অফিসের তহশিলদার প্রজা নিপীড়ন করলে তার চাচাতো ভাই কৃষক প্রজাপার্টির কর্মী আবদুর রাজ্জাকের মাধ্যমে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা ফজলুল হকের কাছে টেলিগ্রাম করেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাকের টেলিগ্রামে সাড়া দিয়ে কলাবাড়িয়া তহশিল অফিসের তহশিলদারকে অপসারণ করেন। এবং আবদুর রাজ্জাকের নামে একটি জবাবি টেলিগ্রাম করেন।[৪০]

১৯২৯ সালে খুলনার যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কালিয়ায় ঐ সম্মেলনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন কালিয়া ফরোয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেস সমর্থকেরা। ঐ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু।[৪১] সুভাষ চন্দ্র কালিয়া আগমন করেছিলেন সৈনিকের পোষাকে। কালিয়া থানার বড়ো কালিয়ার কম্যুনিষ্ট নেতা ছিলেন রনেন্দ্রচন্দ্র তিনি ইংরেজ বিরোধিতাব জন্য কারাবরণ করেছিলেন।

কালিয়া থানার খাশিয়াল গ্রামের গঙ্গাপদ বসু নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যয়ন কালে বিখ্যাত বিপ্লবী বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখের সহযোগিতায় 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের

হয়ে নড়াইল থানা লুট করে ৭টি রাইফেল ও ১টি রিভলভার সংগ্রহ করেন।[৪২]

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহিত হলে সারা নড়াইল জেলায় পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। এক সময় কালিয়া থানার কৃষক-প্রজাপাটির বড়ো কেন্দ্র ছিল কলাবাড়িয়া গ্রাম তথা এম. আসাদুজ্জামানের বাড়ি। সেই কলাবাড়িয়া কেন্দ্রে মুসলিম লীগের সমর্থন বাড়তে থাকে। এই কলাবাড়িয়া গ্রামেই শেরে বাংলা ফজলুল হক, শহীদ সরোয়ার্দি, কর্ণেল সরোয়ার্দি, মন্ত্রী মৌলভী তমিজউদ্দিন, শিল্পী আব্বাসউদ্দিন প্রমুখ রাজনৈতিক প্রচারণায় গিয়েছিলেন। এক সময় সৈয়দ নওসের আলি ছিলেন কলাবাড়িয়া বহুমুখী ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। কালিয়ার গফুর মোল্যা (শেখ), রামপুরার গোলাপ খাঁ, বড়নালের বাবন সরদার, বেন্দার ধলামিয়া সরদার, কলাবাড়িয়ার সৈয়দুজ্জামান, ধলামিয়া তালুকদার, ডুমুরিয়ার রোস্তম মিয়া, নোয়াগ্রামের নাজিমউদ্দিন, সিনার মুন্সি নুরুল হক, কচুবাড়িয়ায় খানসাহেব আবদুল হক শেখ, বড়নালের আবদুল লতিফ গাজি (পরে কালিয়া নড়াইল এলাকার প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য) দেওয়াডাঙ্গার নজলার মিয়া, পানিপাড়ার জহুর মিয়া প্রমুখ পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। কালিয়া এলাকায় এক সময়ের মুকুটহীন সম্রাট সৈয়দ নওসের আলী এখানের মানুষের কাছে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েন।[৪৩]

যতদূর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে এটা ধারণা করা সহজ যে, লোহাগড়া ও কালিয়া থানায় যেমন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও হামলা চলেছিল নড়াইল সদর থানায় সে তুলনায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কম হয়েছিল। ১৯২৮ সনের দিকে নড়াইলের মাছিমদিয়া গ্রামের কিরণচন্দ্র মিত্র বিখ্যাত শ্রমিক নেতা ছিলেন। কিরণ মিত্র 'জটিবাবা' নামে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। নড়াইলের হরিপদ ভট্টাচার্য, আড়েরার জ্যোতিষ বাবু নেতাজি সুভাষ বসুর সহকর্মী ও নিকটজন ছিলেন। ১৯৩০ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতে নড়াইল এসেছিলেন। এবং বর্তমান এডিসি সাহেবের বাসভবনের পশ্চিম পার্শ্বে (তখন মাঠ ছিল) বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বিখ্যাত মাওলানা আকরাম খাঁ। ঐ সভা থেকে নড়াইলের হিন্দু-মুসলমান দেশবর্মী বিদেশী কাপড়ে আগুন লাগিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। হাজার হাজার দেশ প্রেমিক খেলাফত আন্দোলন, লবণ আইন অমান্য আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নড়াইলের রাজনৈতিক আন্দোলনের সক্রিয় নেতা ছিলেন, সৈয়দ নওসের আলি. মুন্সি ওয়ালিয়ার রহমান, এম আসাদুজ্জামান মিয়া, মদনমোহন ঘটক, হরিপদ ভট্টাচার্য, কানাই কুণ্ড, প্রসন্ন ভট্টাচার্য. ভবেশ ভট্টাচার্য, বিজয় রায়, জানাউল্লাহ খাঁ প্রমুখ। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের কয়েকজন ১৯৩২ সালে যশোরের কুখ্যাত পুলিশ সুপার প্রশাসন কর্তৃক অত্যাচারিত হয়েছিলেন। বর্তমান নড়াইল খেয়াঘাটের উপরে যে ষ্টিমার ঘাট ছিল ওর কাছেই নড়াইল কংগ্রেস অপিস ছিল। এলিসন ঐ কংগ্রেস অফিসটি বিনষ্ট করেন।[৪৪]

১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে গোপালগঞ্জের প্রমথরঞ্জন ঠাকুর বা পি আর ঠাকুর দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে নড়াইলের মহকুমা প্রশাসকের ক্রোধের কারণ হয়েছিলেন। তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নড়াইল ত্যাগের আদেশ দিয়েছিলেন মহকুমা

প্রশাসক।[৪৫]

নড়াইলের জমিদার পরিবার নিয়মতান্ত্রিক কংগ্রেসের রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। নড়াইলের এক জমিদার ভবেন্দ্রনাথ রায় ও হাটবাড়িয়ার জমিদার নলিনীকান্ত রায় ব্রিটিশ আমলেই এম এল সি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত নামের দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। প্রেসিডেন্সির বিশাল অংশ বৃহত্তর যশোর জেলা তথা বর্তমান নড়াইল জেলা পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব বাংলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু খুব বেশি দিন অতিবাহিত হতে না হতে পাকিস্তানি শাসকদের বিমাতা সুলভ আচরণ বাঙ্গালিকে ব্যথাহত করে। এই ভাবে ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলন শুরু হয় যারা ধারাবাহিকতা বেয়ে ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

তথ্যনির্দেশ

১. যশোরাদ্যাদেশ, হোসেনউদ্দিন হোসেন, পৃ. ১৬৫-১৬৬
২. মোঃ সাঈদুর রহমান (৪০), অধ্যাপক, লোহাগড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয় লোহাগড়া
৩. ড. ওসমান গনি (৯০), লক্ষ্মীপাশা, থানা: লোহাগড়া
৪. মোঃ সাঈদুর রহমান (৪০), অধ্যাপক, লোহাগড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয় লোহাগড়া
৫. মোঃ দবিরউদ্দিন (৬১), মল্লিকপুর, লোহাগড়া
৬. জয়নাল আবেদীন ইতনা, থানা : লোহাগড়া
৭. হারুন জমাদ্দার (৫২), সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান, লাহুড়িয়া, থানা : লোহাগড়া
৮. কালিয়া উপজেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মহসিন হোসাইন, পৃ. ৬৯
৯. প্রাগুক্ত, ৬৮
১০. প্রাগুক্ত, ৬৭
১১. প্রাগুক্ত, ৬৭
১২. রসময় সরকার (৬০), কবিয়াল, সুমেরু খোলা, নড়াইল
১৩. আউয়াল ডাক্তার (৬০), ইউ পি মেম্বর, থানা : কালিয়া
১৫. মানিক বিশ্বাস (৪৬), সাবেক ইউ পি চেয়ারম্যান, মাউলি, থানা : কালিয়া
১৫. শেখ জমিরউদ্দিন (৭৪), ব্যবসায়ী, ঘোড়াখালি, থানা : নড়াইল
১৬. মুঃ সিরাজ মিয়া (৫৪), হাটবাড়িয়া, থানা : নড়াইল ১৯৮৮
১৭. ফেদি নীল কুঠির কর্মচারি
১৮. শেখ জমিরউদ্দিন (৭৪), ব্যবসায়ী, ঘোড়াখালি, নড়াইল
১৯. মুহম্মদ দবিরউদ্দিন (৬২) নড়াইল
২০. অনুপম ভট্টাচার্য (৫০), গ্রাম : মাইচপাড়া, নড়াইল, ১৯৮৭
২১. ডা. ওসমান গণি (৯০), গ্রাম : লক্ষ্মীপাশা, নড়াইল

২২. যশোরাদ্যাদেশ, হোসেনউদ্দিন হোসেন, পৃ. ১৫৮
২৩. যশোরাদ্যাদেশ, হোসেনউদ্দিন হোসেন, পৃ. ১৫৮
২৪. মোঃ সাঈদুর রহমান (৪০), অধ্যাপক, লোহাগড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয় লোহাগড়া
২৫. বাগু খালাসি (৮০), রাজাপুর লোহাগড়া, ১৯৮৬
২৬. ইশারাত খালাসি (৮৮), কাশিপুর, লোহাগড়া
২৭. হারুন জমাদ্দার (৫৫), লাহুড়িয়ার সাবেক ইউ পি চেয়ারম্যান, লোহাগড়া
২৮. লোকমান মোল্যা (৯০), কলাবাড়িয়া থানা : কালিয়া
২৯. কালিয়া উপজেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মহসিন হোসাইন, পৃ. ৭২
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
৩১. শতাব্দীর সাক্ষী, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, পৃ. ১৮
ও যশোহর খুলনার ইতিহাস (১ম খণ্ড), শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পৃ. ৭৬৯,
৩২. খোন্দকার নজরুল ইসলাম (৬৪), লোহাগড়া
৩৩. ডা. ওসমান গনি (৯০), লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া
৩৪. খোন্দকার নজরুল ইসলাম (৬৪), লোহাগড়া
৩৫. শেখ মুহম্মদ নূরজালাল (৯০), তেভাগা আন্দোলনের নেতা, দুর্গাপুর, থানা : নড়াইল, ১৯৮৪
৩৬. প্রাগুক্ত
৩৭. কালিয়ার কথা, ডা. নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ১৯৬৫
৩৮. আবদুল মান্নাফ মোল্লা (৯০), সাবেক ইউনিয়ন বোর্ড চেয়ারম্যান, কলাবাড়িয়া, কালিয়া
৩৯. শেখ আবদুল হালিম (৭৫) ও শেখ দেলোয়ার হোসেন (৭৭) গ্রাম : কলাবাড়িয়া, থানা : কালিয়া
৪০. আবদুর রাজ্জাক মিয়া (৩৬), কলাবাড়িয়া, থানা : কালিয়া, ১৯৬৮
৪১. কালিয়ার কথা, ডা. নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, কলিকাতা, ১৯৬৫
৪২. কালিয়া উপজেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পৃ. ১১৫
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
৪৪. শতাব্দীর সাক্ষী, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৮
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮ঃ

আর্থ-সামাজিক বিবরণ

নড়াইল জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সমগ্র দেশেব আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে নৃ-তাত্ত্বিক, ভৌগলিক ও আবহাওয়াগত কারণে নড়াইলের জনগণের সমাজ চিন্তা, সমাজ বিকাশের ধারা ও অপরাধ প্রবণতা ও ভিন্নতর। আমরা সেই সব বিষয়ে এখানে আলোচনা করবো :

সামাজিক অবস্থা ও উন্নয়ন প্রয়াস

সংখ্যায় অতি সামান্য লোক ছাড়া নড়াইল জেলার ৩টি থানার অধিকাংশ পরিবারই নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র। জেলায় মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা অল্প। ইংরেজ শাসনামলে যে মধ্যবিত্ত ভূ-স্বামী শ্রেণীর লোক এই জেলায় বসবাস করতেন তারা ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ ও ১৯৫১ সালের জমিদারি প্রথা বিলোপ হওয়ার কারণে পূর্বের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন। এই জেলার অধিকাংশ লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল। ভূমির ওপর নির্ভরশীল লোকদের ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। এরা হলো, ১. ভূমির মালিক ২. বর্গাচাষি ৩. কৃষি দিন মজুর। ভূমি মালিকেরা অনুপস্থিত তারা শহরে সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। আর বর্গাচাষিরা অনুপস্থিত মালিকদের ফসলের 'বাজভাগ' দিয়ে কোনো ভাবে কায়ক্লেশে জীবন যাপন করে। আর ভূমিহীন দীন মজুর ও বর্গাচাষিরা জীবনযাপন করে অনাহারে অর্ধাহারে। চাষ-বাস শেষ হয়ে গেলে গ্রামের কৃষি-মজুরেরা প্রায় বেকারজীবন যাপন করে। এরা চিরকালই দরিদ্র সীমার নিচে থাকছে। এছাড়া আরো কিছু পেশার লোকজন রয়েছে যারা জন্মগতভাবে পারিবারিক পেশাকে আশ্রয় করে কায়ক্লেশে বেঁচে আছে–এরা হলো, জেলে, মালো, কড়াল, তাঁতি, কুলু, বাগদি, বাউতি, পাল, ঘোষ, কামার, কুমার, ভূঁইমালিতা, ধাউড়িয়া, দাই, ধোপা, বেদে, প্রামাণিক, বারুজীবী, ঋষি, মুচি, মেথর, মুর্দাফরাস, বুনো, বাগদি, মেটেল, বাজনদার ইত্যাদি।

সমাজে আরেক শ্রেণীর লোক আছে যারা অর্থলগ্নির কারবার করে থাকে। এরা সুদখোব হিসেবে সমাজ ঘৃণিত হলেও দরিদ্র লোকেরা এই সুদখোরদের সহযোগিতা নিতে বাধ্য হয়। প্রাকৃতিক অবস্থান, চাষযোগ্য জমির পরিমাণ, জনবসতির ঘনত্ব, জনসাধারণের চরিত্র, সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা, নড়াইল জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই শর্তসমূহ পালিত হলে নড়াইলবাসীর উন্নয়নও হতে পারে সহজে। নড়াইল জেলার নবগঙ্গা, মধুমতি ও নলিয়া নদীর ভাঙ্গন জেলার কিছু এলাকার মানুষের দুঃখ কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সময় যে স্থানসমূহে কোনো কালে নদী প্রবাহিত হতো সেই স্থানসমূহ বিস্তৃত বালুরাশি বিদ্যমান থাকায় ফসলাদি উৎপাদনের বিশেষ কোনো উপযোগিতা নেই। নড়াইল জেলার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে দুটো পদ্ধতিতে নেওয়া যায়। তা হলো, ১. ঐতি[illegible] ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে সমগ্র

কৃষি কর্মকাণ্ডকে এবং প্রকৌশলগত পদ্ধতিতে শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্যও সাধারণের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নয়নের মধ্যে গণ্য করা।

অপরাধ ও অপরাধ প্রবণতা

মনুষ্যসমাজ বিকাশের সাথে সাথে তার আদিম পাশবিকবৃত্তি দমনেও চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তবু সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের পাশাপাশি অপরাধ প্রবণতাও বিদ্যমান। ১৮৬৮ সনে ড. মেয়াট তার এক প্রতিবেদনে বলেছিলেন, 'এ অঞ্চলের (বর্তমান নড়াইল জেলাসহ) প্রধান অপরাধ সমূহ খুন, গুরুতর জখম, জালিয়াতি, চুরি, চোরাই মাল রাখা। সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকের অধিক অপরাধপ্রবণ ছিল, এখন প্রায় সোয়া শত বছর পরেও বোঝা যায়, এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার কোনো রকম হেরফের হয় নাই। মস্তিষ্কের উৎকর্ষতার ফলে উন্নত পন্থায় মানুষকে আরো অপরাধমুখী করেছে। মি. মেয়াটের মন্তব্য ছিল, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অপরাধ প্রবণ। বর্তমান এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। নিম্নশ্রেণীর লোকের সাথে উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও অপরাধী হয়ে উঠেছে। এখন ভদ্র ঘরের ধনীর সন্তানেরাও মারাত্মক অপরাধী হয়ে উঠেছে। তুলনামুলক বিচার করলে দেখা যায়, বৃহত্তর যশোর জেলার কম অপরাধ প্রবণ এলাকা নড়াইল। যশোর সীমান্তবর্তী এলাকায় অপরাধের প্রবণতা বেশি। তবু জেলার ৩টি থানায় কিছু না কিছু খুন, দাঙ্গা, চুরি-চামারি, রাহাজানি, বিস্ফোরক ব্যবহারের সংবাদ শোনা যায়। সংখ্যায় সীমিত হলেও জেলার কিছু সংখ্যক লোক থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাচারিতে বিশেষ অভ্যস্ত। তাদের জন্মগত অপরাধী বললেও খুব বাড়িয়ে বলা হয় না।

নড়াইল জেলার অপরাধীদের যে সমস্ত কারণ অপরাধপ্রবণ করে তুলছে তা হলো:

১. মধুমতি ও নবগঙ্গা ভাঙ্গনের ফলে নদীর তীরবর্তী লোকেরা যেমন গৃহহীন হয় আবার কোনো এক সময় এ স্থানে নতুনচর উঠলে দুর্বল জমির মালিকের প্রতি সবলের জুলুম নামে। তাই জোরপূর্বক জমি দখল নিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়।

২. জেলার বিভিন্ন গ্রাম ও জনপদে ক্ষমতাবানদের গোষ্ঠীগত ও আঞ্চলিকতা কেন্দ্রীক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা আছে সেই প্রাচীন কাল থেকে। দেখা যায়, কোনো এলাকার দুজন ক্ষমতাবান লোকের প্রতিযোগিতায় দুটো লেঠেল পক্ষ দাঁড়িয়ে যায়। দরিদ্র সাধাবণ মানুষ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কোনো না কোনো দলে যোগদান করে। এরপর স্বাভাবিক হয়ে উঠে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও খুন জখম।

৩. বাংলাদেশের অন্যতম শিল্পনগরী খুলনা-খালিশপুর। এখানে বিভিন্ন জেলার পলাতক আসামীর আত্মগোপন করার কারণে খুলনার বিভিন্ন শিল্পকারখানায় শ্রমিকের কাজে নিয়োজিত হয়। ঐ পুরানো অপরাধীরা স্থানীয় অপরাধীদের সহযোগিতায় নড়াইল জেলার বিভিন্ন এলাকায় চুরি-ডাকাতি, খুন-জখম ঘটিয়ে থাকে।

৪. ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরে অনেক সংখ্যক হিন্দু পরিবার এলাকা ত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। ১৯৬৫ সালে তাদের জমি শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তি

ঘোষিত হলে ঐ জমি দখলে নেওয়ার জন্য এক শ্রেণীর লোক জাল জালিয়াতির আশ্রয় নেয়। এ থেকেও সৃষ্টি হয় অপরাধ।

৫. জনসংখ্যা স্ফীতির কারণে জেলার দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এই দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে কিছু সংখ্যক লোকজীবনের তাগিদে রাজনৈতিক টাউট বা গ্রাম্য টাউটদের ছত্রছায়ায় অপরাধ করে চলেছে।

৬. সমাজে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা, শাহারায়ন ও শিল্পায়নের প্রত্যক্ষ প্রভাবে নড়াইল জেলাবাসীর মধ্যে অসহিষ্ণুতা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দিয়েছে। ব্যক্তিস্বার্থ চিন্তা ও পর মতের প্রতি সমমর্মিতা না থাকায় সামাজিক সংঘাত ও মামলা মোকর্দমা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া গরুর লড়াই, ঘোড়া দৌড়, হাডুডু কিংবা ফুটবল খেলার মতো চিত্তবিনোদনমূলক বিষয়কে কেন্দ্র করেও দাঙ্গাহাঙ্গামা হতে দেখা যায়। এমন কী যাত্রা জারিগান পরিবেশন কেন্দ্রীক দাঙ্গা ও হতে দেখা যায়।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

"আদম হাওয়া যখন 'হলকর্ষণ' এবং 'সুতাকাটা' শুরু করেন তখন শুরু হয় সংস্কৃতির যাত্রা"। এই হলো সংস্কৃতি সম্পর্কে পণ্ডিতদের বক্তব্য। হৃদয় বা চিত্তকে অনাবিল আনন্দ দিতে বাহ্যিকভাবে যা কিছু করা হয় বা করা যায় তা-ই সংস্কৃতি। কিংবা জীবন ধারণ, জীবন যাপন তথা সমাজ পরিচালনার জন্য যে সমস্ত কর্মকাণ্ড করা হয় তাকে সংস্কৃতি বলা চলে। গবেষক-পণ্ডিতের অভিমত, 'সংস্কৃতি হলো চিৎ প্রকর্ষের বহিঃপ্রকাশ'। চিত্তবিনোদনের অসংখ্য মাধ্যমের সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে ক্রীড়াচর্চা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। নড়াইল জেলায় প্রাচীনকাল হতে পুরুষ ও নারী তথা মহিলাদের মধ্যে যে সমস্ত ক্রীড়ার প্রচলন রয়েছে। তা হলো, হা-ডু-ডু, কুস্তি, পাঞ্জালড়াই, দাঁড়িয়াবাঁধা, গোল্লাছুট, ফুটবল, লাঠিখেলা, সড়কিখেলা, ছোরাখেলা, বর্শাখেলা, তাসখেলা, পাশাখেলা, দৌড়, লম্ফ, ব্যাডমিন্টন, টেবিলটেনিস, বাঘবন্দি, পাইত-পাইত, কানামাছি ভো- ভো, লুডো, কেরাম, বুড়িচি, পলাপলি, কপালঠোকর, চাড়া গুটগুট, ইটেল গুটগুট, আচাঘুটি খেলা, হোইলডুব, কয়ার ইত্যাদি।[১] এছাড়া কিছু আনুষ্ঠানিক খেলা প্রচলিত আছে তা হলো ষাঁড়ের লড়াই, গরুর লড়াই, ঘোড়দৌড়, নৌকাবাইচ ইত্যাদি।

দেশ বিভাগের আগেই নড়াইল জেলায় উন্নতমানের ফুটবল চর্চা হতো। নড়াইল জেলার বিভিন্ন ফুটবল টিম যশোর এমনকি কোলকাতায়ও বড়ো বড়ো ক্লাবের সাথে খেলাধুলা করেছে। লোহাগড়া থানার কালনা গ্রামের মন্মথ দত্ত কোলকাতার মোহনবাগানের বিখ্যাত ফুটবলার ছিলেন। মন্মথের ভাই সম্মথ দত্ত মোহনবাগানে খেলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সম্মথ দত্ত এক সময় মোহনবাগানের ক্যাপটেনও ছিলেন। ঐ সময় লোহাগড়ার ফুটবলারদের মধ্যে খ্যাতিমান ছিলেন মল্লিকপুরের কানু সরকার, ইতনার কেনা পরামানিক ও আহমদ সরদার। দেশবিভাগের পরে লোহাগড়ার লালচান সরকার ও কাশীনাথ সরকার ফুটবলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[২]

কালিয়া থানার বিখ্যাত ফুটবলার ছিলেন কলাবাড়িয়া গ্রামের শেখ আবদুল হাশেম। তিনি কোলকাতার মোহামেডানের বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন। একবার তিনি আই এফ আই সি-র চ্যাম্পিয়ন কাপ পেয়েছিলেন। একই গ্রামের মুহম্মদ নূরুল হক মোল্যা কোলকাতা মোহামেডান দলের বয়েজ টিমে খেলবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

মুসলমান সম্প্রদায় থেকে জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের নরনারীর মধ্যে সঙ্গীতের প্রচলন রয়েছে বেশি। কারণ হিসেবে বলা যায়, সঙ্গীতকে সনাতন ধর্মের বড়ো মাধ্যম হিসেবে প্রাচীন কাল থেকে গণ্য করা হয়। হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ 'সামবেদ' তো সঙ্গীতেরই সংকলন। ইসলামে সঙ্গীতকে তেমন প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। তবু নানা প্রতিকূলতার মধ্যে নড়াইল জেলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যেও সঙ্গীতের চর্চা রয়েছে। নড়াইল জেলায় যে সব সঙ্গীত কম বেশি প্রচলিত আছে তা হলো : ভাবগান, ভাটিয়ালিগান, ধুয়াগান, গজল, হালোই গান, রূপবান যাত্রা, রামায়ণ, রামযাত্রা,

ত্রিনাথের গান, নীলের গান, অষ্টক গান, নামযজ্ঞ, পদকীর্তন, হরিসংকীর্তন, বারাসিয়া, বারোমাসী, হাবোইড়, সয়েলা, মুর্শিদী, সারি, হুলিয়ানামা ইত্যাদি।

মুসলিম মহিলাদের গান শোনার ও পরিবেশনের কোনো সুযোগ নেই। কোথাও কোথাও বিয়ে উপলক্ষে মুসলিম মহিলারা বিভিন্ন রকম বিয়ের গান বাড়ির অন্দর মহলে পরিবেশন করে থাকেন। এ ছাড়া বাড়ির লোক কিংবা নিকট-আত্মীয়দের পাঠ করা পুঁথি শুনতে মুসলিম মহিলারা আকর্ষণ বোধ করেন। নড়াইল জেলায় পঠিত জনপ্রিয় পুঁথি-কেতাব হলো : 'সোনাভান', 'গাজি-কালু-চম্পাবতী', 'বীরেগগুরু', 'ইউসুফ জুলেখা', নসিবননামা', 'আমির হামজা', 'সোহরাব-রুস্তম' ইত্যাদি।[৩] মুসলিম ও হিন্দু রমণীদের মধ্যে শিশুদের নিয়ে 'রূপকথা ' বা 'লোককেচ্ছা' বলাও শোনার প্রবণতা আছে। নড়াইল জেলার মুসলমান সমাজে প্রচলিত কয়েকটি লোককেচ্ছার নাম উল্লেখ করা হলো : 'আয়নামতি', 'মদনকুমার', 'মধুবালা', 'কংকনশা' 'আবদুল কুড়ে', 'পাচোচোর', 'নীলপরি-নিদ্রাপরি', 'আসমানসিংহের কিচ্ছা', 'কমলাসুন্দরী', 'ডালিমকুমার', 'নীলচানবাদশাহ' ইত্যাদি।[৪]

নড়াইল জেলাব হিন্দু রমণীরা যে সমস্ত গানের চর্চা করে থাকেন তা হলো : 'জাগরণের গান', 'মানতের গান', 'কুলোস্নানের গান', 'বিয়ের গান', 'গার্শ্বির গান', 'এ্যাচড়া পূজোর গান', মাধবমালঞ্চের গান ইত্যাদি।[৫] হিন্দু রমণীদের মধ্যে যে সব 'রূপকথা' বা লোককেচ্ছার প্রচলন রয়েছে সেগুলো হলো : 'পংখিরাজঘোড়া', 'মাসন্ধ্যে', 'লেবুসুন্দরী', 'তুলোসুন্দরী', 'কমলাসুন্দরী', 'লালচান আর নীলচান', 'উলোই পূজার রূপকথা' ইত্যাদি।[৬] হিন্দু রমণীরা তাদের বিভিন্ন পার্বণে গান গেয়ে ও পাঁচালি পাঠ করে থাকেন। এদের ধর্মীয় আচরণের সাথে চিত্তবিনোদনের বিশেষ সুবিধা রয়েছে। হিন্দু রমণীরা 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'মনসামঙ্গল' 'লক্ষ্মীর পাঁচালি' 'শীতলার পাঁচালি', 'চণ্ডির পাঁচালি', 'শ্রীকৃষ্ণের শত নাম' 'হরিলীলামৃত', 'মনসামঙ্গল' প্রভৃতি পাঠ করেন। এছাড়া কুলোই পূজোর গান; শুভচণ্ডির ব্রত, 'খাড়াপুলির ব্রত', লক্ষ্মীর ব্রত, 'বৈঠাকুলির ব্রত' বলা ও পালনের কথা জানা যায়।[৭]

জেলার হিন্দু ও মুসলিম রমণীরা প্রাচীনকাল হতে বিচিত্র ধরনের অলঙ্কার ব্যবহার করে আসছেন। এখানে প্রাচীন কালের ও বর্তমান কালের অলঙ্কারসমূহের নাম উল্লেখ করা হলো : মণিপুরি হার, তেতুলবিছে হার, কাঁকড়াবিছে হার, কামরাঙা হার, লকেটহার, চেন, কানপাশা, ঝুমকো, মাকড়ি, সাগরিকা রিং, কলেজ রিং, সিলারিং, পাতাবাহার রিং, বলরিং, কানফুল, টপ, বালি, নাকফুল, নথ, ঝুমকি, নাকচাপা, নোলক, নাকের ডাল, বাইশকাটা, মুণ্ডা, শিকলনথ, রুলি, কংকন, চূড়, ঝুরোচুড়ি, খাড়ু, বাঁধাচুড়ি, হাতভাবিজ, ছড়মল, আমলেট, বাজু, বাউটি, বালা, পলা, সখের খাড়ু, আংটি মিনে করা আংটি, পাথরসেট আংটি, মাজার বিছে, কপালের টিপ, টিকলি, টায়রা, সিঁথিপাটি, প্রজাপতি টিকলি, পাথরসেট টিকলি, মুক্তা টিকলি, কাচ ও প্লাস্টিকের চুড়ি, রিবন, ক্লিপ, খোপার কাটা, আংগুল চটকি, পায়ের মল, ছড়ামল প্রভৃতি।[৮] উল্লিখিত অলঙ্কারসমূহ সোনা ও রূপা দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে। গ্রামের মেয়েরা বিভিন্ন জাতের বুনোফুল গুজে দেন তাদের খোঁপায়। বিভিন্ন রঙের ফিতা দিয়ে বাঁধেন তারা মাথার চুল। মহিলা ও পুরুষেরা বিভিন্ন রকমের সুগন্ধী তৈল, সাবান, স্যাম্পু, আতর ও সেন্ট ব্যবহার

করে থাকেন। মুসলমান মহিলাদের চিত্তবিনোদনের সুযোগ একেবারে কম। তাই তাঁরা কাজের ফাঁকে বিকেল বেলায় চুলবিলি দেওয়ার জন্য সারি বেঁধে বসে যান। চুলবিলি দিতে দিতে তাঁরা সাংসারিক সুখ- দুঃখের কথায় মেতে ওঠেন।

আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে বিশেষত দেশে শিল্পায়ন ও শহরায়নের প্রভাবে পরিবর্তিত হতে চলেছে দেশের সাংস্কৃতিক ও চিত্তবিনোদনের ধারা। তাই দেখা যায়, নড়াইল জেলার গ্রামেগঞ্জে পর্যন্ত টিভি, ভিসিআর, ভিসিপি ও প্রেক্ষাগৃহ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। জেলার বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে ক্লাব, লাইব্রেরি, ৪টি প্রেসক্লাব, নাট্যদল, যাত্রাগানের দল, কবিগানের দল, ভাবগানের দল ও জারিগানের দল। এই সব মাধ্যমের দ্বারা জনসাধারণ চিত্তবিনোদনের সুযোগ পায়।

নড়াইল জেলার বিখ্যাত কবিয়াল, জারিয়াল ও ভাবগানের বয়াতিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কবিয়াল রাজমোহন তাঁতি, কবিয়াল তারক সরকার, বয়াতি মোক্তাদের ফকির, বয়াতি মসলেউদ্দিন, চারণকবি প্রফুল্ল গোঁসাই, কবিয়াল বিজয় সরকার, সোনাউল্লাহ বয়াতি ভাববয়াতি হাবিবুর রহমান, ভাববয়াতি পাঁচু ফকির, কবিয়াল রসময় মালো, চারণকবি মুন্সি মোজাহার, পুঁথিকবি হাফেজ আবদুল করিম প্রমুখ।[৭]

নড়াইলের সাংস্কৃতিক জীবন খুবই সমৃদ্ধ। জেলার আয়তন ও লোকসংখ্যা স্বল্প হলেও এই ভূখণ্ডেই কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর, বিশ্ববিখ্যাত সেতারি রবিশংকর, বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী শেখ মুহম্মদ সুলতান (লাল মিয়া), প্রাচীন কবি ও সাহিত্যিক গুরুনাথ সেন, বিখ্যাত সুরকার-কণ্ঠশিল্পী কমল দাশগুপ্ত, বিখ্যাত সুরকার সুবল দাশগুপ্ত, পত্রিকা সম্পাদক ও প্রাচীন আইনজীবী যদুনাথ মজুমদার, গিটারবাদক এনামুল কবীর, সাহিত্যিক নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রমুখ।

নড়াইলের যাত্রা ও নাটক রচয়িতা হিসেবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম নেওয়া অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ বিখ্যাত হয়ে আছেন। সিনেমার কাহিনীকার জলধর চট্টোপাধ্যায় ও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। আশির দশকের যাত্রা পালা ও যাত্রার গান রচনা করে যাত্রাদলের অভিনেতা হিসেবে কাজ করেছেন মহসিন হোসাইন। তিনি কালিয়ার জোনাকি যাত্রাদল ও গোপালগঞ্জের নরনারায়ণ অপেরা'র অভিনেতা ছিলেন। তিনি চলচ্চিত্র ও টিভিতেও অভিনয় করেছেন। লোহাগড়ার রামনারায়ণ পাবলিক লাইব্রেরি, নড়াইল পাবলিক লাইব্রেরি, কালিয়া পাবলিক লাইব্রেরি, ইতনার গণসাহিত্য সংসদ শিক্ষা বিস্তারে অনুকূল ভূমিকা রেখে চলেছে।

আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে শিংগাশোলপুর গ্রামে গড়ে ওঠে অজিত শিকদারের অর্থানুকূল্যে সত্যম্বর অপেরাপার্টি। নারাণদিয়ার বিশ্বাস ব্রাদার্স যাত্রাদলও প্রাচীন। ইতনায় শ্রী সত্যশরণ গুহ দস্তিদার একটি নাট্যশালা স্থাপন করেন দেশ বিভাগের আগে। কালিয়া নাট্যশালাও সেই যুগে বিখ্যাত ছিল। এ ছাড়া রেজিস্ট্রিকৃত নয় এমন অনেক যাত্রাদল নড়াইল জেলায় গড়ে উঠেছিল। এবং কিছু কিছু যাত্রা ও থিয়েটার দল আজো টিকে আছে।

প্রাচীনকালেই নড়াইল জেলায় সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা সূচিত হয়। সেই সব প্রাচীন তথ্য আজ সংগ্রহ করাও সহজ নয়। তবে তার ছিটেফোটা সংবাদ পাওয়া যায়। জানা

যায়, সুলতানি শাসনামলে যশোরের নিষ্ঠাবান পণ্ডিত ব্রাহ্মণ দ্যাকরের পৌত্র ধর্ম তালেশ্বর গ্রামে বসবাস শুরু করেন। ধর্মের প্রৌপুত্র গোবিন্দ। এবং গোবিন্দের পুত্র বিখ্যাত পণ্ডিত পদ্মনাভ চক্রবর্তী ১৪৪০ সালে তালেশ্বরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৈষ্ণবগুরু শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের (১৪৩৪ সালে জন্ম) সমসাময়িক ও তাঁর শিষ্য হন। পদ্মনাভ (পরমানন্দ) ইসলাম ধর্মের পিরালি সম্প্রদায়ের সম্পসারণে তালেশ্বর ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী বর্তমান মাগুরা জেলার তালখড়িতে অবস্থান করেন। তাঁর বিখ্যাত পুত্র সুপণ্ডিত পরম বৈষ্ণব লোকনাথ গোস্বামী। লোকনাথ ১৪৮৩/৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যের মন্ত্রশিষ্য। শ্রীচৈতন্য সিলেট ভ্রমণকালে এই তালখড়িতে কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন।[১০] লোকনাথ গোস্বামীর একমাত্র শিষ্য মধ্যযুগের 'প্রেম-বিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা কবি শ্রী ঠাকুর নরোত্তম দাস। পদ্মনাভ ও লোকনাথ গোস্বামী বাংলার ভক্তিসাহিত্যে বা পদসাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছেন।

মঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি 'সারদামঙ্গলের' রচয়িতা কবি মুক্তারাম সেনের প্রপিতামহ যাদব রামের জন্মভূমি নড়াইলের কালিয়া। সুলতানি শাসনামলে দুই সহোদর যাদবরাম ও মাধবরাম চট্টগ্রামে তীর্থদর্শনে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি। তাঁরা চট্টগ্রামের দেবগ্রাম বা আনোয়ারায় বসতি স্থাপন করেন। আজো তাঁদের বংশধরেরা ওখানকার বৈদ্যকুলিন বলে খ্যাত। কবি মুক্তারাম সেনের জন্মকাল ১৬১৮ সালে বলে জানা যায় মুক্তারাম সেনের রচনার মধ্যে আমরা যশোর জেলার কালিয়া গ্রামের (বর্তমান কালিয়া থানা) কথা জানতে পারি। এখানে তাঁর রচনার উদ্ধৃতি দেওয়া গেল :

শ্রীযুক্ত যাদবরায় শম্ভুদর্শন কাম্যয়া
সাধং শ্রীমন্ত ভৃত্যেন চট্টলে চন্দ্রশেখর॥

যশোহরৎ সমায়াত: কালিয়া গ্রামত খলু
তদ্র ভ্রাতা মাধবরায় স্তত্রৈবাত্ম পুরোহিত॥

নাম্না শ্রীলক্ষ্মী কান্তোহসৌ ন্যায়লংকান সংকট
যাদবেন সহায়াতৌ তীর্থ দর্শন মানসৌ॥[১১]

বাংলার সুবাদার আলিবর্দি খানের শাসনামলে আল কুরআনের অনুবাদক মৌলভি ভাই গিরীশচন্দ্র সেনের পূর্বপুরুষ কালিয়ার বেন্দাগ্রাম হতে চাকুরি উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ অবস্থান করেন। তিনিও বিশিষ্ট ফার্সি পণ্ডিত ছিলেন।

মুঘল শাসনামলের শেষদিকে নড়াইল জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা কালীশংকর দত্তের পিতা রূপরামের সহোদর গঙ্গারাম দত্ত প্রাচীন কবিদের অন্যতম। কবি গঙ্গারাম দত্তের বংশধরেরা আজো নড়াইলে অবস্থান করছেন।[১২]

নড়াইলের জমিদারেরা বিশাল প্রতিপত্তি ও আর্থিক শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁরা নানা ভাবে সাধারণ মানুষের উপকারও করতেন। জনকল্যাণের প্রতি জমিদারদের একটি প্রবণতা ছিল। সংস্কৃতির প্রতিও তাঁদের যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। তাঁরা যেমন গ্রামীণ মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্য যাত্রা, জারি, কবি, রামায়ণ গানের আয়োজন করতেন তেমনি আবার কোলকাতা, লাক্ষ্ণৌ ও পাটনা হতে বিভিন্ন সঙ্গীতের ওস্তাদদের নড়াইলের

জমিদার বাড়ি কিংবা তাঁদের বিভিন্ন কাচারিতে এনে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন।

১৮৮৭ সাল মুতাবিক ১২৯৪ সনে নড়াইলের জমিদারদের দুইজন নায়েবের লিখিত পত্রে জানা যায়, ওস্তাদ নেসারখাঁ এসেছিলেন নড়াইলের জমিদারদের আমন্ত্রণে সঙ্গীত পরিবেশন করতে। ওস্তাদ নেসার খাঁ ছিলেন অযোধ্যার (লাক্ষ্ণৌর) নবাবের সভা গায়ক। পত্রে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কলাবাড়িয়ার মুসলিম জমিদার মুহম্মদ জকি মোল্লাহর পুত্র মর্দান মিয়াকে। এখানে আমরা পত্রখানি অবিকল উদ্ধৃত করছি :

ওঁ শ্রী শ্রী কালী

সন ১২৯৪

মেহেরবানেষু।

অদ্য রাত্র ৭৷৷০ ঘটিকার সময় আমাদিগের পক্ষ হইতে নড়াইলের জমিদারদিগের অত্রস্থ বাদ্যবাটিতে মৃত লাক্ষ্ণৌয়ের নবাব বাহাদুরের প্রতিপলিত সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ শ্রী নেশার হোসেন খাঁ প্রভৃতির সুরবীণ, সুরঝংকার, সুরকায়, বাদন ও গীতাদি হইবেক মহাশয় সবান্ধবে আগমন পূর্বক বিলুপ্তপ্রায় সঙ্গীতবিদ্যায় উৎসাহ বর্দ্ধণ করবেন ইতি–সন ১২৯৪/২ চৈত্র

শ্রীরামলাল মহুরী

শ্রীদক্ষিণা প্রসাদ দাস[১৩]

বাংলায় মুসলমান আগমনের আগে হিন্দু সম্প্রদায় তালপাতা, ভুর্জপত্র ও বাকলে লেখালেখি করতেন। তাদের বিদ্যার্জনের মাধ্যমে ছিল সংস্কৃত টোল। টোলের ব্রাহ্মণ আচার্যেরা হিন্দু অন্ত্যজশ্রেণীর ছাত্রদের লেখাপড়া শিখাতেন না। এই কারণে সেন শাসনামলে সাধারণ মানুষের লেখাপড়ার তেমন সুযোগ ছিল না। আমরা জানি ত্রয়োদশ শতাব্দীর ৩ কিংবা ৪ সনে ইখতিয়ারউদ্দিনের মাধ্যমে বাংলা বিজিত হয়। এর কিছুদিনের মধ্যে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় লেখালেখিতে কাগজের প্রচলন শুরু হয়।[১৪] এরপর থেকে সংস্কৃত সাহিত্য ও সান্ধ্যভাষার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা বাংলা ও সরকারি ভাষা হিসেবে ফারসি প্রাধান্য পায়। ফারসি ভাষার প্রচলন ছিল সারা ভারতবর্ষে শত শত বছর ধরে। ফারসি হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়েরই প্রয়োজনীয় ভাষা ছিল। সারা সুলতানি আমল ও মুঘল আমলে ফারসি ছিল সরকারি ভাষা। রাষ্ট্রীয় সব কাজকর্ম দলিল দস্তাবেজ যেমন ফারসিতে লেখা হতো তেমনি সব শ্রেণীর লোক ফারসি ভাষায় শিক্ষিত হয়ে শাহি সরকারে চাকুরি লাভের চেষ্টা করতো। বাংলার হিন্দু মুসলমানের ফার্সি শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন আরবি–ফার্সি শিক্ষিত মুসলমান আলেম-মৌলনা-মুন্সিরা। 'পাঠান আমলের শেষ ভাগ হইতে মুসলমানেরা গুরুগিরিতে বিশেষ দক্ষ হইয়াছিলেন। তখন হিন্দুর বাড়িতেও মুসলমান গুরু রাখিবার প্রথা আরম্ভ হইয়াছিল। বুড়ন পরগণা নিবাসী পীরালি মুসলমান গুরুমহাশয়গণ 'বুড়নীর খাঁ' সাহেব নামে হিন্দুর পাঠশালায় শিক্ষকতা করিয়া ছাত্রবর্গের ভয়ভক্তি আকর্ষণ করিতেন। হিন্দু অধ্যাপকেরা কখনও নিম্ন বা অপর জাতিকে সংস্কৃতি শিখাইতেন না। পড়িবার পুঁথিপত্র সমস্তই তালপত্রে লিখিত হইত।[১৫]

প্রাচীনকালে নড়াইল জেলার মাচদিয়া, লোহাগড়া, নলদির সন্নিকটে ও নড়াইলে সংস্কৃত টোল ছিল বলে জানা যায়। এইসব টোলে শুধু বর্ণ হিন্দু ছাত্ররাই পড়াশুনা করতে পারতো। তবে লোহাগড়ার রাজাপুর গ্রামের মুসলমান মোল্লা পরিবারের কাছে হিন্দু মুসলমান সব ধর্মের ছাত্ররাই আরবি-ফারসি বাংলা ভাষা শিক্ষা করতে পারতো। কালিয়া থানার বাঐসোনা গ্রামের লস্করবাড়িতে তেমনি একটি আরবি-ফারসি ও বাংলা শিক্ষা গ্রহণের মক্তব বা বিদ্যালয় ছিল। লোহাগড়া থানার লাহুড়িয়ায় প্রাচীনকালে মক্তব ছিল। কোম্পানি সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত কোম্পানির সরকারি ভাষা ছিল ফারসি। কাগজে কলমে ফারসি ভাষা উঠে গেলেও আরো কিছুকাল ধরে ফারসিতে দলিল দস্তাবেজ হিসেব-নিকেশ ও চিঠিপত্র লেখা হতো। যশোরের কৃতিসন্তান মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৩-১৮৭৩)-এর পিতা ফারসি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের কারণে 'মুন্সি' খেতাব পেয়েছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা যশোরের শেখপুরা গ্রামের জনৈক মুসলমান মৌলভির কাছে ফারসি শিক্ষা লাভ করেছিলেন।[১৬] নড়াইলে ফারসি শেখানোর ও শিক্ষার ভুরি ভুরি উদাহরণ দেওয়া যায়। ফারসি ভাষার এই ডামাডোলের মধ্যে নড়াইল জেলায় উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বাংলা ভাষার চর্চা ও বাংলার ব্যবহার ছিলো স্বতস্ফূর্তভাবে। দুই শত আড়াইশত বছর আগেও নড়াইলের শিক্ষিত মানুষের কাছে বাংলা ভাষা ছিল প্রিয় ও ব্যবহারিক ভাষা।

আমরা দেখতে পাই, ১৭৯৩ সালের আগে নড়াইল জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা কালিশংকর রাণী ভবানী ও রাজা রামকৃষ্ণ প্রদত্ত ভূষণা পরগনার ইজারা গ্রহণের যে পাট্টা দলিল পেয়েছেন তা বাংলা ভাষায় রচিত। বর্তমান লেখক ১৯৮১ সালের প্রথম দিকে লোহাগড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বদিকে একটি স্মৃতিমন্দির দেখতে পান। ঐ স্মৃতি মন্দিরের টালিলিপিতে (আয়তন ১০ × ৫) বাংলা হরফে লেখা ছিল :

শ্রী সতীশচন্দ্র দত্তের স্মৃতি মন্দির
১১৩৫ সন ১১ই চৈত্র মন্দির প্রতিষ্ঠা॥

বাংলা ১১৩৫ সন অর্থাৎ ইংরেজি ১৭২৮ সালে মুঘল আমলে নবাব সুজাউদৌলার শাসন আমলে এই স্মৃতি মন্দির নির্মিত হয়, ২৭২ বছর আগে। এই ভাবে আমরা ধারণা করতে পারি, মুঘল শাসনামলে নড়াইল জেলায় বাংলা ভাষার চর্চা ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে।

ইংরেজ কোম্পানি শাসনামলে ও ইংরেজ শাসনামলে নড়াইলের জন সাধারণের কাছে বাংলা ভাষা চর্চা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমরা দৃষ্টি দিতে পারি কলাবাড়িয়ার 'জকি মোল্লার এস্টেটের' সেরেস্তার প্রাচীন দলিল দস্তাবেজের দিকে। ঐ সেরেস্তায় প্রায় ২ শত বছর আগের লেখা তুলট কাগজের একটি বড়ো 'চিটাবই' এবং দেড়শত বছরের পূর্ব থেকে কয়েকটি বাংলায় লেখা দলিল পাওয়া গিয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন বাংলা দলিলের বিবরণ দেওয়া হলো : ১. ১৮৫৮ সালের (১২৬৫ সন ১১ ভাদ্র) তরফ কলাবাড়িয়া 'ভৌগ বন্দবস্ত' দলিল সম্পাদিত হয়েছে মে. জিয়ার ফেরগুন্ড ও মি. টি. আর গ্রাণ্ডের সাথে শ্রী জকি মোল্যা, শ্রী আরশাদ মোল্যা, শ্রী এফাজদ্দিন ও শ্রী ওয়ারেস মুহম্মদ-এর সাথে ২. ১৮৬২ সালের ১২ আগস্ট (১২৬৯

সনের ২৮ শ্রাবণ) তরফ কলাবাড়িয়া (পরগণা বেলফুলিয়া) 'ভৌগবন্ধবস্ত' গ্রহণের দলিল যা সম্পাদিত হয়েছিল মিঃ জেমস মেকালন-এর সাথে জকি মোল্যার। ৩. ১৩০০ সনের ১০ আষাঢ়ের চৌহদ্দিনামা মোট ৩২০ বিঘা জমির মধ্যে মোল্যা জমিদার পরিবারের ৮০ বিঘা জমির মালিকানা স্বীকৃত। ৪. ১২৯৭ সনের ৬ ফাল্গুন লেখা একখানি জমিদারি ভাগ বাটোয়ারা সম্পর্কিত পত্র যা লিখেছিলেন ফরিদপুর জেলার বর্তমান মধুখালি থানার বনমালদিয়া গ্রামের বিখ্যাত মীর নজীরউদ্দীন তাঁর শ্বশুর জমিদার মুহম্মদ জকি মোল্যার কাছে। ৫. আরেকটি পত্র যা ১৩০৫ সনের ২৪ ভাদ্র লিখেছেন জমিদার জকি মোল্যার তৃতীয় পুত্র মুহম্মদ গগন মোল্যা তাঁর আত্মীয় তৎকালীন যশোর জেলা বর্তমান ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা থানার হিদিয়াডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুত সৈয়দ ওমেদ আলি মিঞার নিকট ৬. আরেকটি দাপ্তরিক পত্র ৮ এপ্রিল ১৯১৯ সালে নড়াইলের মহকুমা প্রশাসক (নামস্বাক্ষর অস্পষ্ট) কলাবাড়িয়া নিবাসী মুহম্মদ জকি মোল্লার পুত্রবধূ মর্দান মোল্যার স্ত্রী মুসাম্মত আয়াতন নেছার কাছে লিখেছেন।[১৭]

বাংলা ভাষার বিকাশ ও ক্রমশ উন্নয়নের ছাপ রয়েছে ঐ পত্রগুলোর মধ্যে। নানা বিচারে এই প্রাচীন দলিল দস্তাবেজ, ব্যক্তিগত পত্র ও সরকারি পত্রগুলোর রয়েছে বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য। নড়াইল জেলার ভাষা সংস্কৃতি বিকাশের পর্যাক্রমিক ধারাকে বোধগম্য করে তোলার লক্ষে এখন দুটো পত্র উদ্ধৃত করা হলো। প্রথম সংযোজন করা হলো পূর্বের আলোচিত ৫নং পত্র যা মুহম্মদ গগন মোল্লার লিখিত :

শ্রী হক নাম ভরসা

কলাবাড়ীয়া
১৩০৫ সাল
২৪শে ভাদ্র।

আদাব কোরনেস ছালাম বহুত বহুত আয়জন (গুস্তা) গে জোনাবের দোয়াতে আমাদিগের সকলি খা'ত্রর হয়, বিশেষ পর সমাচার এই শ্রীমান এদন মিঞার বিবাহ আপনাদের গ্রাম নিবাসী ওলফত আলী মিরের কন্যার সহিত কথোপকথন স্থিরতাকরণ জন্য গত দো'সরা ভাদ্র শুনিতে যাওয়া হইয়াছিল, সে কারণে সে মত ওলফতালি মির ছাহেবের পুত্র বাটি না থাকায় কোনও কথোপকথন স্থিরতা আসিতে পারিয়াছিলাম না, আপনি বলিয়াছিলেন যে ২/৪ দিবস মধ্যে যে রকম হয় তাহা জানিয়া লিখিব এ যাবৎ না লেখার কারণ কি পত্র পৌঁছা মাত্র সত্বর জানিয়া লিখিয়া জানাইবেন, অধিক লেখা বাহুল্য আপনি দানা যেয়াদা কি লিখিব, লিপি দ্বারায় সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া যাহাতে সম্বন্ধখানা করিয়া দিতে পারেন তাহার মত চেষ্টা করিবেন, অবস্থা মঙ্গল, নিজ মঙ্গল লিখিয়া তুষ্ট করিবেন, জোনাবে আরজ ইতি–

শ্রী গগন মেয়া
সাং কলাবাড়ীয়া

আরজ দস্ত বঃ খেদমা বঃ জোনাব বন্দেগান
শ্রীযুক্ত সৈয়দ ওমেদ আলি মিঞা–
তালই ছাহেবের পাক জোনাবে পৌঁছে

পোঃ আলফাডাঙ্গা

গ্রাম-হিদাডাঙ্গা
জেলাঃ যশোহর
৭৪।১৮

মোঃ কেলাবাটী হইতে

(বর্তমান : কলাবাড়িয়া হইতে)

এবার দেখবো ১৯১৯ সালে লিখিত নড়াইল মহকুমা প্রশাসকের বাংলায় লেখা সরকারি পত্র :

'বঃ মুসত্, আয়াতন নেছা
সাং কলাবাড়িয়া
থানা : নড়াগাতি (বর্তমান কালিয়া)

এত দ্বারা তোমাকে জানান যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের সৈন্য সংক্রান্ত আইনের ৪৫ ধারার নির্দেশ অনুসারে তুমি বিধবা নও বলিয়া তোমার পুত্র আবদুল মজিদ মোল্লার মৃত্যু বাবদ মিলিটারি পেনশন পাইতে তুমি উপযুক্ত নহ।

ইতি-৮/৪/১৯
(স্বাক্ষর অস্পষ্ট ; ইংরেজিতে)
for subdvl officer
(অণুস্বাক্ষর)

প্রাচীনকাল থেকে নড়াইল জেলায় অনেক কবি সাহিত্যিক শিল্পী জন্মগ্রহণ করেছেন। নড়াইল থানার একটি গ্রামের নাম কাগজিপাড়া। এই নামকরণে বোঝা যায়, নড়াইলে এক সময় কাগজ প্রস্তুত হতো। কালিয়া থানার ডুতকুরা গ্রামে কাগুজি বংশের লোক বিদ্যমান। আরো অনেক এলাকায়ও কাগুজি পদবির লোক থাকায় ধারণা করা যায় নড়াইল জেলায় কাগজ উৎপাদনেরও ঐতিহ্য রয়েছে।

মেলা ও উৎসব

নড়াইল জেলা লোকসংস্কৃতি সমৃদ্ধ এলাকা। লোককথা, উপকথা, উপাখ্যান, রূপকথা, যাত্রা, পালা, জারি, কবি প্রভৃতি গানের জন্য এলাকাটি সমৃদ্ধ। সেইসাথে আছে বারোমাসে তের পার্বণ। উৎসব আনন্দ মুখরিত নড়াইল জেলায় সেই প্রাচীনকাল থেকে এখানকার ৩টি থানায় কতো না উৎসব ও আনন্দের মেলা বসতো। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে নড়াইল জেলার অনেকগুলো উৎসব ও মেলা এখন বিলুপ্ত। তবু বিলুপ্ত ও বর্তমানে প্রচলিত লোকমেলার থানাওয়ারি একটি তালিকা দেওয়া হলো :

লোহাগড়া থানা

রামপুরার পজুশাহ দেওয়ানের উরসের মেলা, রামপুরার রথের মেলা, কাশিপুরের নিশিবটের মেলা, কাঞ্চনপুরের কবিগানের মেলা, কুমড়ির পরমাণিকদের দোলপূজোর মেলা, টিকেরডাঙ্গার চৈতালি মেলা, চটকাতলার পাকিস্তানের মেলা, কোলার উরসের মেলা, লক্ষ্মীপাশার কালীবাড়ির মেলা, জয়পুরের তারকগোঁসাইর মেলা, লোহাগড়ার

রথের মেলা, জয়পুরের সাধনমার মেলা, লোহাগড়ার দুর্গাপূজার মেলা, লোহাগড়ার মধুসূদনের বারুণীর মেলা, লক্ষ্মীপাশার ঈদের মেলা, বসুনাটির হাজরাতলার মেলা, চাঁচইয়ের ঈদের মেলা, বড়োদিয়ার লক্ষ্মীপূজার মেলা, তেলকাড়ার ঈদের মেলা, মোচড়ার শাহ সাহেবের উরসের মেলা, ইতনার নীলের মেলা ও বারুণীর মেলা, করফার মেলা, দৌলতপুরের রথযাত্রার মেলা, ইতনার কালীখোলার মেলা, বড়দিয়ার বারুণীর মেলা, তেলকাড়ার পাগল ফকিরের মেলা, বয়রার খাজাবাবার উরসমেলা, কাশিপুরের বারোশরিফ দরগার উরস মেলা, কালনার পালপাড়ার বারুণীর মেলা, লোহাগড়ার সরকারদের মেলা, কাঞ্চনপুরের শ্মশানের মেলা, নারায়ণদিয়ার লাঠির মেলা, রাধানগরের গৌরাঙ্গদেবের মেলা, ইতনার মানিকপিরের মেলা, সরশুনার পিরভিটের মেলা ও নোয়াগ্রামের সৈয়দ সাহেবের উরসের মেলা।

কালিয়া থানা

কালিয়ার ভামিনী সেনের বাড়ির রথের মেলা, বেন্দাব নিশিঠাকুরের মেলা, চাঁচুড়ি-পুরুলিয়ার শ্মশানের মেলা, পুরুলিয়ার পোড়া মন্দিরের মেলা, লক্ষ্মীপুরের বুড়োমা-র মেলা, কালীনগরের পিয়েলে গোঁসাইর মেলা, পানিপাড়ার লেংটাশার মেলা, দেবদুনের পাগলঠাকুরের মেলা, গাছবাড়িয়ার গড়কাটাবাড়ির মেলা, টোনার ঈদের মেলা, গবিরপুরের দোলের মেলা, ফুলবদিনার মহেন্দ্রের মেলা, পুঠিমারির আশ্বিন সংক্রান্তির মেলা, কলাবাড়িয়ার সরকার পরিবারের শীতলাপূজোর মেলা, মির্জাপুরের দোলের মেলা, বেলেডাঙ্গার শীতলাপূজোর মেলা, ভাওড়িরচরের চড়কের মেলা, শিবানন্দপুরের পৌষসংক্রান্তির মেলা, পাটনার ভূঁইয়া বাড়ির মেলা, শুড়িগাঁতি ও চোরখালির শীতলার মেলা, খাশিয়ালের দোলপূজোর মেলা, রঘুনাথপুরের মোক্তাদের ফকিরের মেলা, কৃষ্ণপুরের দোল ও নীলের মেলা, কলবাড়িয়া সরকারবাড়ির কালী, দোল, চড়কপূজোর মেলা, বড়দিয়া, মহাজনের পূজোর মেলা, পেড়লি গাজিরহাটের মেলা, চোরখালির লক্ষ্মীপূজার মেলা, মাউলির ভূঁইয়ার ভিটের মেলা ও মানিক বিশ্বাসের বাড়ির রাসমেলা, নলামারার গোলোইর মেলা, কলাবাড়িয়ার দশানি মোল্যাবাড়ির ঈদের উৎসব, বল্লাহাটির পাঁচুশাহের মেলা, চোরখালির আখড়ার মেলা, পুরুলিয়ার আখড়াবাড়ির মেলা, কলাবাড়িয়ার মোল্যাহপাড়ার পাটোইউৎসব পুণ্যাহের উৎসব, পেড়লির উরসের মেলা ও বাঐসোনা কুড়ন ফকিরের মেলা ও কলাবাড়িয়ার বৈশাখী মেলা।

নড়াইল থানা

গোবরার মেলা, তারাপুরের মসলেম বয়াতিরমেলা, দুধপাতিলার মেলা, বড়োকুলোর মাঘিপূর্ণিমার মেলা, সিংগেবাজারের দুর্গাপূজার মেলা, থিয়েডাঙ্গার ফেলো গোঁসাইর মেলা, হিজেলডাঙ্গার পাগলের মেলা, আফ্রার মেলা, চাকোইর ঘোড়াদৌড়ের মেলা, রু-খালির কবিগানের মেলা, মির্জাপুরের বনভোজন উৎসব, রূপগঞ্জের মেলা ও বাঁধাঘাটের মেলা, দুর্গাপুরের গরুদৌড়ের মেলা, কোলোইতলার শ্মশানের মেলা, হোগলাডাঙ্গার চৈতালি মেলা, বেতেঙ্গার চড়কের মেলা, টাবরার বৈশাখী মেলা, মুলিয়ার কালী পূজার মেলা, দেভোগরাসমেলা, রঘুনাথপুরের পৌষসংক্রান্তির মেলা,

বিলডুমুরতলার মাঘসংক্রান্তির মেলা, বাহারবাগ ঘোড়দৌড়ের মেলা, জুড়ুলিয়ার ঘোড়দৌড়ের মেলা, বুটামারা ঘৌড়দৌগের মেলা, বুড়ামারার ভক্তিপুকুরের গরুদৌড়ের মেলা, শাহবাদ বার্ষিকী ইছালে সওয়াবের মেলা, দুর্গাপুরের রথের মেলা, নড়াইলের জমিদারদের পূণ্যাহের মেলা, কুলোইতলার মেলা, হোগলাডাঙ্গার বৈশাখী মেলা, মাগুরার রথের মেলা, চারিখাদার পৌষ সংক্রান্তির মেলা, দৌলতপুরের ফাতেয়াই ইয়াজদহামের উৎসব, বুড়ামারার কাজি বদিউজ্জামানের মেলা, সীমাখালির বিভূতিবাড়ির মেলা ও নাকসিবাজারের মেলা।

তথ্যনির্দেশ

১. মোঃ দবিরউদ্দিন আহমদ (৬২), গ্রাম : মল্লিকপুর, থানা : নড়াইল ও উর্মিলা মহসিন (৩২), গ্রাম : কলাবাড়িয়া, কালিয়া
২. মোঃ দবিরউদ্দিন আহমদ (৬২), মল্লিকপুর, নড়াইল
৩. সিরাজ মোল্যা (৬২), কলাবাড়িয়া, থানা : কালিয়া
৪. শায়েদা খানম (৬০), কলাবাড়িয়া, থানা : কালিয়া
৫. উর্মিলা মহসিন (৩২), গ্রাম : কলাবাড়িয়া, কালিয়া
৬. মালতিরাণী সরকার (৫০), গ্রাম : কলাবাড়িয়া, কালিয়া
৭. উর্মিলা মহসিন (৩২), গ্রাম : কলাবাড়িয়া, কালিয়া
৮. হোনায়ারা বেগম (৪০), ও উর্মিলা মহসিন (৩২), সাং কলাবাড়িয়া, থানা : কালিয়া
৯. বৃহত্তর যশোরের লোককবি ও চারণ কবি, মহসিন হোসাইন, ১৯৯৭
১০. যশোহর-খুলনার ইতিহাস (১ খণ্ড), শ্রী সতীশ চন্দ্র মিত্র, পৃ. ৩৯৩-৩৯৭
১১. মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৫ম খণ্ড), ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ৫৩২-৫৩৩, ১৯৫৬
১২. শতাব্দীর সাক্ষী, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, পৃ. ১৬
১৩. 'জকি মোল্যা এষ্টেটের' শেষ উত্তরাধিকারী মুহম্মদ জকি মোল্যার প্রপৌত্র আবদুর রাজ্জাক মিয়ার সেরেস্তা থেকে পত্রখানি সংগ্রহ করা। পত্রখানির মূল কপি বর্তমান লেখকের সংগ্রহে আছে।
১৪. যশোহর-খুলনার ইতিহাস শ্রী সতীশচন্দ্র পৃ. ৪৫৬
১৫. প্রাগুক্ত পৃ. ৪৫৬
১৬. ৬টি পত্রেরই মূল কপি বর্তমান লেখকের সংগ্রহে আছে
১৭. পত্রখানি অবিকল উদ্ধৃত করা হলো
১৮. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বাঙালি পল্টনের মৃত সৈনিক আবদুল মজিদ মোল্লার মিলিটারি পেনশন সংক্রান্ত পত্র

নড়াইল জেলার স্থাননামের বৈশিষ্ট্য

কোনো বস্তু কিংবা বিষয়ক সনাক্ত করতে বা সুনির্দিষ্ট করতে প্রয়োজন হয় নামের। আরো স্পষ্ট বলা যায়, মানুষের জ্ঞান, ধারণা ও পরিবেশের মধ্যে যা কিছু আছে তাকে অন্যের কাছে পরিচিতি দেওয়ার জন্য যা চাই তা হলো একটি নাম। আমরা জানি, সমশ্রেণীর বস্তু বা বিষয়ের থাকে একটি বিশেষ শ্রেণীর নাম। যেমন, কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, কলম, চেয়ার, ইত্যাদি। আবার সমশ্রেণীর স্থাবর বা অস্থাবর জিনিষেরও থাকে একটি সাধারণ নাম। যেমন, নদী, পাহাড়, বৃক্ষ ইত্যাদি। ব্যবহারিক ও কার্যকারণবশত শ্রেণীনাম নদীর কোনো একটিকে সুনির্দিষ্ট করতে তারো আবার ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতি দিতে পৃথক পৃথক নামের ব্যবহার আছে। যেমন, পদ্মা, মেঘনা, মধুমিত চিত্রা, নলিয়া, কাজলা ইত্যাদি। এইভাবে বিশাল বিস্তৃত অখণ্ড ভূ-খণ্ডের কার্যিক, ব্যবহারিক ও স্থানিক পার্থক্যের কারণে এক একটি স্থানের রয়েছে এক একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাননাম। স্থাননামগুলো কল্পিত, আরোপিত এবং তা অনেক সময় পরিবর্তনীয়ও বটে। ড. সুকুমার সেনের ভাষায়, 'গঠন অনুযায়ী বাংলা স্থাননাম দু-প্রকার : একক অর্থাৎ এক শব্দময়.·খ, দ্বিক অর্থাৎ দুই শব্দময়। দু-য়ের অধিক শব্দ নিয়ে গড়া নামগুলো আসলে দ্বিক নামের বর্ধিতরূপ। আবার দু-শব্দের নামগুলো স্থায়ী হয় না। ক্রমেই লোকমুখে ধ্বনি বদলে এক শব্দের হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রাচীন দ্বিতীয় পদটি ক্ষয়ে প্রত্যয়ে পরিণত হয়। দ্বিক নামে দ্বিতীয় শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে অপর কোনো নামে প্রচলিত থাকলে বুঝতে হবে যে, নামটি খুব বেশি পুরানো নয়। পুরানো নাম মুখে-মুখে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে প্রাচীনরূপ হারিয়ে যায়।[১]

প্রতিটি প্রাচীন এলাকার নামসমূহের রয়েছে এক একটি বৈশিষ্ট্য। পূর্বেই আলোচনা করেছি নড়াইল জেলা একটি প্রাচীন জনপদ। অনেককাল আগে তা ছিল সমুদ্রতল। দীর্ঘ সময় ধরে তা সমতল ভূমির রূপ পায়। তাই এই এলাকার স্থাননামের বেলায় দেখা যায় জলাশয় সংক্রান্ত নামের আধিক্য। এখানকার স্থাননামগুলোর মধ্যে কোনো না কোনোভাবে দিয়া, দি, ডাঙ্গা, চর ও বিভিন্ন রকম মাছের নাম দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া রয়েছে মানুষের নামে স্থাননাম ; সে মানুষ হতে পারেন কোনো পীর-আউলিয়া, সাধক-দরবেশ, সাধুসন্ত, জমিদার-গাঁতিদার কিংবা এলাকায় প্রথম বসতি স্থাপনকারী একজন সাধারণ লোক।

ড. সুকুমার সেন বাংলা স্থাননামকে এক শব্দের ও দুই শব্দের অর্থাৎ একক ও দ্বিক শব্দময় বলে ব্যক্ত করেছেন। তবে নড়াইল জেলার স্থাননামের বিচারে একটু ব্যতিক্রম দেখান যায়। এখানে তিন শব্দেরও স্থাননাম রয়েছে, যেমন, 'বামনসীমাখালি', 'ধুরিয়া-আমবাড়িয়া' 'চরঘোনাপাড়া' ইত্যাদি। এখানে চার শব্দেরও দু'একটি স্থাননাম পাওয়া যায়, তা হলো, 'বাজেশিবানন্দপুর', বাগশ্রীরামপুর' ইত্যাদি। তবে আগামীতে ঐ সব নাম উচ্চারিত হতে হতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রত্যয়ে রূপ নেবে। তখন নামগুলো আর বর্তমান

অবস্থায় থাকবে না।

নড়াইল জেলার মোট ৩টি থানা, যথাক্রমে : ১. নড়াইল সদর, ২. লোহাগড়া ৩. কালিয়া থানা।

সদর নড়াইল থানায় রয়েছে ১টি পৌরসভা, মোট ১৩টি ইউনিয়ন ও ২২৬টি গ্রাম। লোহাগড়া থানায় রয়েছে মোট ১২টি ইউনিয়ন ও ২১৪টি গ্রাম। কালিয়া থানায় রয়েছে ১টি পৌরসভা, ১২টি ইউনিয়ন ও ১৮৯টি গ্রাম। এই ভাবে আমরা সরকারি নথিভুক্ত নড়াইল জেলার মোট ৪২৯টি গ্রামের সন্ধান পাই। গ্রামের নামগুলো অবশ্যই স্থাননাম। সরকারি হিসেব-নিকেশ ভুক্তির বাইরে রয়েছে আরো বেশ কিছু স্থান। ঐ স্থানগুলো পুরোপুরি গ্রামের মর্যাদা পায় নি। সেগুলো 'পাড়া' বা বা 'মহল্লা' হিসেবে পরিচিত। আবার 'পাড়া' বা 'মহল্লার' বাইরে মাঠের কোনো সীমান্ত যেখানে বসতি বেড়ে কিংবা ওঠে নাই কিন্তু সেই সব স্থানেরও অর্থবোধক নাম রয়েছে। আমাদের আলোচনায় তারকাচিহ্ন (*) দিয়ে সেই সব বসতি প্রান্তর, পাড়া বা মহল্লা কিংবা বসতি গড়ে ওঠে নাই সেই স্থানগুলোর নামকরণ নিয়েও আলোচনা করবো।

এবার আমরা নড়াইল জেলার পৌরসভা, ইউনিয়ন ও থানা অনুযায়ী সরকারি নথিভুক্ত গ্রামের তালিকা সন্নিবেশ করছি :

নড়াইল সদর থানা

নড়াইল পৌরসভা : ভাদুলিডাঙ্গা, নড়াইল, ভওয়াখালি, কুড়িগ্রাম, আলাদাতপুর, মহিশখোলা, বেতবাড়িয়া, ধোপাখালি, মাছিমদিয়া, হাটবাড়িয়া, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, বিজয়পুর, গন্ধব, কাশিয়াড়া, উজিরপুর, কালইতলা ও মথুরাপুর।

মুলিয়া ইউনিয়ন : ইচড়বাহা, শালিয়ারভিটা, মুলিয়া, বালিয়াডাঙ্গা, হিজলডাঙ্গা, দুর্বাজুড়ি, সীতারামপুর, বাঁশভিটা, গোয়ালবাড়ি, পানতিতা, কুড়িগ্রাম, সাতঘরিয়া, গোয়ালডাঙ্গা, ননিক্ষির, বড়েন্দার ও বনগ্রাম।

মাইচপাড়া ইউনিয়ন : দারিয়াঘাটা, কালুখালি, খাটুরমাগুরা, লোকনাথপুর, কানখলবাড়িয়া, মাইচপাড়া, পোড়াডাঙ্গা, ত্যালেশ্বর, হোসেনপুর, রামপুর, দৌলতপুর, দুর্গাপুর, উজানি, কল্যাণখালি, তারাসি, ডহরতারাসি, রামেশ্বরপুর, সালুয়া, চারিখাদা, বলরামপুর, পাড়বলরামপুর, আতোষপাড়া ও আদমপুর।

শাহবাদ ইউনিয়ন : চরবিলা, ময়েনখোলা, ধোন্দা, তুজারডাঙ্গা, দলজিৎপুর, সরস-পুর, গোপীকান্তপুর, সদানন্দকাঠি, দত্তপাটি, নারায়ণপুর, আলোকদিয়া, চাঁদপুর, জুড়ুলিয়া, মাহাজন, নয়নপুর ও বিষ্ণুপুর।

হবোখালি ইউনিয়ন : রাইখালি, সিঙ্গিয়া, চরসিঙ্গিয়া, সিঙ্গিয়াবাজার, সিঙ্গিয়াকালুপাড়া, সিঙ্গিয়াদাসুপটি, রোমখালি, হাড়িগড়া, জয়দেবপুর-ডুমুরতলা, বিলডুমুরতলা, নয়াবাড়ি, উত্তর বাগদরিয়া, হবোখালি, ভাঙ্গারিপাড়া, সাবুদিডাঙ্গা, সাধুখালি, ফলিয়া, ইছনদিয়া, হায়দারখোলা, কাগচিপাড়া, বাহিরডাঙ্গা, দুর্গাপুর, ডুমুরতলা, রঘুনাথপুর, ভাটিয়া ও বড়োগুইয়া।

চণ্ডিবরপুর ইউনিয়ন : শংকরপুর, ফুলবাড়ি, গন্ধর্বখালি, রতডাঙ্গা, বাঁধালু, জঙ্গলগ্রাম, চণ্ডিবরপুর, রাজাপুর, কুড়ালিয়া, চালিতাতলা, গোয়ালবাথান, শিবানন্দপুর, বুড়িআমবাড়িয়া, চাকুলিয়া, নিধিখোলা, মহিষখোলা, পাইকমারি, ভোমরদিয়া, ফেদি, বাজেশিবানন্দপুর, শিবানন্দনাওরা ও বাগশ্রীরামপুর।

আউড়িয়া ইউনিয়ন : বড়ো বাদুরিয়া, সীমাখালি, পশ্চিম সীমাখালি, বামনসীমাখালি, লস্করপুর, উত্তর পংকবিলা, দক্ষিণ পংকবিলা, বাজেয়াপট্টু, আউড়িয়া, কমলাপুর, নাকসি, চিলগাছারঘুনাথপুর, ঘোষপুর, খলিসাখালি, তালতলা, মূলদাঁইড়, কুহুডাঙ্গা, শড়াতলা, রামচন্দ্রপুর, পশ্চিম বালিয়াডাঙ্গা, ডওয়াতলা, দত্তপাড়াবিল, উত্তরবালিয়াডাঙ্গা, উত্তর-বুড়িখালি ও চৌগাছা।

তুলারামপুর ইউনিয়ন : বামনহাট, ছোটো বামনহাট, মিতনা, আরাজিমিতনা, পেড়ুলি, বাকশাডাঙ্গা, দেবীপুর, বোড়ামারা, কোদলা, মালিডাঙ্গা, বেতেঙ্গা, চামরুল, চাঁচড়া, বেনাহাটি ও তুলারামপুর।

শেখহাটি ইউনিয়ন : আফরা, বাসিয়াডাঙ্গা, গুয়াখোলা, শেখহাটি, শেখপাড়া, ডহরশেখহাটি, মহিষখোলা, তপনবাগ, পঁচিশা, কাইচদা, দে-ভোগ, মালিয়াট, আখোদা, টিপরা, বাকলি ও হাতিয়াড়া।

কলোড়া ইউনিয়ন : নিরালি, বাহিরডাঙ্গা, শিমুলিয়া, আগদিয়া, আগদিয়ারচর, রামনগরচর, মুশুড়ি, বীরগ্রাম, কলোড়া ও গোয়াইল বাড়ি।

বিছালি ইউনিয়ন : কালীনগর, বিছালি, আটঘরা, বাবোল, রুনদিয়া, আকবরপুর, মাদুরগাঁতি, আরাজিমরিচা, চাকই, বনখলিশাখালি, রুখালি, মির্জাপুর ও আড়পাড়া।

শিঙ্গাশোলপুর ইউনিয়ন : নলদিরচর, খলিসাখালি, গোবরা, গুয়ারঘোপ, নাথড়া, বড়োকুলা, বড়গাতি, দক্ষিণসিঙ্গা, শোলপুর, চুনখোলা ও তারাপুর।

ভদ্রবিলা ইউনিয়ন : ফুলশর, ঝিকড়া, ভদ্রবিলা, মহারাগ, পলইডাঙ্গা, ভবানিপুর, রায়খালি, মাথাভাঙ্গা, মিরাপাড়া, আটেরহাট, দিঘলিয়া, সার্কেলডাঙ্গা, পাইকড়া, চণ্ডিতলা, পাঁচুড়িয়া, শ্রীফলতলা, ছাগলছিড়া, ডহররামসিদি ও রামসিদি।

বাঁশগ্রাম ইউনিয়ন : বেতভিটা, বল্লারটোপ, শম্ভুডাঙ্গা, রঘুনাথপুর, কর্মচন্দ্রপুর, কলুইগাছি, দৌলতপুর, দারিয়াপুর, হোগলাডাঙ্গা, দক্ষিণ বালিয়াডাঙ্গা, গোপালপুর, আগরাহাটি, চান্দপুর, বগুড়া, বাঁশগ্রাম, কোমাডাঙ্গা, ডুমদি, নন্দকোল, কামালপ্রতাপ, টাবরা, শালিখা ও চরশালিখা।

লোহাগড়া থানা

লোহাগড়া ইউনিয়ন : মাকড়াইল, কাশিপুর, রামচন্দ্রপুর, নোয়াখোলা, চরনোয়াখোলা, চাকসি, চরখারাকদিয়া, চরগোপালপুর, মণ্ডলগাঁতি, ঝাউডাঙ্গা, শালনগর, আজমপুর, পারশালনগর, শালনগর, বাতাসি, ভদ্রডাঙ্গা, শেখপাড়া, ডাঙ্গাবাতাসি, হামিপাড়া, বাতাসি, বোজরুখশালনগর, শিয়ারবর, রঘুনাথপুর ও রামকান্তপুর।

নলদি ইউনিয়ন : ভাটুদহ, নালিয়া, মদনপুর, গুজাপুর, গোপালপুর, দরিমিঠাপুর,

মিঠাপুর, চাকুলিয়া, বাগডাঙ্গা, কালীনগর, চরবালিদিয়া, নখখালি, মতিনগর, ব্রাহ্মণীনগর, মঠবাড়িয়া, কালাচাঁদপুর, নোয়াপাড়া, হলদা, গাছবাড়িয়া, নলদিয়া, বৈকান্ত পুর, বারোইপাড়া ও জালাশি।

লাহুড়িয়া ইউনিয়ন : লাহুড়িয়া, ঝামারঘোপ, চরঝামারঘোপ, গোবিন্দপুর, আরাজিমণ্ডলগাতি, লাহুড়িয়াডিন্নাপাড়া, ত্রৈলক্ষপাড়া, এগারনালি, ডিগরিয়াচর, লাহুড়িযাডহরপাড়া, তেঁতুলবাড়িয়া, প্রসন্নপাড়া, রাজুপুর, হেচলাগাঁতি, কল্যাণপুর, কামারগ্রাম, সরশুনা, লাহুড়িয়া মোল্যাপাড়া ও লাহুড়িয়া মাঝিপাড়া।

নোয়াগ্রাম ইউনিয়ন : তেলিগাঁতি, সতরহাজারি, মাধবহাটি, শামুকখোলা, চরশামুকখোলা, আড়পাড়া, কাউলিয়াডাঙ্গা, নোয়াগ্রাম, শুলটিয়া, দেবী, চরব্রাহ্মণডাঙ্গা, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, হারদা, বারইডাঙ্গা, কাংকুল, রায়গ্রাম, কলাগাছি ও কাঞ্চনপুর।

কাশিপুর ইউনিয়ন : চালিঘাট, গণ্ডব, বাহিরপাড়া, শাহবাজপুর, ধোপাদহ, শারুলিয়া, পালোখালি, ডরবাসুপটি, বাসুপটি, এড়েন্দা, কাশিপুর, কচুবাড়িয়া, রামপুর, লক্ষীপাশা, মোশাগুনি ও দাশেরডাঙ্গা।

লক্ষীপাশা ইউনিয়ন : পদ্মবিলা, রামেশ্বরপুর, ইশানগাতি, গিলাতিলা, ভাটগতি, উত্তরপাড়া, শিঙ্গা, বাঁকা, গোপীনাথপুর, রাজুপুর, খলিসাখালি, ঝিকড়া, কুচিয়াবাড়ি, নোয়াপাড়া, হামারহোল, আমাদা, বয়রা, উলা দেওপাড়া, শালবরাত ও নাওরা।

জয়পুর ইউনিয়ন : বাবরা, নাওরা, চাঁচই, ধানাইড়, মরিচপাশা, চোরখালি, গোপাডাঙ্গা, নারাণদিয়া, পুরুলিয়া, জয়পুর, গোবিন্দপুর, চাঁচইধানাইড়, আড়িয়ারা, চর-আড়িয়ারা, ঝামাইল, আমডাঙ্গা ও বেলটিয়া।

শালনগর ইউনিয়ন : কৃষ্ণপুর, মোচড়া, কাওরিখোলা, কামঠানা, চরবকজুড়ি, তেতুলিয়া, কুমারকান্দা ছাতরা, পারছাতরা, পোদ্দারপাড়া, গন্ধবাড়িয়া, মাইটকুমড়া, কালনা, ধর্মদেবপাড়া, চর করফা, চরবাকজুড়ি ও ছাগলছিড়া।

মল্লিকপুর ইউনিয়ন : কুন্দশি, মঙ্গলহাটা, মহিশাপাড়া, করফা, আতসপাড়া. মল্লিকপুর, পারমল্লিকপুর, পাঁচুড়িয়া, সোনাদহ, ধলইতলা, পাঁচুড়িয়া, কাউলিডাঙ্গা, নরসিংদি ও যোগিয়া।

ইতনা ইউনিয়ন : ইতনা, বাগপাড়া, দৌলতপুর, রাধানগর, কুমারডাঙ্গা, ডিগ্রিরচর, ফকিরেরচর, চরদৌলতপুর, লংকারচর, পাংখারচর, চরঘোনাপাড়া, পাঁচাইল, পরানপুর. পরানকান্দা, মাথলা, মিরারচর ও চাঁদপুর।

দিঘলিয়া ইউনিয়ন : তালবাড়িয়া, কুমড়ি, সাল, নোয়াগ্রাম, বাটকাবাড়ি, কোলা, দিঘলিয়া, চরদিঘলিয়া ও নতুনিয়া নরসিঙ্গাপুর।

কোটাকোল ইউনিয়ন : ভাটপাড়া, কোটাকোল, গড়েরহাট, বাঘা, ধলইতলা, ভুসাইল, পারখালিয়া, পারইছাখালি, চরকোটাকোল, তেলিগাতি, রায়পাশা, করগাতি, তেলকাড়া, মাইগ্রাম, মেতেঙ্গা, বড়দিয়া, মঙ্গলপুর, চাপুলিয়া, চরবড়দিয়া ও উত্তর খাশিয়াল।

কালিয়া থানা

কালিয়া পৌরসভা : বড়োকালিয়া, ছোটোকালিয়া, কালিয়া, সীতারামপুর, চাঁদপুর, মির্জাপুর, কালিয়াবাজার, রামনগর, নাওরা, বৃহাচলা। ঘোষণাওরা, বেন্দা ও বেন্দারচর।

সালামাবাদ ইউনিয়ন : বাহিরডাঙ্গা, দাসনাওরা, বিলবাউচ, হাড়িডাঙ্গা, বাঁকা, দেবীপুর, ভবানীপুর, রাজাপুর, বলাডাঙ্গা, নলডাঙ্গা, বৈদ্যবাটি, জোঁকা, জোঁকারচর, ধুসাহাটি, রায়পুর, ভাউড়িরচর, কার্তিকপুর; জয়পুর, বড়োনাল গোবিন্দনগর, হরিষপুর, কুঞ্জপুর চণ্ডিনগর, বিলদুড়িয়া ও হেদায়েতপুর।

কলবাড়িয়া ইউনিয়ন : কলাবাড়িয়া বাঐসোনা, লক্ষ্মীপুর, চালনা, কালীনগর, কাশিপুর, মাথাভাঙা, বিজয়নগর, লোহারগাঁতি, শিবপুর, আইচপাড়া, বলাডাঙ্গা, পারোখালি, খামার, ঘণশ্যামপুর, কান্দুরি, শ্রীনগর, মূলখানা, উত্তরবিলআফর, গরিবপুর, নিধিপুর খলিসাখালি, শ্যামনগর, দক্ষিণবিলআফর, ঘোড়াখালি ও পদ্মবিলা

বেন্দা ইউনিয়ন : সাতরাখালি, চালিতাতলা, নারায়ণপুর, সিলিমপুর, মচন্দপুর, মদনগাঁতি, রামনন্দপুর, ভোমবাগ, বিষ্ণুপুর, মাধবপাশা, পুকুরকুল, বাবুপুর, কুলশুর, ধলুয়া, ও উথলি।

বাবরা-হাচলা ইউনিয়ন : বারোইপাড়া উরাশি, কাঞ্চনপুর, নরসিংপুর, শিঙ্গারডাঙ্গা, হাচলা, পাটকেলবাড়ি, বাঘারডাঙ্গা, বাবরা, জুশালা, শুক্তগ্রাম ও কলিমনখালি।

মাউলি ইউনিয়ন : মাউলি, চান্দারচর, তেলিডাঙ্গা, গোবরডাঙ্গা, পারবিলবাউচ, কাঠাদুরা, কলাগাছি, মহাজন ঘষিবাড়িয়া, গন্ধবাড়িয়া ও ইসলামপুর।

খাশিয়াল ইউনিয়ন : চোরখালি, শুড়িগাঁতি, তালবাড়িয়া, টোনা, খাসিয়াল, পুটিমারি, পাকুড়িয়া, পিচ্ছিডুমুরিয়া, শিবানন্দপুর, পাটনা ও ব্রাক্ষণপাটনা।

জয়নগর ইউনিয়ন : নয়নপুর, দুলালগাঁতি, ঘষিবাড়িয়া, ভাইড়িরচর, পদুমা, তেবাড়িয়া, রামপুরা, গাছবাড়িয়া, পানিপাড়া, জয়নগর, ডুমুরিয়া, দেবদুন, কামশিয়া, নড়াগাঁতি ও কেশবপুর।

পুরুলিয়া ইউনিয়ন : চাঁদপুর, রঘুনাথপুর, লক্ষ্মীপুর, পুরুলিয়া, চন্দ্রপুর, ধাড়িয়াঘাটা, আমতলা, কলিমনখালি, বাজোবাবরা, নয়াগ্রাম, দেয়াডাঙ্গা, পারবিষ্ণুপুর, ফুলদহ, পাভোমবাগ ও দক্ষিণবুড়িখালি।

পেড়লি ইউনিয়ন : যাদবপুর, খড়রিয়া, কদমতলা, মহিষখোলা, পাটেশ্বরী, জামরিলডাঙ্গা, গঙ্গারামপুর, পেড়লি, সাতবাড়িয়া, পিরঅলিস্থান ও শীতলবাড়ি।

বাঐসোনা ইউনিয়ন : বাঐসোনা, খালিসাখালি, কানাইপুর, যোগানিয়া, খালযোগানিয়া নলামারা, দুতকুরা, শরিফপুর, মধুপুর, ডুমুরিয়া, রামনগর ও ফুলবদিনা।

পহরডাঙ্গা ইউনিয়ন : সরসপুর, পহরডাঙ্গা, কচুডাঙ্গা, ডরবল্লাহাটি, পাখিমারা, বল্লাহাটি, বাগুডাঙ্গা, মূলশ্রী, চাপলি, চরমধুপুর, চরসিংগাতি, চরআস্তাইল ও পশ্চিম চরগোবরা।

চাঁচুড়ি ইউনিয়ন : সাতঘরিয়া, বিষ্ণুপুর, কলিমন, আরাজিবনগ্রাম, আরাজিকলিমন, মোল্লাডাঙ্গা, বনগ্রাম, আটঘরিয়া, কালডাঙ্গা, আটালি, দক্ষিণবাগডাঙ্গা, সুমেরুখোলা,

হাড়িয়ারঘোপ, আমবাড়ি, দাদনতলা, কদমতলা, কৃষ্ণপুর ডহরচাঁচুড়ি, চাঁচুড়ি, চাপুলিয়া ও লাঙগুলিয়া।

স্থাননামের প্রথমাংশের বৈশিষ্ট্য

আমরা জেনেছি, স্থাননাম সাধারণত দুটো শব্দের সমন্বয়ে সৃষ্ট। উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে, স্থাননাম কখনো তিন অথবা চার শব্দেও গঠিত হয়েছে। দুইয়ের অধিক শব্দ নিয়ে গঠিত স্থাননামগুলোকে অপেক্ষাকৃত নতুন বলে ধরে নেওয়া চলে। স্থাননামের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে হলে স্থাননামের প্রথমাংশ ও শেষাংশের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। নড়াইল জেলার স্থাননামের শুরুর অংশের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হলো :

নদ-নদী ও খালের নাম সম্পর্কিত স্থান : ঘোড়াখালি (১), ঘোড়াখালি (২), কালিয়া, বুড়িখালি ইত্যাদি।

গোত্র বা পদবির নামে স্থাননাম : কুরিগ্রাম ধোপাখালি, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, গোয়ালবাড়ি, দত্তপাটি, বৈদ্যবাটি, ঘোষগাঁতি, ঘোষপাড়া, মিরেপাড়া কামারগ্রাম, মল্লিকপুর, মোল্যাডাঙ্গা, মোল্যাপাড়া, মোল্যারচল, মিরারচর, পোদ্দারপাড়া, তেলিগাঁতি, ধোপাদহ, গোয়ালবাথান ইত্যাদি।

ফুল ও ফলের নাম সম্পর্কিত স্থাননাম : হিজলডাঙ্গা, তালেশ্বর, চালিতাতলা, ডুমুরতলা, আমডাঙ্গা, ফুলবাড়ি, শিমুলিয়া, কলাগাছি, পদ্মবিলা, পদুমা, কদমতলা, গিলেতলা, তালবাড়িয়া, বলাডাঙ্গা ইত্যাদি।

বৃক্ষ ও ফসলের নাম সম্পর্কিত স্থাননাম : দুর্বাজুড়ি, পানতিতা, গাছবাড়িয়া, কচুবাড়িয়া। কলাইতলা ইত্যাদি।

বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কিত স্থাননাম : নড়াইল, পাংখারচর, শিংগেরডাঙ্গা, লোহারগাঁতি, ঝামারঝোপ, ঘষিবাড়িয়া ইত্যাদি।

খাদ্য সামগ্রীর, নাম সম্পর্কিত স্থাননাম : ননিক্ষির, চুনখোলা ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক ব্যক্তির নামে স্থাননাম : হোসেনপুর, লাহুড়িয়া, শাহবাজপুর, মহিশখোলা, জালালশি ইত্যাদি।

দেবদেবীর নাম অনুসারে স্থাননাম : নারায়ণপুর, বিষ্ণুপুর, রামেশ্বরপুর, দুর্গাপুর, রামপুর, দেবীপুর, দেবী, কৃষ্ণপুর ইত্যাদি।

ব্যক্তির নামে স্থাননাম : কালুখালি, চাঁদখালি, ময়েনখোলা, আদমপুর, রতডাঙ্গা, বলরামপুর, গরিবপুর, নন্দকোল, কামাল-প্রতাপ ইত্যাদি।

জমিদারি ও রাজস্বআদায় সম্পর্কিত স্থাননাম : চাকুলিয়া, চাপুলিয়া, মোল্যারচল করগাঁতি, চাকসি, দশানিপাড়া, ছয়ানিপাড়া ইত্যাদি।

বনজঙ্গলের নাম সম্পর্কিত স্থাননাম : দারিয়াপুর, দরিয়াঘাট, বাহারডাঙ্গা, বিলধু-ড়িয়া ইত্যাদি।

সাগর বা সমুদ্র সম্পর্কিত স্থাননাম : দরিয়াপুর, দরিয়াঘাটা, বাতাসি, বোয়ালেরচর,

পুটিমারি, নলামারা ইত্যাদি।

পশু, পাখি ও পোকার নামানুসারে স্থানমান : মহিষখোলা, পাখিমারা, চিলগাছা, জোঁকা, বল্লারটোপ, বল্লাহাটি, ছাগলছিড়া ইত্যাদি।

ভূমি জরিপের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থাননাম : বাজেবাবরা, আরাজিবাঁশগ্রাম, বাজেডুমুরিয়া, পিচ্চিডুমুরিয়া, আমাদা ইত্যাদি।

তীর্থস্থানের নামে স্থাননাম : মথুরাপুর, কাশিপুর ইত্যাদি।

প্রশাসনিক কেন্দ্রের নাম অনুসারে স্থাননাম : উজিরপুর, লস্করপুর ও ঠাকুরভিটে ইত্যাদি।

প্রাচীন সেনানিবাস বা কেল্লা সম্পর্কিত স্থাননাম : কলাবাড়িয়া, ছিলিমপুর, শোল-পুর গড়েরহাট, বড়াগুলা, উলো, কোলা ইত্যাদি।

সংখ্যাবাচক শব্দের নামে স্থাননাম : তেবাড়িয়া, সাতঘরিয়া, চারিখাদা, চৌগাছা, আটেরহাট, এগারোনালি, পাঁচুড়িয়া ইত্যাদি।

নড়াইল জেলার স্থাননামের প্রথমাংশের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি। স্থাননামের প্রথমাংশের মতোই শেষাংশেও কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট রয়েছে। এবার স্থাননামের শেষাংশের কয়েকটি শব্দের বৈশিষ্ট্য দেখা যাক :

নগর : অতীতে নগর বলতে পাথর বা ইটের তৈরি গৃহ সম্বলিত ধনী বা রাজা বা দেবতা অধিষ্ঠিত প্রাচীরঘেরা গ্রামকে বুঝাতো। পরে এই অর্থ ক্ষয় পেয়ে ইটে গাঁথা শিবালয় বা দেবালয়বিশিষ্ট গ্রামকে বুঝাতে থাকে।[২] তবে নড়াইল জেলার যেসব স্থানের নামের শেষে নগর শব্দটি রয়েছে সে স্থানগুলো কোনোকালেই নগর ছিল তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না গ্রামকে নগর ভাবা কল্পনামাত্র। কল্পনালোক থেকে স্থাননামের শেষে নগর শব্দটি যুক্ত হয়েছে। যেমন, কালীনগর, গোবিন্দগর, বিজয়নগর, চন্ডিনগর, শ্যামনগর, রামনগর ইত্যাদি।

পাড়া : ঘন সন্নিবিষ্ট ভদ্রাসন সমষ্টিকে পাড়া বলে।[৩] কতগুলো পাড়া নিয়ে গ্রাম গড়ে উঠে। কিন্তু দেখা গেছে এক সময় যেটি পাড়া ছিল, জনসংখ্যার আধিক্যে সেটাই এখন গ্রামে রূপ নিয়েছে। কিন্তু গ্রামের নামে পাড়া শব্দটি টিকই রয়ে গেছে।[৪] পাড়া শব্দটি এসেছে প্রাচীন 'পটক' শব্দ থেকে। বাংলায় সেন শাসনামলে ঘনবসতিপূর্ণ স্থানকে 'পটক' বলা হতো। নড়াইল জেলার বেশ কিছু স্থানের নামের শেষে পাড়া রয়েছে, যেমন, নোয়াপাড়া, মিরেপাড়া, বারোইপাড়া, মোল্যাপাড়া, পোদ্দারপাড়া ইত্যাদি।

পুর : সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত এই স্থাননামাংশটি বাংলার অষ্টম, নবম, শতাব্দীর আগে তেমন মেলে নি। সাধারণত ব্যক্তির নামের বা পদবির শেষে পুর যোগ করে বহু স্থান নাম হয়।[৫] সম্ভবত পুর শব্দটির উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করেছে 'রাজপুরী' শব্দের আভিজ্যত্য বোধ থেকে। নড়াইল জেলার কয়েকটি স্থাননামের শেষে পুর শব্দ যুক্ত হয়েছে, যেমন, সরসপুর, উজিরপুর, সিতারামপুর, বিজয়পুর, কেশবপুর, চাঁদপুর ইত্যাদি।

দি ও দিয়া : দি কিংবা দিয়া শব্দাংশ দ্বারা প্রাচীন দ্বীপ বা দ্বীপাংশকে বুঝায়। কোনো

এক সময় দ্বীপ ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে বসতি গড়ে উঠে তখন ব্যক্তি, বস্তু কিংবা প্রাণীর নামের শেষে দ্বীপ যুক্ত হয়ে স্থানের নাম হয়েছিল। কিন্তু দীঘদিনে দ্বীপ শব্দটি উচ্চারিত হতে হতে আরো সহজ ভাবে 'দি' কিংবা 'দিয়া' পরিচিত পেয়েছে। নড়াইল জেলার স্থাননামের অন্তে দি বা দিয়া যুক্ত কয়েকটি স্থাননাম নিম্নে দেওয়া হলো, মাছিমদিয়া, শালিকদিয়া, বড়দিয়া, রুনদিয়া, ভুমদি ইত্যাদি।

গ্রাম : আমরা জানি সার্বভৌম বসতিস্থলকে গ্রাম বলে। একটি গ্রামে থাকে অনেকগুলো পেশাদার জনগোষ্ঠি। যাদের দ্বারা ভদ্রাসনের সকলেই পরস্পর সুখও শান্তি তে বসবাস করতে থাকে। যেমন একটি গ্রামের সাথে থাকে একটি হাট, বিদ্যালয়, এক বা একাধিক মসজিদ কিংবা মন্দির, গোচারণ ভূমি ইত্যাদি। নড়াইল জেলার এমন সার্বভৌম গ্রামের সংখ্যা অনেক। তবে ঐ সব গ্রামের শেষে গ্রাম শব্দটি যুক্ত না হলেও বেশ কিছু গ্রাম বা স্থানের নামের শেষে গ্রাম শব্দটি যুক্ত হয়েছে- যেমন, মাইগ্রাম, কুরিগ্রাম, বীরগ্রাম, বনগ্রাম, জঙ্গলগ্রাম, নোয়াগ্রাম ইত্যাদি।

খালি : নড়াইল জেলায় ছিল একসময় অসংখ্য নদী, খাল ও বাওড়। আজো আছে নদী খাল ও বাওড়ের ভরাটভূমির বেশ কিছু স্থান বা বসতি। অনেকগুলো খালের ভরাট স্থান একটি বিশেষ নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে (খাল+ই) স্থান নাম হয়েছে। এবার দেখুন নড়াইল জেলার খাল বা খালি যুক্ত কয়েকটি স্থান নাম : খলিসাখালি, ধোপাখালিচর, ইচেখালি ইত্যাদি।

খোলা : আরবি 'কৌল' শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয় শর্ত।[৬] স্থানীয় ভাবে জানা যায়, মুঘল শাসনামলে জমিদার-জায়গিরদারদের কাছ থেকে যে সমস্ত লোক শর্ত সাপেক্ষ কাজের বিনিময়ে জমি গ্রহণ করতো তাদের নির্দিষ্ট জমিকে বলা হতো কৌল বা কোল বা কোলা বা খোল বা খোলা। মোট কথা 'কৌল'-এ পাওয়া এলাকা পরবতীকালে খোলা নামে পরিচিতি পায়। নড়াইল জেলার খোলা অন্তে কয়েকটি স্থাননাম নিম্নে দেওয়া হলো, মহিষখোলা, গুয়াখোলা, চুনখোলা, শামুখখোলা, সুমেরুখোলা ইত্যাদি।

তলা : 'তল' শব্দের অন্তে 'আ' প্রত্যয় যোগে 'তলা' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণত সমতল ভূমিকে বুঝতে তলা শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে। বিশেষত নড়াইল জেলা এলাকায় বৃক্ষ বেষ্টিত সমতল স্থানকে তলা বলে। স্থাননামের শেষে তলা যুক্ত কয়েকটি স্থান নাম নিম্নে দেওয়া হলো, ডুমুরতলা, চালিতাতলা, তালতলা, ডওয়াতলা, শড়াতলা ইত্যাদি।

গাঁতি : জমিদারির এক একটি অংশকে বলা হতো গাঁতি। যে ব্যক্তি মূল জমিদারের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট ভূমি রাজস্বের বিনিময়ে ইজারা গ্রহণ করতেন তার নামে হতো গাঁতির নাম। এই ভাবে ব্যক্তির কিংবা পদবির নামে গাঁতি যুক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে স্থাননাম-যেমন, বড়োগাঁতি, শুড়িগাঁতি, নড়াগাঁতি, তেলিগাঁতি লোহারগাঁতি, মদনগাঁতি ইত্যাদি।

বাড়ি বা বাড়িয়া বা বাড়া : বাড়া বা বারা ফারসি শব্দ।[৭] অর্থ হলো ইমারৎ, গৃহ, সুরক্ষিত ভবন, যেমন, ঈমামবাড়া। বাংলা বাড়ি শব্দটি ফারসি জাত। আর বাড়ি-এর

সাথে ইয়া প্রত্যয় যোগে সৃষ্টি হয়েছে 'বাড়িয়া'। অনেকে বাড়ি বা বাড়িয়াকে প্রাচীর ঘেরা স্থানকে বুঝাতে চেয়েছেন- ধারণাটি সঠিক নয়। নড়াইল জেলার কয়েকটি স্থাননামের শেষে বাড়ি কিংবা বাড়িয়া শব্দ যুক্ত হতে দেখা যায় - যেমন কলাবাড়িয়া, বেতবাড়িয়া, হাটবাড়িয়া, তেবাড়িয়া, কুচিয়াবাড়ি, সাতবাড়িয়া ইত্যাদি।

নড়াইল জেলার স্থাননামের শেষে আরো যে সব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায় তা হলো, ডাঙ্গা, চর, হাটি, ভিটা, গাছি, পাশা, বাগ ইত্যাদি। এবার আমরা দেখবো নড়াইল জেলার থানাওয়ারি ইউনিয়নভিত্তিক স্থাননাম ও তার ব্যাখ্যা। সরকারি নথিভুক্ত নয় এমন স্থানগুলোকে তারকা চিহ্নিত করা হবে।

নড়াইল সদর থানা

নড়াইল : কিংবদন্তি আছে, নড়াইলের জমিদারদের আদি পুরুষ গোপালদত্ত নৌকাপথে ঘুরতে ঘুরতে একটি স্থানে একজন মুসলিম ধ্যানস্থ ফকিরকে দেখে থেমে যান। ফকিরের হাতে ছিল নড়ি বা লাঠি। গোপাল ধ্যানস্থ ফকির বা আউলিয়ার সাহায্য চাইলে ফকির তার হাতের লাঠি গোপালকে আর্শিবাদ স্বরূপ দান করেছিলেন। এরপর নড়িয়ালের পরিচিতি থেকে স্থানের নাম হয় 'নড়াল'। 'পূর্বের 'নড়াল' ১৮৯৪ সালে নড়াইল হইল'।[৮] 'নড়াইল' নামটি স্থানীয়দের মুখে আজো 'নড়াল'-ই উচ্চারিত হয়ে থাকে। আলোচিত 'নড়াইল' বর্তমান জেলা সদর থেকে প্রায় ৩ মাইল দূরে (দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে) অবস্থিত। নড়াইল উপমহাদেশে খ্যাত একটি স্থান, নড়াইলের বিখ্যাত জমিদার পরিবারের জন্য। ১৯৪৭ সালের পূর্বেই ধীরে ধীরে নড়াইলের জমিদার পরিবার ভারতের পশ্চিমবাংলায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করে।

বাদুলিডাঙ্গা : স্থানীয় লোকের ধারণা, ব-আউলিয়া বা বু-আউলিয়া থেকে বদুলিয়াডাঙ্গা বা বাদুলিডাঙ্গা নাম হয়েছে। যে আউলিয়া বা ফকিরের (নড়িয়ালফকির) কাছ থেকে জমিদারদের পূর্বপুরুষ আর্শিবাদ স্বরূপ 'নড়ি' পেয়েছিলেন তিনিই মুঘল আমলে এখানকার মূল জায়গির বা জমির মালিক ছিলেন। সেই সাধক বা ফকিরের কোনো উত্তরাধিকার না থাকায় জমিদারদের পূর্বপুরুষ আর্শিবাদ স্বরূপ তা অধিকারে পেয়েছিলেন। এইভাবে পরবর্তীকালে ঐ স্থানের নাম হয়েছে বাদুলিডাঙ্গা।[৯] নড়িয়াল ফকিরের ইতিহাস বরাবর এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তাই তার নামটিও হারিয়ে গেছে সময়ের স্রোতে।

ব-খালি : ব-খালি নামটির মূলে ছিল ব-আউলিয়া খাল। সেই ব-আউলিয়ার শুধুমাত্র 'ব' টুকু পেয়ে ব-খালি নামটি আছে। ব-খালি স্থানটি এক সময় নড়িয়াল ফকির বা ব-আউলিয়ার অধীনস্থ ছিল বলে জানা যায়। বর্তমান ব-খালি গ্রামে নড়াইলের জমিদারদের এক শরিকের পুরানো বাড়িতে আলোচিত নড়িয়াল ফকিরের কবর আছে বলে জানা যায়। ঐ বাড়িটির মালিক সাবরেজিষ্টার মরহুম গফ্ফার মিয়ার পরিবার পরিজন।[১০] নড়াইল জমিদারদের কাছে কবরটি ছিল বিশেষ সম্মানের।

কুরিগ্রাম : প্রাচীনকালে কুরি বা গুড়বিক্রেতারা এলাকায় প্রথম বসতি স্থাপন করে। সুলতানি শাসনামলে এখানে একটি সেনাছাউনি ও রাজস্ব আদায় কেন্দ্র ছিল। কুরিগ্রামের

প্রশাসনিক নাম ছিল কিসমত কুরিগ্রাম। মৌজা হিসেবে 'কিসমত কুরিগ্রাম' আজো বহাল আছে।[১১] কুরিগ্রামের যে-কোনো স্থানের মাটি খনন করলে প্রাচীনকালের গুড়ের হাঁড়ি বা বড়ো বড়ো মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ বা চাড়া পাওয়া যায়। এখানেই রয়েছে বিশ্বনন্দিত চিত্রশিল্পী শেখ মোহাম্মদ সুলতানের আর্ট গ্যালারি, শিশুস্বর্গ ও তাঁর কবরস্থান।

আলাদাতপুর : আলাদাতপুর একটি প্রাচীন গ্রাম। মুঘল শাসনামলে স্থানটি তরফের মর্যাদা পেয়েছিল। এর আগে ছিল ডিহি। নড়াইলের জমিদারদের পূর্বপুরুষ রাণী ভবানীর জমিদারি এষ্টেট থেকে প্রথম তরফ আলাদাতপুর ক্রয় করেছিলেন। মুসলিম শাসনামলে সম্ভবত সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে আলাদাতপুর নামকরণ হয়।[১২] 'আল-দাদপুর' থেকে আলাদাতপুর শব্দটি এসেছে।

মহিশাখোলা : সুলতানি শাসনামলের সাধক মহিউদ্দিন শাহ নামক ইসলাম প্রচারকের প্রথম ডেরা ছিল এখানে। এই ব্যক্তি পরে লোহাগড়ায় মধুমতির তীরে অবস্থান করেন। স্থানটির নাম হয় মহিশাপাড়া। মহিশাহের প্রথমডেরার নাম হয় 'মহিশাকোলা'। এই মহিশাকোলা পরবর্তীকালে মহিশাখোলার রূপ নেয়।[১৩] মহিশাখোলা মৌজার নীলকুঠিতেই প্রথম নড়াইল মহকুমা প্রশাসনকেন্দ্র স্থাপিত হয়। মহিশাখোলার সেই পুরানো বাসভবনের পাশেই অবস্থিত বর্তমান নড়াইল জেলা প্রশাসকের বাসভবন।

বেতবাড়িয়া : বেতবাড়িয়া গ্রামটি নড়াইলের নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত। এখানে বেতগাছ উৎপাদনের কোনো পরিবেশ ছিল না। আজো বেতবাড়িয়ায় কোনো বেত গাছ নেই। এক সময় ঘরবাড়ি নির্মাণে সম্পদশালী লোকেরা গিট দিতে বেত ব্যবহার করতো। তা ছিল যেমন ব্যয় বহুল তেমনি খ্যাতির পরিচায়ক। গ্রামে প্রথম বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে কেউ বেতের সাহায্যে বাড়ি বা ঘর নির্মাণ করেছিল বলে স্থানের নাম হয়েছে বেতবাড়িয়া।[১৪]

ধোপাখালি : নড়াইলের জমিদারদের চাকরান পাওয়া ধোপা সম্প্রদায়ের লোকেরা বসতি পেয়েছিল গ্রাম নড়াইলের দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে। ধোপাবাড়ির কাছ দিয়ে প্রবাহিত হতো এক সময় ছোট একটি খাল। নাম ছিল ধোপার খাল। ঐ ধোপার খালের ভরাট কূলে গড়ে ওঠে একটি গ্রাম। এরপর স্থানের নাম হয়েছে ধোপাখালি।[১৫]

মাছিমদিয়া : প্রাচীনকালে চিত্রানদীর পশ্চিমপাড় দ্বীপময় ছিল। অনেকগুলো ছোটো ছোটো দ্বীপের মধ্যের দ্বীপটিকে মধ্যদ্বীপ বা মাঝখানের দ্বীপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সেই মধ্যদ্বীপই লোকমুখে সহজতর হয়েছে মাছিমদিয়া নামে।[১৬] এই মাছিমদিয়া গ্রামেই বিশ্বনন্দিত শিল্পী শেখ মোহাম্মদ সুলতান তার পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হন।

হাটবাড়িয়া : হাটের ন্যায় শব্দময় ও জাঁকজমকপূর্ণ বাড়ি থেকে হাটবাড়িয়া নামের উৎপত্তি।[১৭] নড়াইলের জমিদারদের এক শরিক চিত্রা নদীর পশ্চিম তীরে বিশাল জমিদার বাড়ি নির্মাণ করেন। নতুন জায়গায় বাড়ি নির্মাণের জন্য স্থানটিকে হাটের মতোই দেখাতো। এখানে হাটবাড়িয়া জমিদার বাড়ির ধ্বংসস্তূপ ও ইসলামি মিশন কার্যালয় অবস্থিত।

ব্রাহ্মণডাঙ্গা : স্থানীয় একটি ব্রাহ্মণ পরিবার এই এলাকায় প্রথম প্রতিপত্তি স্থাপন করায় স্থানটির নাম হয় ব্রাহ্মণডাঙ্গা।

কাশিয়াড়া : কাশিয়াড়া এই নামটির পেছনে কাশবনের 'গাড়া' বা গর্ত বা 'আড়া' কাজ করেছে। প্রথম বসবাসকারীরা কাশবন ও আড়া দেখতে পেয়ে 'কাশআড়া' নামকরণ করেছিল। নামটি লোকমুখে উচ্চারিত হতে হতে কাশিয়াড়ার রূপ নিয়েছে।

গন্দব : গন্দব নামটির মূলে খন্দক শব্দটি ছিল কি না তা আজ আর জানবার উপায় নেই। 'খন্দক' আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো গর্ত বা খানা।

মথুরাপুর : মথুরাপুর স্থান নামটির পেছনে রয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান মথুরার প্রভাব। অন্যমতে স্থানীয় মথুরানাথের নাম অনুসারে স্থানটির নাম হয়েছে মথুরা-পুর। হয় তো মথুরানাথই এই গ্রামের প্রথম বাসিন্দা।

কলাইতলা : প্রাচীনকালে একটি কড়াই গাছের নিকটে প্রথম বসতি গড়ে ওঠে। আর ঐ গাছের নামে স্থাননাম হয় কড়াইতলা। পরবর্তীকালে কড়াইতলা উচ্চারণ হতে হতে কলাইতলায় রূপ নেয়।

উজিরপুর : সুলতানি শাসনামলে চিত্রানদীর পশ্চিম তীরে খাজনা আদায়ের লক্ষ্যে যে স্থানে উজিরের কাচারি বা রাজস্বকেন্দ্র ছিল সেই স্থানটি উজিরপুর নামে পরিচিতি পায়। বারো ভূঁইয়াদের শাসনামলে গোটা নড়াইল জেলা রাজা মুকুন্দরাম রায় ও তৎপুত্র শত্রুজিত রায়ের জমিদারির অধীন ছিল। রাজা শত্রুজিৎ মুঘলের বিরোধিতা করলে উজিরপুরে সুবাদার ইসলাম খান চিশতির সেনাপতি ইফতেখার খাঁ-র নিকট পরাজিত হন। উজিরপুরের কেল্লা মুঘলদের দ্বারা পদানত হয়। এই ঘটনা ১৬০৯ সালের। সমসাময়িক সেনাপতি মির্জানাথানের লেখা 'বাহারীস্তান-ই-গায়বি'[১৮] ও আবদুল লতিফের লেখা 'বাহারিস্তান'[১৯] পাঠে এই ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। রাজা শত্রুজিতের পরাজয়ের পরে উজিরের কাচারিতে নিয়োগ পেয়েছিলেন সম্ভবত কেশব রায় নামের এক কর্মচারী। কেশব রায় সাধারণ মানুষের কাছে রাজা বলে পরিচিতি পান। এবং উজিরপুরের প্রাচীন কাচারি বাড়ি কেশব রাজার বাড়ি নামে আজো পরিচিত। উজিরপুরে সুলতানি শাসনামলের সুপ্রাচীন ইমারতসমূহের ধ্বংসাবশেষ আজো দেখতে পাওয়া যায়।[২০]

বিজয়পুর : বিজয়পুর একটি প্রাচীন গ্রাম। বিজয়পুর ঐতিহাসিক উজিরপুর গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিত। সম্ভবত মুঘল সেনাবাহিনী উজিরপুরের যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসেবে জায়গাটির নাম রেখেছিল বিজয়পুর।

মুলিয়া ইউনিয়ন

শালিয়ার ভিটা : শালিয়ার ভিটার কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্ভবত জালিয়ার ভিটা বা জেলের ভিটা থেকে বিকৃত হয়ে শালিয়ার ভিটা নাম হয়েছে।

মুলিয়া : মূলদ্বীপ কিংবা মূলদিয়া থেকে মুলিয়া নামটি এসেছে।

বালিয়াডাঙ্গা : বালু বা বালিময় ভূমির ডাঙ্গা থেকে বালিয়াডাঙ্গা নামটি এসেছে।

হিজলডাঙ্গা : নড়াইল এলাকার নিচু অঞ্চলে হিজলগাছ দেখতে পাওয়া যায়।

হিজলগাছ যুক্ত স্থানে বা ডাঙ্গায় বসতি স্থাপনের পর স্থানটির নাম হয়েছে হিজলডাঙ্গা।

দুর্বাজুড়ি : দুর্বাঘাসের আধিক্যজনিত কারণে স্থানের নাম হয়েছে দুর্বাজুড়ি বা দুর্বাঘাস জোড়া যুক্ত স্থান।

সীতারামপুর : সীতারামপুরের নামকরণ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবত হিন্দুদের দেবদেবী সীতা ও রামের স্মরণে স্থানটির নাম রাখা হয়েছে সীতারামপুর।

বাঁশভিটা : বাঁশের আধিক্যজনিত কারণে স্থানটির নাম হয়েছে বাঁশভিটা। পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে ভিটার উপরের লম্বা বাঁশ গাছ গ্রামটিকে আজো বাঁশভিটা হিসেবে চিহ্নিত করে।

গোয়ালবাড়ি : এই স্থানে প্রথম বসতি স্থাপন করে গোয়ালা সম্প্রদায়ের লোকেরা। প্রথম বসতি স্থাপনকারী গোয়ালবাড়ি থেকে স্থানের নাম হয়েছে।

পানতিতা : পানতিতা নামের সাথে যুক্ত হয়ে আছে স্থানীয়ভাবে পানের বরজসংক্রান্ত বিষয়-আশায়। পানের যেমন বিভিন্ন প্রজাতি রয়েছে– তেমনি রয়েছে তার স্বাদের বৈচিত্র্য। ঝাল পান, মিষ্টি পান ইত্যাদি এই স্থানের উৎপাদিত পানের স্বাদ তিক্ত বা তিতা হওয়ায় স্থানের নাম হয়েছে পানতিতা।

সাতঘরিয়া : সাতটি ঘর বা পরিবার প্রথম এই গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করে। এইভাবে এলাকায় স্থানটি সাতঘরিয়া নামে পরিচিতি পায়। এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে গ্রামের নাম। সাতঘরিয়ায় এখন অনেকগুলো পরিবারের বসত। কিন্তু নামটি সাতঘরিয়াই রয়ে গেছে।

গোয়ালডাঙ্গা : গোয়ালাদের দখলকৃত বা অধিকারভুক্ত ডাঙ্গা বা স্থান বলে স্থানের নাম হয়েছে গোয়ালডাঙ্গা।

ননিক্ষির : গোয়ালডাঙ্গার পার্শ্ববর্তী স্থানের নাম ননিক্ষির। এস্থান এক সময় গোয়ালাদের উৎপাদিত ননী ও ক্ষিরের জন্য বিশেষ পরিচিতি পায়। এই পরিচিতি থেকে স্থানের নাম হয় ননিক্ষির।

বড়েন্দার : প্রাচীন নদী (কালিগঙ্গা)র প্রবাহের উপর যে বড়োদহ সৃষ্টি হয় সেই বড়োদহ হতে বড়েন্দার নামের উৎপত্তি। এখানে তে-ভাগা আন্দোলনকারীদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল।

বনগ্রাম : প্রাচীন বনসমৃদ্ধ এলাকায় যে গ্রাম বা বসতি গড়ে উঠেছিল তাকে এখন বলা হয় বনগ্রাম।

ইছরবাহা : সম্ভবত 'কি শ্রীর বহার' থেকে ইছরবাহা নামটি এসেছে। ফার্সি বহার শব্দের অর্থ হলো সমুদ্র। নড়াইল জেলা এলাকায় বড়ো বড়ো হাওড় বা জলাশয়কে বহার, দরিয়া বা সমুদ্রের সাথে তুলনা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ব্যঙ্গার্থে জলাশয়কে বলা হয়েছিল সমুদ্র– যেখানে বসতি স্থাপনের পর হয়েছে এই নাম।

মাইচপাড়া ইউনিয়ন

ধরিয়াঘাটা : নড়াইল জেলা এলাকায় প্রচুর বিল বাওড় ছিল–যা আমরা আলোচনা করেছি। জলাশয়ের বড়ত্বকে বুঝানোর জন্য বলা হতো দরিয়া। দরিয়া বা জলাশয় ঘাট

থেকে শব্দটি হয়েছে ধরিয়াঘাটা।

কালুখালি : কালু নামের কোনো ব্যক্তির প্রাচীন বসতির পাশের খালকে কেন্দ্র করে স্থানের নাম হয়েছে কালুখালি।

খাটুর মাগুরা : খাটুর মাগুরা শব্দ দ্বারা .বাঝানো হয় খাটো বা ছোটো মাগুরাকে। কারণ অদূরে একটি বিখ্যাত স্থানের নাম হলো মাগুরা। বিখ্যাত মাগুরা বা বড়ো মাগুরা থেকে স্থানটিকে পৃথকভাবে বুঝানোর জন্য বলা হলো 'খাটো মাগুরা'। খাটো মাগুরা এক সময় খাটুর মাগুরায় রূপ নিয়েছে।

তালেশ্বর : তালেশ্বর নড়াইল জেলার একটি সুপ্রাচীন গ্রাম। প্রাচীনকালের তালগাছের সারি থেকে পরবর্তীকালে তালেশ্বর নাম হয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দ্যাকরের বিখ্যাত পুত্র ধর্ম তালেশ্বরের বসতি স্থাপন করেন। ধর্মের অধস্তন ৫ম বংশধর পদ্মনাভ ১৪৪০ সনে এই তালেশ্বরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বৈষ্ণবগুরু অদ্বৈতাচার্যের সমসাময়িক সাধক, সাথী ও বন্ধু ছিলেন। পদ্মনাভের পুত্র সাধক লোকনাথ ছিলেন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের শিষ্য ও সমসাময়িক।[২১]

মাইচপাড়া : মাইচপাড়া তালেশ্বর গ্রামের মাঝপাড়া বা মধ্যপাড়া। পরবর্তীকালে মাইচপাড়া নামে পরিচিতি পেয়ে একটি পৃথক গ্রামের মর্যাদা পেয়েছে।[২২]

মাইচপাড়াকে এক সময় 'ভবেৎকাশি' বলা হতো। কাশি থেকে পণ্ডিত আনিয়ে এখানকার ৪টি টোল পরিচালিত হতো।[২৩]

লোকনাথপুর : বিখ্যাত বৈষ্ণব পদ্মনাভের পুত্র মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের শিষ্য লোকনাথ-এর নামানুসারে স্থানটির নাম হয়েছে লোকনাথপুর।[২৪]

কান্তালবাড়িয়া : স্থান নামটি কোনো ব্যক্তির নামের সাথে যুক্ত বলে জানা যায়। কারো নামের শেষে কান্ত যুক্ত ছিল। সেই ব্যক্তিই এখানে প্রথম বসতি স্থাপন করায় স্থানটির নাম হয়েছে কান্তবাড়িয়া বা কান্তালবাড়িয়া।

পোড়াডাঙ্গা : পোড়া বাও বা বাতাসে মাঝে মাঝে আমন ধানের ডাঙ্গা পুড়ে যায়। অনেক আগে আমন ধানের ডাঙ্গা পুড়ে যাওয়ার স্থানটি পোড়াডাঙ্গা নামে পরিচিতি পায়। ঐ পোড়াডাঙ্গায় এক সময় বসতি স্থাপিত হওয়ায় স্থানের নাম হয় পোড়াডাঙ্গা।

হোসেনপুর : সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের নাম অনুসারে স্থানটির নাম হয় হোসেনপুর। কারো কারো মতে, ঐ এলাকার লোক পিরালি মুসলমানদের দ্বারা ধর্মান্ত রিত হয়। সুলতানি শাসনামলে হোসেনপুরে একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। এখানে কাজির বিচারের জন্য কাজি নিযুক্ত ছিলেন। প্রাচীন কাজির বংশধরেরা আজো এই গ্রামে বসত করছেন। গ্রামে রয়েছে একটি প্রাচীন বাড়ি। হোসেনপুরের প্রশাসনিক কর্মে মির, মোল্যা, শিকদার ও বিশ্বাস বংশীয়রা যুক্ত ছিলেন। হোসেনপুরের প্রাচীন কাজির বংশধর আবদুল হাশেম কাজি প্রমুখ।[২৫]

দৌলতপুর : সুলতানি শাসনামলে এই অঞ্চলে হোসেনপুরসহ যে কয়েকটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে দৌলতপুর তার মধ্যে অন্যতম। দৌলত নামে জনৈক ব্যক্তির নাম অনুসারে দৌলতপুরের নামকরণ হয়েছে।

আদমপুর : যশোহর-খুলনার ইতিহাসে এই এলাকার মাইচপাড়ায় 'পিরালি অত্যাচারে'র তথ্য পাওয়া যায়। কেমন অত্যাচার হয়েছিল তা লিপিবদ্ধ হয় নি। তবে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনামলে এই অঞ্চলে যেমন ইসলামের প্রচার হয়েছিল তেমনি বেশ কিছু গ্রাম-জনপদ মুসলমানদের দ্বারা সৃষ্টি হয়। আর সেই নামগুলো ছিল ব্যক্তির নামকে কেন্দ্র করে। হোসেনপুর, দৌলতপুর ও আদমপুর তেমনি ৩টি গ্রাম।

রামপুর : হিন্দুদের দেবতা রামের নামে স্থানটিনর নাম রামপুর। অর্থাৎ রামের অধিষ্ঠান।

দুর্গাপুর : হিন্দুদের আরাধ্য দেবী দুর্গার নামে দুর্গাপুর স্থান নামটি হয়েছে।

উরানি : সম্ভবত স্থানটির পূর্ব নাম ছিল উজানি। ধীরে ধীরে তা উরানিতে রূপ নেয়। এই স্থানকে ভাটির লোকেরা এই নামে চিহ্নিত করেছিল।[২৬]

কল্যাণখানি : পূর্ব নাম ছিল কল্যাণখানা। কল্যাণ ছিল এখানে প্রথম বসবাসকারী ব্যক্তির নাম। কল্যাণের খানা বা কল্যাণের বাড়ি থেকে কল্যাণখানি স্থান নাম হয়েছে।[২৭]

তারাসি : 'তরা' শব্দ দ্বারা বোঝায় যে স্থানে (নদী কিংবা জলাশয়) পানির গভীরতা হ্রাস পেয়েছে এবং পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। এইভাবে তরার ঘাটের অধিবাসী থেকে তরার বাসী শব্দটি এসেছে। অর্থাৎ তরার ঘাটের বাসিন্দাকে লক্ষ্য করে স্থান নাম হয়েছে তারাসি।[২৮]

ডহরতারাসি : নড়াইল জেলা এলাকায় ডাঙ্গা বা উঁচু স্থানের সমার্থক শব্দ হলো 'ডর' বা 'ডহর'। এই এলাকায় ডাঙ্গাডর যুগ্ম শব্দও ব্যবহার হতে দেখা যায়। তারাসি গ্রামের যে অংশটি দ্বীপ ভূমি বা ডহর হিসেবে জেগে উঠে, লোক বসতি সৃষ্টি হয় তাকেই ডহরতারাসি বলা হয়েছে।[২৯]

রামেশ্বরপুর : এই এলাকায় প্রথম বসতি স্থাপনকারী রামেশ্বরের নামে হয়েছে রামেশ্বরপুর স্থাননাম।[৩০]

সালুয়া : *সালুয়া শব্দটি নালা (খাল) বা নালুয়া শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে।* নদীর সঙ্গে সম্পৃক্ত নালায় বসতি স্থাপন করায় স্থানটির প্রথম নাম হয় নালুয়া। নালুয়া বিকৃত হয়ে রূপ নিয়েছে সালুয়ায়।

চারিখাদা : এক লাঙ্গলে চাষকরা জমি বা ১৬ বিঘা জমিকে বলে ১ খাদা। স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে শোনা যায়, ৪ খাদা বা ৬৪ বিঘা জমি মুসলিম শাসনামলে পেয়ে জনৈক মুসলমান পত্তনিদার এখানে বসতি স্থাপন করেন। তাই স্থানের নাম হয়েছে চারিখাদা।

বলরামপুর : বলরাম নামের জনৈক ব্যক্তি এইস্থানে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। বলরামের নাম অনুসারে স্থানের নাম হয়েছে বলরামপুর।[৩১]

পার বলামপুর : পার বলরামপুর মূল বলরামপুর গ্রামের অংশ বিশেষ। নদীর পরপারে বলে গ্রামের নামের আগে পার শব্দটি যুক্ত হয়েছে।

আতোষপাড়া : আতোষ নামের জনৈক মুসলমান এখানে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। সেই আতোষের নাম অনুসারে নাম হয়েছে আতোষপাড়া।

শাহবাদ ইউনিয়ন

চরবিলা : বিল বা বাওড়ের কাছে জেগে ওঠা চরে যে বসতি গড়ে ওঠে তা-ই চরবিলা নামে পরিচিতি পায়।

ময়েনখোলা : ময়েনউদ্দিন নামের একজন লোকের ইজারা নেওয়া কোলা বা জমিকে ময়েনখোলা বলে। এই ময়েনখোলা এখন একটি গ্রামের নাম।[৩২]

ধোনদহ : শিরোমণি সাহা ও রূপনারায়ণ সাহা দুইজন লবণ ব্যবসায়ী বিশেষ সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। আজো ঘোড়াখালি নদীর পশ্চিমতীরে ধনী সাহাদের বিশাল পরিত্যক্ত বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। রূপনারায়ণ সাহার বাড়ির সামনে আজো বিশালদহ দেখতে পাওয়া যায়। স্থানটিকে ধনীরদহ বলা হতো এক সময়। কয়েক শত বছরের ব্যবধানে ধনীরদহ স্থানটি ধোনদহ নামে পরিচিতি পেয়েছে।

তুষারডাঙ্গা : রেকর্ডভুক্ত তৌজিরডাঙ্গা থেকে স্থানটির নাম হয়েছে তুষারডাঙ্গা।

দলজিৎপুর : দলজিৎপুর স্থান নামের তেমন কোনো ঐতিহাসিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। কেউ কেউ ধারণা করেন, স্থানীয় নীলবিদ্রোহী কৃষকদল জয়ী হয়ে যে স্থানে সমবেত হন সেই স্থানই পরবর্তীকালে দলজিৎপুর নাম হয়েছে।[৩৩]

সরসপুর : সরস বা সতেজমাটির স্থানকে স্থানীয় লোকেরা সরসপুর নাম দিয়েছে।

গোপীকান্তপুর : গোপীকান্ত নামীয় একজন লোক এখানে প্রথম বসতিস্থাপন করেন। তার নামেই হয়েছে স্থান নাম।[৩৪]

সদানন্দ কাঠি : নড়াইল জেলা এলাকায় প্রথম বসবাসকারী ব্যক্তি যিনি বা যাঁরা নলনটা কেটে বসতি স্থাপন করেন তাঁকে বা তাঁদের 'কাঠিকাটা' বলে সম্মানিত করা হয়। সদানন্দ তেমনি একজন 'কাঠিকাটা', এই ভাবে স্থানের নাম হয়েছে সদানন্দ কাটি।

দত্তপাটি : দত্ত উপাধিধারী কায়স্থ বংশের লোকেরা এখানে প্রথম বাটী বা বাড়ি নির্মাণ করেন। এইভাবে স্থান নাম হয় দত্তবাটী। কিন্তু সাধারণ মানুষের উচ্চারণ বিভ্রাটে বাটির স্থলে হয়েছে পাটি।

নারায়ণপুর : হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবতা নারায়ণের নামানুসারে স্থানটির নাম হয়েছে নারায়ণপুর।[৩৫]

আলুকদিয়া : প্রাচীন জলাশয় থেকে প্রথম জেগে ওঠা সূর্যের আলোকপ্রাপ্ত দ্বীপই 'আলোকদ্বীপ' হিসেবে পরিচিতি পায়। আলোকদ্বীপ ক্রমান্বয়ে আলোকদিয়া ও আরো পরে আলুকদিয়া নামে পরিচিত পায়।

চাঁদপুর : চাঁদ নামের কোনো ব্যক্তির দ্বারা এলাকায় প্রথম বসতি স্থাপন হওয়ায় স্থানের নাম হয়েছে চাঁদপুর।

জুড়ুলিয়া : নড়াইলের জমিদার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে স্থানীয় গাঁতিদারদের ওপর সেচকর বাড়িয়ে দিলে নড়াইল জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। স্থানীয় লোকেরা গুরুল বাঁশের সাহায্যে জমিদার বাহিনীকে প্রতিহত করেন। এইভাবে গুরুল থেকে গুরুলিয়া এবং গুরুলিয়া থেকে জুড়ুলিয়া স্থান নাম হয়।[৩৬]

মাহাজন : মহাজন বা ধনী লোকদের বসতিস্থান বলে এখানের নাম হয় মহাজন। মহাজন বিকৃত হয়ে 'মাহাজন' স্থাননাম হয়েছে।

নয়নপুর : নয়াপুর বা নতুন বসতি থেকে স্থাননাম হয়েছে নয়নপুর।

বিষ্ণুপুর : জনৈক বিষ্ণুচরণের নামানুসারে স্থানের নাম হয়েছে বিষ্ণুপুর। প্রথম স্থানের নাম ছিল বিষ্ণুপুরী। সেই বিষ্ণুপুরী পরিবর্তিত হয়ে নাম হয়েছে বিষ্ণুপুর।

হবোখালি ইউনিয়ন

বাইখালি : নদীর বাঁক থেকে সৃষ্ট খাল তাকে বাঁকের খাল বলা হতো। বাঁখের খাল থেকে হয়েছে বাঁকেরখালি। এবং বাঁকের খালি পরবর্তীকালে বাইখালিতে রূপায়িত হয়েছে।

সিঙ্গিয়া : সিঙ্গিয়া নামটি 'সিংহদের দ্বীপ' বা সিংদিয়া থেকে এসেছে। সিংহ বংশীয়েরা প্রথমে যে দ্বীপচরে বসতি স্থাপন করেন সেই স্থানটি সিঙ্গিয়া নামে পরিচিতি পেয়েছে। ধীরে ধীরে সিঙ্গিয়া পাশাপাশি ৫টি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামে বিভক্ত হয়েছে। এইগুলো যথাক্রমে, চরাঞ্চলকে চরসিঙ্গিয়া, বাজার এলাকাকে সিঙ্গিয়াবাজার, দাসদের বসতি স্থানকে দাসসিঙ্গিয়া, সিঙ্গিয়াকালুপাড়া নামে পরিচিতি পেয়েছে।

রোমখালি : ভীষণ বা ভীম রূপধারণকারী খালের ভরাট তীরে বসতি স্থাপন করায় স্থানের নাম হয় ভীমখাল। ভীমখাল থেকে এসেছে ভীমখালি। এই ভীমখালি এখন রোমখালি স্থান নামে পরিচিতি পেয়েছে।

হরিঘরা : হরির উপাসনার জন্য এলাকায় প্রথম হরিঘর বা হরিমন্দির নির্মাণ করা হয়। সেই হরিঘর থেকে স্থাননাম হয়েছে হরিঘরা।[৩৭]

ডুমুরতলা : ডুমুর গাছকে কেন্দ্র করে স্থানের নাম হয়েছে ডুমুরতলা। ডুমুরতলার বর্ধিত দুটো অংশ আরো দুটো সার্বভৌম গ্রামের মর্যাদা পেয়েছে। এই দুটো গ্রাম হলো বিলডুমুরতলা ও জয়দেবপুর-ডুমুরতলা। ডুমুতলার বিল অংশে বসতি স্থাপন হলে তার নাম হয় বিলডুমুরতলা। জয়দেব নামের ব্যক্তির বসতি স্থল সংলগ্ন স্থলকে বলা হয় জয়দেবপুর ডুমুরতলা।[৩৮]

নয়াবাড়ি : নতুন বা নয়াবাড়ি থেকে স্থাননাম হয়েছে। নবগঙ্গা নদীর তীরে এই নয়াবাড়ি বর্তমান। এখানে অজ্ঞাত রাজার রাজবাড়ির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এখানে রয়েছে পুরো রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। রাজবাড়িটিকে একটি কেল্লা বা দুর্গ ধরা যায়। শত্রুর আক্রমণে গোপনে পালিয়ে যাওয়ার জন্য কেল্লা থেকে নবগঙ্গা নদী পর্যন্ত পাতলা ইটের সুড়ঙ্গ আজো দেখতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা, অজ্ঞাত রাজার দুর্গের পাশে ঈমামবাড়ি, সিপাইখানা, সিংহদরোজা, দুর্গের চারপাশের গড় দেখিয়ে থাকে।[৩৯]

উত্তরবাঁকদরিয়া : নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে গোগ পড়ে বিশাল জলাশয় সৃষ্টি হয়। ঐ জলাশয়কে সাধারণ লোক দরিয়া বা সাগরের সাথে তুলনা করে। নদীর বাঁক-এর স্থলে পরবর্তীকালে বসতি স্থাপনের ফলে স্থানের নাম হয়েছে বাঁকদরিয়া। আরো পরে বৃহৎ জনপদের বিভক্তি হয়েছে উত্তর-দক্ষিণে। এবং উত্তর অংশ হয়েছে উত্তর বাঁকদরিয়া স্থাননাম।

হবোখালি : জনশ্রুতি আছে, জনৈক ভবার নাম অনুসারে প্রথমে খালের নাম হয়েছিল। এইভাবে স্থানের প্রথম দিকের নাম ছিল ভবাখাল বা ভবোখালি। ভবোখালির পরিবর্তিত রূপ হবোখালি।

ভাণ্ডারিপাড়া : গ্রামের সমৃদ্ধ অংশের নাম দেওয়া হয়েছিল ভাণ্ডারিপাড়া।

ভাণ্ডারিপাড়া পরবর্তীকালে গ্রামের মর্যাদা পেয়েছে।

সাবুডিডাঙ্গা : আবাদিডাঙ্গা থেকে সাবুডিডাঙ্গা হয়েছে স্থানের নাম। ডাঙ্গা বা সমতল চরে আবাদের শুরুতে জায়গাটির নাম হয়েছিল আবাদিডাঙ্গা। স্থানটি পরবর্তীকালে গ্রামের মর্যাদা পেয়েছে।

সাধুখালি : সাধু উপাধিধারী কোনো ব্যক্তি প্রথম খালের তীরে বসতি স্থাপন করায় খালটির নাম হয় সাধুরখাল। আর সাধুর খাল থেকে হয়েছে সাধুখালি।

ইছনদিয়া : শন বা ছন দ্বীপ থেকে স্থানের নাম হয়েছে ছনদিয়া। এই ছনদিয়া থেকে হয়েছে ইছনদিয়া। ছন বা শন জন্মাতো যে দ্বীপ চরে তা-ই হলো পরবর্তীকালে ইছনদিয়া।

হায়দারখোলা : হায়দার নামীয় এক ব্যক্তি প্রাচীনকালে কিছু জমি আবাদি সত্ব হিসেবে পেয়েছিলেন। স্থানের প্রাচীন নাম ছিল হায়দার কৌল বা কোলা। পরবর্তীকালের পরিবর্তিত উচ্চারণ হলো হায়দারখোলা।

কাগোচিপাড়া : কাগুজি একটি বংশীয় পদবি। প্রাচীনকালে যারা লেখার জন্য কাগজ তৈরি করতো তাদের বলা হতো কাগুজি। আর তাদের বসতি স্থানের নাম হয়েছিল এইভাবে কাগুজিপাড়া। উচ্চারণের বিকৃতির জন্য কাগুজিপাড়া হয়েছে পরবর্তীকালে কাগোচিপাড়া।

বাহিরডাঙ্গা : জনবসতির বাইরে সমতল উঁচু ভূমিকে বাইরের ডাঙ্গা বা বাহিরের ডাঙ্গা বলা হতো। এক সময় বাইরের ডাঙ্গায়ও গড়ে ওঠে জনবসতি। ধীরে ধীরে স্থানটি পায় গ্রামের মর্যাদা। আর বাইরের ডাঙ্গা ক্রমে রূপায়িত হলো বাহিরডাঙ্গা।

দুর্গাপুর : দেবী দুর্গার নামে স্থানটির নাম হয়েছে দুর্গাপুর। এই গ্রামের প্রথম বসতি স্থাপনকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা খুব জাঁকজমকের সাথে দুর্গাপূজা পরিচালনা করতো। এইভাবে স্থানটি হলো দুর্গারপুরি বা দুর্গাপুর।

রঘুনাথপুর : জনৈক রঘুনাথ যে এলাকায় প্রথম বসতি স্থাপন করে সেই এলাকাটি রঘুনাথপুর বা রঘুনাথের আবাসস্থল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। এলাকাটি গ্রামের মর্যাদা পেলে ঐ রঘুনাথপুর নামই বহাল থাকে।

ভাটিয়া : অপেক্ষাকৃত উত্তরাঞ্চল থেকে একদল লোক দক্ষিণ বা ভাটির অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এবং তারাই স্থানটিকে ভাটিরদিয়া বলে চিহ্নিত করে। এই ভাটিদিয়া আরো সংক্ষিপ্ত হয়েছে ভাটিয়া নামে।

বড়োগুইয়া : নড়াইল জেলার বিস্তৃর্ণ এলাকায় এক সময় ছিল জলাশয়। মাছ ছাড়া অন্যান্য জলজ প্রাণী এখানে বসবাস করতো। একটি দ্বীপময় জঙ্গল এলাকায় বাস করতো বড়ো বড়ো গুইসাপ বা রামগদি। এক সময় মানুষের প্রয়োজনে বড়ো গুইসাপের এলাকায় মানুষের বসতি শুরু হলো। বড়ো গুইসাপ পালিয়ে গেল কিন্তু স্থাননাম থেকে গেল বড়োগুইয়া।

চণ্ডিবরপুর ইউনিয়ন

শংকরপুর : শংকরপুরের নামকরণ সম্বন্ধে একাধিক ধারণা পাওয়া যায়। কারো মতে, দেবতা শংকর বা শিবের উপাসকদের প্রতিষ্ঠিত জনপদ বলে ভক্তরা স্থানের নাম

রাখে শংকরপুর। অন্যমতে, শংকর নামের কোনো বিশেষ ব্যক্তির নামে স্থানের নাম হয়েছে শংকরপুর।[৪০]

ফুলবাড়ি : এলাকায় প্রথম বসতিস্থাপনকারী ব্যক্তির বাড়িতে নানাজাতের ফুলগাছ লাগিয়ে বাড়ির মালিক যথার্থ ফুলবাড়িতে রূপায়িত করেছিলেন। সেই থেকে বাড়ির উপলক্ষে স্থানের নাম হয়েছে ফুলবাড়ি।[৪১]

গন্ধর্ব খালি : গন্ধর্ব নামের কোনো ব্যক্তি খালের তীরে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। তখন ঐ খালটিকে লোকে বলতো গন্ধর্বের খাল। সেই থেকে স্থানের নাম হয়েছে গন্ধর্ব খালি।[৪২]

রতডাঙ্গা : নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়ের জমিদারির অংশ ভুক্ত ডাঙ্গাকে প্রথমদিকে বলা হতো রতনবাবুর ডাঙ্গা। সেই রতনবাবুর ডাঙ্গা পরবর্তীকালে রতডাঙ্গায় রূপ নিয়েছে।[৪৩]

বাঁধাল : জমির সীমানা চিহ্নিত করার জন্য আগের দিনে বড়ো বড়ো আল নির্মাণ করা হতো। পানির তোড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই স্থানের প্রথম বসতি স্থাপনকারীরা বাঁধাআলের মধ্যে বাসগৃহ নির্মাণ করেছিল। সেই থেকে স্থানের নাম হয়েছে বাঁধাল।[৪৪]

জঙ্গলগ্রাম : বিশাল জঙ্গলের মধ্যে যে গ্রাম বা বসতি গড়ে ওঠে পরবর্তীকালে তা-ই জঙ্গলের গ্রাম নামে পরিচিতি পায়। জঙ্গলের গ্রাম থেকেই স্থানের নাম হয়েছে জঙ্গলগ্রাম।

চণ্ডিবরপুর : দেশের ইংরেজ শাসনের সূচনাপর্বে চণ্ডিবর নামক এক ব্যক্তি স্থানটির ইজারা নিয়ে বসতি স্থাপন করেন। চণ্ডিবর ছিলেন একজন জোতদার কিংবা গাঁতিদার। চণ্ডিবরের পুরি বা বাড়ি থেকে স্থানটির নাম হয়েছে চণ্ডিবরপুর।

রাজাপুর : এই গ্রামে কোনো রাজারাজড়ার বসতির সন্ধান পাওয়া যায় নি। কিংবা কোনো রাজার স্মৃতিচিহ্নও নেই। তবু স্থানের নাম রাজাপুর। সম্ভবত রাজা নামের কোনো ব্যক্তি এই এলাকায় প্রথম বসতি স্থাপন করায় স্থাননাম হয়েছে রাজাপুর।[৪৫]

চালিতাতলা : এখানে বসতি স্থাপনের পূর্বেই একটি বিস্তৃত চালিতা গাছ ছিল। স্থানটিতে লোকবসতি শুরু হলে এর নাম হয় চালিতাতলা।

গোয়ালবাথান : এই স্থানে প্রথম বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে ছিল গোয়ালা সম্প্রদায়ের লোক। স্থানের বৈশিষ্ট্য ছিল গোয়ালাদের পোষা গাভীর বাথান। গোয়ালদের গাভীর বাথান থেকে স্থানের নাম হয়েছে গোয়ালবাথান।[৪৬]

কুড়ালিয়া : কুড়ালিয়া নামটির অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। স্থানীয় লোকেরা মনে করেন প্রাচীনকালে যে দ্বীপে মরাল পাখিরা বাস করতো সেই দ্বীপ মরালদ্বীপ বা মরালদিয়া বলে পরিচিতি প্রায়। সেই মরালদিয়াই পরিবর্তিত হয়ে কুড়ালিয়া স্থাননাম হয়েছে।[৪৭]

শিবানন্দপুর : শিবা বা শৃগালের আনন্দপুরি থেকে শিবানন্দপুর স্থানের নাম হয়েছে। অর্থাৎ নির্জনজঙ্গলে শৃগাল ছাড়া কিছুই থাকতো না বলে স্থানের নাম হয়েছে এমন। এই স্থানে লোকবসতি হওয়ার পরেও ঐ নামটি বহাল রয়েছে। অন্য মতে, দেবতা শিবের মন্দিরের অবস্থান বা পুরি থেকে শিবানন্দপুর স্থাননাম হয়েছে।[৪৮]

ধুরিয়া-আমবাড়িয়া : ধুরিয়া শব্দটি দরিয়া বা জলাশয় থেকে এসেছে। অন্যদিকে আমগাছ সমৃদ্ধ বাড়ি হয়েছে স্থাননাম আমবাড়িয়া। শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় দরিয়া বা জলাশয়ের কাছে অবস্থিত আমবাড়িয়া স্থাননাম বা ধুরিয়া-আমবাড়িয়া।

চাকুলিয়া : প্রাচীন জমিদারির অংশ বা চক থেকে স্থাননাম হয়েছে চাকুলিয়া।

নিধিখোলা : নিধি নামীয় কোনো লোকের কৌল বা কোলা থেকে স্থানের নাম হয়েছে নিধিখোলা।

মহিষখোলা : মহিষের নির্দিষ্ট চারণভূমি থেকে স্থাননাম হয়েছে মহিষখোলা। মহিষের খোলা শেষ হয়েছে কতো আগে মহিষখোলা নামটি তবু আজো আছে।

পাইকমারি : ভোমরদিয়া–ফেদি এলাকায় নীলকুঠি ছিল। নীলচাষের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহ (১৮৬০) দেখা দিলে নীলবিদ্রোহীদের কাছে নীলকর সাহেবের পাইক (বরকন্দাজ) বাহিনী যে-স্থানে প্রচণ্ড মার খায় সেই স্থানটি পাইকমারা নামে পরিচিতি পায়। পাইকমারা পরবর্তীকালে পাইকমারি স্থাননামে পরিচিতি পায়।

ভোমরদিয়া : প্রাচীনকালে ভোমরদিয়া ছিল একটি দ্বীপাঞ্চল। বাঘ, কুমির, সাপ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর দ্বারা বেষ্টিত দ্বীপাঞ্চল ভীম বা ভীষণ বিপদসংকুল দ্বীপ বলে পরিচিতি পায়। লোকেরা স্থানটিকে ভীমদ্বীপ বা ভিমদিয়া এবং পরবর্তীকালে ভোমরদিয়া নামে স্থানটিকে চিহ্নিত করে।

ফেদি : ভোমরদিয়ার পাশেই ফেদি গ্রাম। নীলকুঠিয়াল ফেডি সাহেব এই স্থানে একটি নীলকুঠি স্থাপন করে। কুঠিয়াল ফেডির নাম অনুসারে স্থানের নাম হয়েছে ফেদি। হয়তো ফেদি গ্রামটি প্রাচীন ভোমরদিয়ার অংশ বিশেষ।

শিবানন্দপুরনাওরা : শিবানন্দপুর স্থাননাম নিয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে। শিবানন্দপুর গ্রামের সাথে রয়েছে বাজেশিবানন্দপুর ও শিবানন্দপুরনাওরা। শিবানন্দপুরের নিকটবর্তী স্থান শিবানন্দপুর নয় এমন স্থানের নাম ভূমি জরিপের সময় করা হয়েছে বাজে বা মিথ্যা শিবানন্দপুর। আর মুঘল সরকারের নওয়ারা বাহিনী বা নৌবাহিনী সংক্রান্ত শিবানন্দপুরের অংশকে নাম দেওয়া হয় শিবানন্দপুরনাওরা। শিবানন্দপুরের এই এলাকায় নওয়ারা বাহিনীর লোকদের অবস্থিতি ছিল।

বাগশ্রীরামপুর : নবগঙ্গা নদীর একটি বাঁকের উপরে বাকশ্রীরামপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের নাম প্রথমে ছিল শ্রীরামপুর। যা দেবতা শ্রীরামের নাম অনুসারে গৃহীত হয়। পরে বাঁক যুক্ত হয়ে এইভাবে 'বাঁকশ্রীরামপুর' গ্রামটি বাগশ্রীরামপুর নামে পরিচিতি পায়। এখানে একটি বড় ধরনের পাট ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল।[৪৯]

আউড়িয়া ইউনিয়ন

বোড়াবাদুরিয়া : এই আলোচনার প্রথম দিকেই বলা হয়েছে নড়াইল জেলার অধিকাংশ স্থান জল বা জলাশয় সংক্রান্ত। বাওড়কে এলাকার লোকেরা এক সময় (সুলতানি শাস-নামল থেকে) দরিয়া বলতো। দরিয়া বলে সমুদ্রের বৈরাট্যকে বুঝানো হতো। বারদরিয়া অর্থই হলো বড়োদরিয়া। সাধারণ মানুষ বড়ত্বকে আরো বড়ো করে দেখানোর জন্য বারদরিয়ার পূর্বে একটি বড়ো শব্দ যুক্ত করে বিরাট জলাশয়কে বলতো 'বড়বাদরিয়া'। বড়বাদরিয়া একদিন দ্বীপচর হয়ে লোকবসতির উপযোগী হলো। জলাশয় বা দরিয়া

কালে কালে লুপ্ত হলো, লুপ্ত হলো না সেই নামটি। তবে 'বড়োবারদরিয়া' লোক মুখে সংক্ষিপ্ত হয়ে বোড়াবাদুরিয়া স্থাননামে পরিণত হলো।

লস্করপুর : সুলতানি শাসনামলে এখানে সরকার-ই-লস্করের কোনো প্রশাসন কেন্দ্র ছিল বলে ধারণা করা যায়। এ জন্য স্থানের নাম হয় লস্করপুরি। লস্করপুরি থেকে লস্করপুর নাম হয়েছে স্থানের। জানা যায়, ৭০/৮০ বছর আগেও প্রাচীন লস্করদের উত্তর বংশধরেরা এখানে বসবাস করতেন। লস্করপুরে একটি প্রাচীন শহরও নৌবন্দর ছিল।[৫০]

সীমাখালি : ঐতিহাসিক লস্করপুরের সীমানার খালই সীমাখালি নামে পরিচিতি পায়। চিত্রা নদী থেকে প্রায় পূর্বদিকে বয়ে যাওয়া সেই খালের চিহ্ন মাত্রও নেই। দীর্ঘদিন আগে এস্থানে লোক বসতি গড়ে ওঠে এবং স্থানের নাম হয় সীমাখালি। সীমাখালির বামুনদের বসতিস্থল বামনসীমাখালি নামে পরিচিতি পেয়েছে।

উত্তরপংকবিলা : প্রাচীনকালে পংক বা কাদা যুক্ত বিলের নাম হয়েছিল পংকের বিল। সেই পংকের বিল থেকে পংকবিল। এবং পরবর্তীকালে বিল-এর সাথে 'আ' যুক্ত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে পংকবিলা। এখন স্থানটি উত্তর ও দক্ষিণ পংকবিলা নামে স্থাননাম হয়েছে।

আউড়িয়া : হাওড় ও বিলের সমন্বিত এলাকার নাম হয়েছিল হাওড়দ্বীপ। 'হাওড়দ্বীপ' অঞ্চল ক্রমে 'হাউড়দ্বীপ' এবং হাউড়দ্বীপ, আউড়দ্বীপ বা আউড়িয়ায় রূপান্তরিত হয়ে স্থাননাম হয়েছে।

কমলাপুর : দেবীদুর্গার এক নাম কমলা। এই এলাকার এক দেবীভক্ত দেবীদুর্গার স্মরণে স্থানের নাম রাখে কমলাপুরি। সেই কমলাপুরি থেকে কমলাপুর স্থানের নাম হয়েছে।

নাকসি : আরবি 'নকশি' শব্দের অর্থ হলো নকসিকারী।[৫১] সুলতানি আমলের প্রশাসনিক নগরী লস্করপুরের নিকট নাকসি এলাকা গড়ে ওঠে। প্রশাসনের লোকদের নকসিদার ও জরির বস্ত্র তৈরির জন্য এখানে কারিগরপল্লী গড়ে ওঠে। সম্ভবত নাকসি থেকে মূল্যবান বস্ত্রাদি চিত্রানদীর যোগাযোগ মাধ্যমে রপ্তানী হতো। আরবি 'নকাশি' উচ্চারণে বিকৃত হতে হতে নাকসি স্থাননাম লাভ করেছে।[৫২] এখানে এক সময় এবি এস জুনিয়ার মাদ্রাসা ছিল। মাদ্রাসাটি এখন বিলুপ্ত। এই মাদ্রাসায় বিশ্বনন্দিত শিল্পী এস এম সুলতান কয়েক বছর অধ্যয়ন করেছিলেন।

চিলগাছাঘুনাথপুর : দেবতা রামচন্দ্র বা রঘুনাথের স্মরণে স্থানের নাম রাখা হয়েছিল রঘুনাথপুর। কিন্তু এলাকায় রঘুনাথপুর নামে একাধিক স্থানের নাম থাকায় স্থানের বৈশিষ্ট জুড়ে দেওয়া হয় ঐ নামের সঙ্গে। এইস্থানে তিল গাছ ভালো উৎপাদিত হওয়ায় স্থানের নাম রাখা হয় 'তিলগাছাঘুনাথপুর'। ক্রমে তা বিকৃত হয়ে স্থাননাম হয়েছে চিলগাছাঘুনাথপুর।

ঘোষপুর : ঘোষ বংশীয় কোনো গাঁতিদারের মহালভুক্ত এলাকা ঘোষপুরি নামে পরিচিতি পায়। ঘোষপুরি থেকে স্থাননাম হয়েছে ঘোষপুর।

খলিসাখালি : খলিসা মাছের জন্য বিখ্যাত হলে একটি খালের নাম হয় খলিসা মাছের খাল। ক্রমে এখানে বসতি গড়ে ওঠে আর খলিসা মাছের খাল রূপায়িত হয় খলিসাখালি স্থাননামে।

তালতলা : তালতলা গ্রামটি নড়াইল থেকে কালিয়া সড়ক পথে যাওয়ার সময় দেখতে পাওয়া যায়। স্থানের নাম যে তালগাছকে কেন্দ্র করে হয়েছে তা গ্রামের দিকে তাকালে বুঝতে পারা যায়। আজো তালতলা গ্রামে প্রচুর তালগাছ আছে।

মূলদাঁইড়, কুহডাঙ্গা : প্রাচীনকালে চিত্রানদী থেকে উৎপত্তি লাভ করে একটি খাল জনপদের মধ্য দিয়ে পূর্ব দিকে যায়। সেটা নৌকা চলাচলের দাঁইড় কিংবা দাঁড়ি হিসেবে পরিচিতি পায়। এক সময় ঐ এলাকায় বসতি স্থাপন হলে খালটি নৌকা চলাচলের মূল দাঁইড় বা দাঁড়ি হিসেবে স্থাননাম লাভ করে। পার্শ্বেই কুহডাঙ্গা। ওখানে যখন বসতি ছিল দূরের এলাকার লোকেরা মনে করতো ঐ ফাঁকা ডাঙ্গার স্থান দিয়ে গেলে ভূত বা প্রেতের কুহুকে পড়তে হয়। এরপর বসতি স্থাপন হলে ঐ কুহকের ডাঙ্গা থেকে স্থাননাম হয় কুহডাঙ্গা।

শড়াতলা : পুরানো একটি শড়াগাছ প্রথম বসতি স্থাপনের সময় অবস্থান করায় স্থানের নাম হয়েছে শড়াতলা।

ডওয়াতলা : যে প্রাচীন ডওয়াগাছকে কেন্দ্র করে এখানে বসতি গড়ে ওঠে সেই গাছের নামে নাম হয়েছে স্থানের।

রামচন্দ্রপুর : হিন্দুদের দেবতা রামচন্দ্রের নাম অনুসারে স্থানের নাম হয়েছিল রামচন্দ্রপুরি। রামচন্দ্রপুরি ক্রমে রামচন্দ্রপুর স্থাননামে পরিচিতি পায়।

পশ্চিম বালিয়াডাঙ্গা : বালিসমৃদ্ধ এলাকায় বসতি স্থাপনের জন্য স্থাননাম হয় বালিয়াডাঙ্গা। বালিয়াডাঙ্গার পশ্চিমাংশ একটি পৃথক গ্রাম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ায় পশ্চিমবালিয়াডাঙ্গাও একটি স্থানের নাম। বালিয়াডাঙ্গার উত্তরাংশ আরেকটি গ্রামের মর্যাদা পাওয়ায় সে স্থানের নাম হয়েছে উত্তর বালিয়াডাঙ্গা।

দত্তপাড়াবিল : কায়স্থ দত্ত বংশীয়দের অধিকার ভুক্ত বিলের নাম ছিল দত্ত বিল। ঐ স্থানে বসতি স্থাপনের পর ঐ স্থানের নাম হয়েছে দত্তপাড়াবিল।

উত্তরবুড়িখালি : বড়ো একটি খালের ভরাট তীরে বসতি স্থাপনকারীরা স্থানের নাম দেয় বড়োখাল। সেই বড়োখাল পরিবর্তিত হতে হতে রূপ নেয় বুড়িখালিতে। বুড়িখালি গ্রামের একটি অংশ উত্তরবুড়িখালি স্থাননাম পেয়েছে।

চৌগাছা : চারটি বড়ো গাছ কেন্দ্রীক স্থানকে কেন্দ্র করে যে বসতি গড়ে ওঠে তার স্থান নাম হয়েছে 'আ' প্রত্যয় যোগে চৌগাছা।

তুলারামপুর

বামনহাট : ব্রাহ্মণ বা বামুনদের বসতিস্থলকে বামুনের হট্ট কল্পনা করায় স্থাননাম হয়েছে বামুনের হাট। বামুনের হাট আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে বামনহাট স্থাননামে রূপ নিয়েছে। কালে কালে গ্রামটি বিস্তৃতি লাভ করায় তার একটি অংশ ছোটোবামনহাট স্থাননামেও রূপায়িত হয়েছে।[৫৩]

পেড়লি : পাড়োই বা মাঝিদের বসতি গড়ে ওঠে এই স্থানে অনেক আগে। তখন এই স্থানে অন্য কোনো সম্প্রদায়ের লোক বসত করতো না। পাড়োইদের অবস্থানস্থল বুঝাতে স্থানের নাম হয়েছে পেড়লি।[৫৪]

বাকশাডাঙ্গা : জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, জনৈক বাকের শাহ্ এখানে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। প্রথমে স্থানের নাম ছিল বাকের শাহের ডাঙ্গা। বাকের শাহের ডাঙ্গা লোকমুখে সংক্ষিপ্ত হতে হতে স্থাননাম হয়েছে বাকশাডাঙ্গা।[৫৫]

দেবীপুর : দুর্গাদেবীর পুরি কল্পনা করে এখানকার দেবীর ভক্তরা স্থানের নাম রেখেছিল দেবীপুরি। দেবীপুরি সংক্ষিপ্ত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে দেবীপুর।[৫৬]

বোড়ামারা : বোড়া বা ধোড়াসাপের আড্ডা ছিল এখানকার নিম্ন অঞ্চলে। প্রথম বসতি স্থাপনকারীরা ঐস্থানের বোড়া সাপ মেরে বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে স্থানের নাম হয়েছিল বোড়ামারি। বোড়ামারি শব্দটি আরো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে বুড়ামারা।[৫৭]

কোদলা : কোদলার প্রাথমিক নাম ছিল কোদালদিয়া। বসতি স্থাপন কালে কোদালের সাহায্যে দ্বীপেভূমি কর্ষণের জন্য এই নাম সৃষ্ট হয়। এইভাবে কোদালদ্বীপ থেকে কোদালদিয়া এবং কোদালদিয়া থেকে স্থানের নাম হয়েছে কোদলা।

মালিডাঙ্গা : স্থানের মূল নাম ছিল মাওলিডাঙ্গা। মাওলি ফার্সি শব্দ। অর্থ হলো, সুলতানি শাসনামলে ইজারাপ্রাপ্ত কিংবা অনুদানপ্রাপ্ত ভূমি। সুলতানি শাসনামলে মাওলি পাওয়া ডাঙ্গা বা উঁচু ভূমি হলো মাওলিডাঙ্গা। লোকমুখে মাওলিডাঙ্গা সংক্ষিপ্ত হতে হতে মালিডাঙ্গা স্থানেনামে পরিণত হয়েছে।[৫৮]

বেতেঙ্গা : প্রথম বসতিস্থাপনকারী ব্যক্তি বেতের বাঁধন দিয়ে ঘর নির্মাণ করেছিলেন। সেই বেতেবাঁধা ঘর এলাকার সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্রমে বেতে বান্ধা ঘর থেকে স্থানের নাম সংক্ষিপ্ত হয়েছে বেতেঙ্গা।[৫৯]

চামরুল : প্রাচীন জামরুল গাছ থেকে এলাকার নাম হয়েছিল চামরুল। এই চামরুল খেয়াঘাট থেকে ইংরেজ শাসনামলে যশোরের এসপি এলিসন সাহেবের কান কেটে নিয়েছিল বিপ্লবীরা।[৬০]

চাঁচড়া : হিন্দু সম্প্রদায়ের চর্চরি অগ্নিউৎসব থেকে চাঁচড়া নামটির উদ্ভব। যে স্থানে চর্চরিউৎসব পালন করা হতো সেই স্থানই চাঁচড়া স্থাননামে রূপায়িত হয়েছে।[৬১]

তুলারামপুর : তালারাম নামক এক রাজস্থানী ব্যবসায়ী চামরুলে পাটের ব্যবসায় শুরু করলে এখানে বড়ো আকারের পাটগুদাম স্থাপিত হয়। এইভাবে তুলারামের পুরি বা অবস্থানস্থলই তুলারামপুর স্থাননাম হয়েছে।[৬২]

শেখহাটি ইউনিয়ন

আফরা : আফরা একটি প্রাচীন স্থান। সুলতানি শাসনামলে এই স্থানে লোকবসতি গড়ে ওঠে। আফরা ফার্সি শব্দ। অর্থ হলো, ধানের পোকা। যে পোকা জমির কাঁচা ধান খেয়ে নিঃশেষ করে। ধান গাছকে মনে হয় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আফরা লাগা ডাঙ্গা থেকে স্থানের নাম হয়েছিল আফরার ডাঙ্গা। পরবর্তীকালে ডাঙ্গা শব্দটি বাদ দিয়ে স্থানের নাম হয়েছে শুধু আফরা।

বাসিয়াডাঙ্গা : যে ডাঙ্গা ভৈরব-চিত্রা নদীর জোয়ারের পানিতে ভেসে যেতো সেই ডাঙ্গার নাম হয়েছিল 'ভাসাডাঙ্গা' বা 'বাসিয়াডাঙ্গা'।

গুয়াখোলা : ধানরোপণ করার আগে ধানের যে বীজতলা দেওয়া হয় তাকে স্থানীয়ভাবে বলা হয় 'রোয়াখোলা'। রুয়াখোলা রূপান্তরিত হয়ে স্থাননাম হয়েছে গুয়াখোলা।

শেখহাটি : শেখহাটি পাল ও সেন শাসনামলের বাগদি বা বাকড়ি ভুক্তি বা প্রদেশের রাজধানী। রাজা লক্ষণ সেনের অবস্থিতি এখানে ধারণা করা হয়। আজো রাজা লক্ষণ সেনের প্রতিষ্ঠিত কষ্টি পাথরের কালী মূর্তি ঐ স্থানে আছে। এই স্থানের প্রাচীন নাম ছিল শাঁখহাটি। সুলতানি শাসনামলে পাঠান শেখ বংশীয় মুসলমানদের দ্বারা নাম পরিবর্তিত হয়ে স্থাননাম হয়েছে শেখহাটি। শেখহাটি গ্রামের ডহর বা ডর এলাকা পরবর্তীকালে ডহরশেখহাটি নামে একটি সার্বভৌম গ্রামের মর্যাদা পেয়েছে।[৬৩]

শেখপাড়া : সুলতানি শাসনামলে শেখহাটি গ্রামের কাছে শেখ বংশীয় পাঠানেরা যে পাড়ায় বসতি স্থাপন করেন তা শেখপাড়া নামে পরিচিতি পায়। এই শেখপাড়ায় আজো অভিজাত পাঠান বংশের লোকেরা বসবাস করছেন।

মহিষখোলা : গ্রামের যে অংশে মহিষপোষার খোলা নির্মাণ করা হয়েছিল সেই স্থান পরবর্তীকালে মহিষখোলা নামে পরিচিতি পেয়ে আসছে।

তপনবাগ : পাল শাসকদের কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক ইউনিট ছিল যথাক্রমে ভাগ, মণ্ডল, বীথি ইত্যাদি।[৬৪] স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের দুজন বিখ্যাত কর্মচারি বসবাস করতেন প্রেমভাগ গ্রামে। এই কর্মচারীরা ছিলেন রূপ ও সনাতন। বৈষ্ণব রূপ ও সনাতনের তপস্যার ভাগই তপবনভাগ। পরবর্তীকালে তপনভাগ এবং শেষে তপনবাগ স্থাননামে রূপান্তর হয়েছে।

দে-ভোগ : দেবতা পূজার স্থান থেকে স্থানের নাম হয়েছে দেবভাগ। দেবভাগ আরো পরিবর্তিত হয়ে স্থাননাম হয়েছে দে-ভোগ।

মালিয়াট : সুলতানি শাসনামলের শাসকের কাছ থেকে নিষ্কর প্রাপ্ত জমিকে বলা হতো মাওলি। সেই মাওলির জায়গায় নির্দিষ্ট ঘাট থেকে স্থানের নাম হয়েছিল মাওলিঘাট। মাওলিঘাট শব্দটি দীর্ঘদিনের পরিবর্তনের ফলে স্থাননাম হয়েছে মালিয়াট।

বাকলি : বাকলিগ্রামটি সুপ্রাচীন। সেন শাসনামলে বঙ্গ ৫টি প্রদেশ বা ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। এই ৫টি ভুক্তির মধ্যে বাগদি বা বাকড়ি ছিল অন্যতম। আর এই ভুক্তির রাজধানী ছিল শংখনাট বা শেখহাটি। বাকড়ি প্রদেশটি বিলুপ্ত হয়েছে প্রায় হাজার বছর আগে তবে তার নামটি বাকলি স্থাননামের মধ্যে আজো বিদ্যমান। বাকলি স্থাননামের বিকাশ সাধন হয়েছে এইভাবে, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ > বকদ্বীপ > বাগদি > বাকলি।[৬৫]

হাতিয়াড়া : স্থানীয় লোকদের ধারণা এই এলাকায় হাতি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই হাতিছাড়া ছিল স্থাননাম। হাতিছাড়া থেকে স্থানের নাম হয় হাতিয়াড়া। আইন-ই-আকবরি পাঠে জানা যায়, উত্তর যশোর বা মহম্মদবাদ সরকারে শের শাহের সঙ্গে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের কোনো উত্তরাধিকারীর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হোসেনশাহের অনুগত শাসক তার যুদ্ধরত হস্তিবাহিনী ছেড়ে আত্মগোপন করেছিলেন। হয়তো সেই হস্তিছাড়া বা হাতি ছাড়া থেকে স্থানের নাম হয়েছে হাতিয়াড়া।[৬৬] কারণ হাতিয়াড়া এলাকা যেমন প্রাচীন তেমনি যুদ্ধের বিস্মৃতি এখানে ছড়িয়ে পড়া অসম্ভব নয়।

কলোড়া ইউনিয়ন

নিরালি : প্রাচীনকালে কোথাও বসতি স্থাপন করার আগে আল বা আইল বাঁধার নিয়ম ছিল। যেখানে আইল বা আলি বাঁধা ছাড়াই বসতি স্থাপিত হয় সেই স্থানের নাম হয় নিরালি।

বাহিরগ্রাম : বিস্তৃত লোক বসতির বাইরে যে স্থানে গ্রাম বা বসতি গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় বাইরের গ্রাম। বাইরের গ্রাম থেকে স্থানের নাম হয়েছে বাহিরগ্রাম।[৬৭]

শিমুলিয়া : দ্বীপচরে প্রথম একটি শিমুল বা মান্দার গাছ জন্মায়। শিমুল ফুলের লাল রঙ লোকদের আকর্ষণ করতো। এইভাবে প্রাচীনকালে স্থানটির নাম হয় শিমুলদ্বীপ। শিমুলদ্বীপ থেকে স্থাননাম হয়েছে শিমুলিয়া।

আগদিয়া : অগ্রে পানি থেকে জেগে ওঠা দ্বীপ থেকে ঐ দ্বীপচরের নাম হয়েছিল অগ্রদ্বীপ। অগ্রদ্বীপ শব্দ থেকে স্থাননাম হয়েছে আগদিয়া। আগদিয়ায় নবতর অংশ পৃথক একটি স্থানের মর্যাদা পাওয়ায় সে স্থানের নাম হয়েছে আগদিয়ারচর।

রামনগরচর : দেবতা রামের স্মরণে স্থানের নাম হয় রামনগর। রামনগর গ্রামের বর্ধিত চরাংশে লোকবসতি গড়ে উঠলে স্থানের নাম হয় রামনগরচর।

বীরগ্রাম : তে-ভাগা আন্দোলনের সময় এই এলাকার কৃষকেরা বিশেষ বীরত্ব দেখানোর জন্য স্থানের নাম হয়েছে বীরগ্রাম।[৬৮]

গোয়াইলবাড়ি : গোয়ালারবাড়ি থেকে স্থানের নাম হয় গোয়ালবাড়ি। গোয়ালা সম্প্রদায়ের লোকেরা এই স্থানে প্রথম বসতি স্থাপন করে। গোয়ালবাড়ি থেকে স্থাননাম হয়েছে গোয়াইলবাড়ি।[৬৯]

কলোড়া : কালাইগর বা ঝালাইয়ের কারিগরদের কিছু লোক এই স্থানে বসতি স্থাপন করে। প্রাচীন কলাইগর শব্দ থেকে নানা পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে স্থানের নাম হয়েছে কলোড়া।

বিছালি ইউনিয়ন

কালীনগর : দেবী কালীর মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে-বসতি গড়ে ওঠে দেবীর ভক্তরা সেই স্থানের নাম করেছে কালীনগর।

বিছালি : এখানকার ফসলি জমিতে প্রচুর ধান হতো। ধান পৃথক করে রাখার পরে বড়ো বড়ো সোনালি রঙের বিছালির গাদা দূর থেকে দেখে দূরের গ্রামের লোকেরা স্থানটির নাম দেয় বিছালিগাদা। এক সময় লোকমুখে উচ্চারিত হতে হতে স্থানের নাম দাঁড়ায় শুধু বিছালি।

আটঘরা : প্রথম এই স্থানে মাত্র ৮ ঘর লোক বা ৮টি পরিবার এসে বসতি স্থাপন করে সেই থেকে স্থানের নাম হয় আটঘর। আটঘর-এর সাথে 'আ' প্রত্যয় যোগে স্থানের নাম হয়েছে আটঘরা।

আকবরপুর : জনৈক আকবর মিয়া এখানে বসতি স্থাপন করায় স্থানের নাম হয় আকবরপুরি। আকবরপুরি মুখে মুখে সংক্ষিপ্ত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে আকবরপুর।

মাদুরগাঁতি : জমিদারির মাঝখানের অংশকে বলা হতো মধের গাঁতি। মধ্যের

গাঁতিতে লোকবসতি শুরু হলে লোকমুখে মধ্যের গাঁতি মাধুরগাঁতিতে পরিণত হয়েছে।

মির্জাপুর : মুঘল শাসনামলে একজন মুসলিম সেনানায়ক মির্জাপুর গ্রামটি প্রতিষ্ঠা করেন। মির্জাপুর শব্দের অর্থ হলো ভদ্রাসন–অর্থাৎ ভদ্রলোকের বসবাসের স্থান।

আড়পাড়া : বিশাল গ্রামের আড়াআড়ি বিস্তৃত পাড়াকে আড়পাড়া স্থাননামে অভিহিত করা হয়েছে।

শিঙ্গাশোলপুর ইউনিয়ন

নলদিরচর : নলগাছ বেষ্টিত স্থানের নাম হয় নলদ্বীপ। নলদ্বীপ থেকে নলদি শব্দটি এসেছে। নলদির চরের বর্ধিত অংশের স্থাননাম হয়েছে নলদিরচর।[৭০]

খলিসাখালি : যে খালে খলিসা মাছেরই প্রাধান্য ছিল সেই খাল খলিসামাছের খাল বলে পরিচিতি পায়। খাল ভরাট হলে এবং তার দুই তীরে বসতি স্থাপিত হলে স্থানের নাম হয় খলিসাখালি।

শুয়ারঘোপ : যে গোগে শম্বুক বা শামুকের প্রাধান্য ছিল সেই গোগ শম্বুকের গোগ নামে পরিচিতি পায়। শম্বুকের গোগ লোকমুখে উচ্চারিত হতে হতে শুয়ারঘোপ স্থাননামে পরিণত হয়েছে।[৭১]

গোবরা : ১৬০৯ সালে সুবাদার ইসলাম খান চিশতির আদেশে মুঘলবাহিনী বারো ভূঁইয়ারাজা শক্রাজিত রায়কে গোবরার সন্নিকটে চিত্রানদীর পশ্চিম তীরে উজিরপুরে আক্রমণ করলে শক্রজিত পরাজিত ও বন্দি হন।[৭২] তখন মুঘলের নওয়ারা বহর বা নৌবাহিনী যে এলাকায় টহল দিতো সেই স্থানটি গেওরা নামে পরিচিতি পায়। 'গেওরা' ফার্সি শব্দ। এর অর্থ হলো, নাওয়ারার বাইচ বা নৌকা বাইচ। গেওরা শব্দটি লোক মুখে উচ্চারিত হতে হতে গোবরা স্থাননামে পরিণত হয়েছে।

বড়োকুলো : স্থানীয় লোকদের ধারণা, এখানে একটা বড়োকেলা বা কেল্লা ছিল। বড়োকেলা পরবর্তীকালে উচ্চারিত হতে হতে বড়োকুলো স্থাননামে পরিণত হয়েছে।

বড়গাঁতি : কোনো জমিদারির বিশেষ অংশকে বলে গাঁতি। স্থানীয় জমিদারের বড়ো গাঁতিদারির অংশ বড়গাঁতি স্থান নামে পরিণত হয়েছে।

শোলপুর : আতাখাল বা কালুমালু খালের সাথে প্রাচীন চিত্রার মিলনস্থানের পশ্চিমপারে সুলতানি শাসনামলে পাঠানদের এক সিলা বা অস্ত্রাগার ছিল। এই সিলা থেকে বারোভূইয়াদের বিদ্রোহের সময় মুঘলসেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানও হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই সিলা বা অস্ত্রাগার ভূষণার রাজা শক্রজিত রায়ের পরাজয়ের পরে বিলুপ্ত হয়। তবে স্থাননাম হয়ে রইলো সিলাপুর। এই সিলাপুর পরবর্তীকালে শোল-পুর স্থাননামে পরিণত হয়েছে।

চুনখোলা : যে কৌল-এ বা স্থানে চুন তৈরি করা হতো তার নাম হয় চুনের কৌল বা চুনকোল। চুনকোল শব্দটি পরিবর্তিত হয়েছে চুনখোল এ। শব্দের অন্তে আ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে চুনখোলা হয়েছে।

তারাপুর : নড়াইলের জমিদারদের জনৈক শরিক গাঁতিদার তারানাথ রায়ের গাঁতিমহলের এক অংশের নাম তারাপুরি নামে পরিচিতি পায়। তারাপুরি পরবর্তীকালে তারাপুর স্থাননাম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।[৭৩]

ভদ্রবিলা ইউনিয়ন

ফুলশর : এখানে প্রথম ভদ্রাসন স্থাপনকারী ব্যক্তি তার বাড়ি ঘিরে লাগিয়ে দিয়েছিলেন ফুলগাছের অসংখ্য গাছ। সেই ফুলের গাছগুলোতে ফুল ফুটে অপূর্ব মেলা সৃষ্টি করেছিল। সেই ফুলের মেলা লোকমুখে ছড়াতে ছড়াতে স্থানের নাম হলো ফুলশহর। ফুলশহর আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে এখনরূপ নিয়েছে 'ফুলশর'-এ।

ভদ্রবিলা : নড়াইলের জমিদারদের থেকে নিষ্কর জমি পেয়েছিলেন ভদ্র বংশীয় লোকেরা এই এলাকায়। তখন এলাকাটি ছিল বিল বা জলাশয়। জমি উঠতি হলে স্থানের নাম সাধারণ লোক বলতে থাকে ভদ্রদের বিল। এই ভদ্রদের বিল থেকে হয়েছে স্থাননাম ভদ্রবিলা।[৭৪]

পলইডাঙ্গা : ধারণা করা যায়, ১৬০৯ সালে মুঘল সেনাবাহিনী উজিরপুর রাজস্ব আদায়ের কাচারিও দুর্গ আক্রমণ করলে বিদ্রোহী বাহিনী নদী পার হয়ে পূর্বদিকে পালিয়ে যায় তখন ঐ ডাঙ্গা বা স্থানের নাম হয় পলাইডাঙ্গা। অর্থাৎ পালিয়ে যাওয়ার ডাঙ্গা। পালিয়ে যাওয়া ডাঙ্গা থেকে স্থাননাম হয়েছে পলইডাঙ্গা।

ভবানীপুর : ভবানী বা মা দুর্গার পূজারী ভক্তরা এই স্থানে বসতি স্থাপনকালে স্থানের নাম রেখেছিলেন ভবানীরপুরি। ভবানীরপুরি সংক্ষিপ্ত হয়ে বর্তমান স্থাননাম হয়েছে ভবানীপুর।

রায়খালি : রায় বংশীয় হিন্দুদের মালিকানায় যে খাল ছিল সেখানে গড়ে ওঠা বসতি স্থানের নাম হয়েছে রায়খালি।

মিরেপাড়া : মুঘল বাহিনীর দুই সামরিক কর্মচারী চাঁদ আলি মির ও তারা আলি মিরের সামরিক চৌকি ও কেলাবাড়ি ছিল এই স্থানে। মির্জা নাথানের 'বাহারীস্তান-ই-গায়বি'-এর বর্ণনা মতে মির খেতাবি দুই সহোদর উজিরপুরে বিদ্রোহী রাজা শত্রুজিত রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধে শত্রুজিত পরাজিত ও বন্দি হন। মির ভ্রাতৃদ্বয়ের নামানুসারে স্থানটি পরিচিতি পায় মিরের পাড়ায়। একটু খানি পরিবর্তিত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে মিরেপাড়া। মিরেপাড়ার বিস্তৃত এলাকায় মুঘল সরকারের কেলাবাড়ির ধ্বংসাবশেষ আজো দেখতে পাওয়া যায়। ইংরেজ শাসনামলে তারা আলি মিরের পাকা কবরটি স্থানীয় দখলদার বিনষ্ট করে দেয়। তারা ইতিহাসকে বিকৃত করে প্রচার করে, মির ভ্রাতৃদ্বয় ছিল এই এলাকার শক্তিশালী ডাকাত।[৭৫]

আটেরহাট : আটজন ব্যক্তির মিলিত হট্ট বা 'অষ্টহট্ট' থেকে আটেরহাট স্থাননামটি রূপায়িত হয়েছে। হাট শব্দে এখানে লোকালয় বুঝানো হয়েছে।

সার্কেলডাঙ্গা : সরখৎকৌলডাঙ্গা থেকে সার্কেলডাঙ্গা শব্দটি এসেছে। 'সরখৎ' ফার্সি শব্দদ্বারা বোঝায় পুরুষাণুক্রমে ভূমিপ্রাপ্তির সন্ধিপত্র। আর কৌল শব্দ দ্বারা বুঝায় নির্দিষ্ট স্থান বা খোলা। স্বাধীন সুলতানি শাসনামলে ১০ জন সামরিক সেপাইয়ের অধিনায়ককে 'সরখৎকৌল' বা সরখৎ জমি দেওয়া হতো। এখানে মির জয়েনউদ্দিন নামে এক ব্যক্তির নাম জানা যায় তিনি বা তার পূর্বপুরুষ 'সরখত' পেয়ে এখানে অবস্থান করেছিলেন। সেই থেকে সরখৎকৌল-এর সাথে ডাঙ্গা যুক্ত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে সার্কেলডাঙ্গা।[৭৬]

দিঘলিয়া : নড়াইল থেকে কালিয়া যাওয়ার পথে সুলতানি শাসনামলের দুটো প্রাচীন

ও বিস্তৃত দিঘি দেখতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো লোক এই দিঘিকে খানজালি দিঘিও বলতে চান। অর্থাৎ খানজাহান আলির খনিত দিঘি। খলিফাতাবাদ বা বাগেরহাট সরকারের এলাকাধীন বলে এই দিঘি সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রচলিত হয়েছে। যা হোক, ঐ বিশাল দির্ঘিকা বা দিঘি থেকে স্থানের নাম হয়েছে দিঘলিয়া।[৭৭]

রামসিদ্ধি : রাম নামক এক ব্যক্তি নির্জন বনে দীর্ঘ সাধনার পরে যে স্থানে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন সেই স্থান এখন রামসিদ্ধি নামে পরিচিত। রামসিদ্ধির বর্ধিত অংশ ডহররামসিদ্ধি নামে পরিচিত।

বাঁশগ্রাম ইউনিয়ন

বেতভিটা : বেতগাছের ঝোঁপ-ঝাড় সমন্বিত এলাকা বিধায় স্থানের নাম হয়েছিল বেতেরভিটা। বেতের ভিটায় লোকবসতি গড়ে ওঠায় পরবর্তীকালে তা বেতভিটায় পরিণত হয়েছে।

বল্লারটোপ : নড়াইলের আঞ্চলিক ভাষায় বোলতাকে বলা হয় বল্লা। আর 'টোপ' হলো চাক শব্দজাত। যেখানে প্রথম বসতি স্থাপনকারীরা বল্লারটোপ বা বোলতার চাক দেখে সেই স্থানের নাম হয় বল্লারটোপ। এখানকার এক ব্যক্তি মুঘল শাসনামলে দিল্লিতে বড়ো কোনো প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করতেন। তিনি ফারসিতে একখানি 'মসনবি' রচনা করেছিলেন।

শম্বুডাঙ্গা : শম্বুক বা শামুকের প্রাধান্য ছিল যে বিলের পানিতে সেই বিল ভরাট হলে লোক বসতি গড়ে উঠে তার নাম হয় শম্বুকের ডাঙ্গা। পরবর্তীকালে শম্বুকের ডাঙ্গা হয়েছে শম্বুকডাঙ্গা।

দৌলতপুর : ধনী ব্যবসায়ীদের বসবাস স্থান ছিল এখানে এ জন্য স্থানের নাম হয়েছে দৌলতপুর। ফারসি দৌলত শব্দের অর্থ হলো ধনসম্পদ।[৭৮]

দরিয়ারপুর : প্রাচীনকালে এখানে ছিল বিশাল জলাশয়। কারো কারো মতে সাগর। সাগরকে ফারসিতে বলা হয় দরিয়া। দরিয়া কালের নিয়মে ভরাট হলো নিঃশেষ হলো না তার নাম। স্থানের প্রাথমিক নাম ছিল দরিয়াপুর। দরিয়াপুর থেকে শব্দটি পরিবর্তন হলো দারিয়াপুরে। দারিয়াপুরের প্রাচীন নদীর চিহ্নিত স্থানে নদী বন্দরের অবস্থানকে লক্ষ্য করা যায়। এখানে বিখ্যাত সাধক ওসমান ফকিরের মাজার বিদ্যমান।[৭৯]

হোগলাডাঙ্গা : জলজউদ্ভিদ হোগলা চাষের ডাঙ্গাকে বলে হোগলাডাঙ্গা। এই স্থানে আজো হোগলা জন্মে থাকে।

আগরাহাটি : অগ্রে বা আগে সৃষ্ট হাট থেকে স্থানের নাম হয় অগ্রহাট। হাট অর্থে এখানে লোকালয়। নড়াইল এলাকায় কখনো কখনো হাট ও বাজার অর্থে লোকালয় বুঝায়। বিস্তৃত বিলের মধ্যে অগ্রে বসতি স্থাপিত হওয়ায় স্থানের নাম হয় অগ্রহাট। সেই অগ্রহাট থেকে শব্দটি হয়েছে আগরাহটি।

বাঁশগ্রাম : এই এলাকায় প্রাচীনকাল থেকে বাঁশ উৎপাদিত হয়। আজো আছে অসংখ্য বাঁশ। এই ভাবে স্থানের নাম হয়েছে বাঁশগ্রাম।

কোমাডাঙ্গা : ফারসি কামার শব্দ দ্বারা বুঝায় চাঁদকে। প্রাচীনকালে চন্দ্রাকৃতির ডাঙ্গা

থেকে স্থানের নাম হয় কামারডাঙ্গা। কামারডাঙ্গা নামটি পরিবর্তিত হয়ে স্থাননাম হয়েছে কোমাডাঙ্গা।

ডুমদি : দিয়াড়া শব্দ দ্বারা বোঝায় প্রাচীন নদীর ফেলে যাওয়া গোবকে। এককালে এই অঞ্চলে কালিগঙ্গা প্রবাহিত ছিল। কালিগঙ্গার ফেলে যাওয়া দিয়াড়া বা গোব বা জলাশয়ে নতুন বসতি স্থাপনকারী লোকেরা ডুবিয়ে গোসল করতো। এইভাবে স্থানের নাম হয়েছিল ডুবদিয়াড়া। ডুবদিয়াড়া থেকে ডুবদিয়া এবং আরো পরবর্তীকালে স্থানের নাম হয়েছে ডুমদি। ডুমদি বিখ্যাত করিয়াল বিজয় সরকারের জন্মভূমি।

নন্দকোল : নন্দের কৌল অর্থাৎ জনৈক নন্দ কর্তৃক অধিগৃহিত কৌল বা স্থান। কৌল হলো শর্তসাপেক্ষ জমির চাষাবাদের জন্য ইজারা গ্রহণ। নন্দের কোল থেকে স্থানের নাম হয়েছে নন্দকোল।

কামালপ্রতাপ : স্থানীয় শাসক কামাল ও প্রতাপের নামানুসারে স্থানের নাম হয়েছে কামালপ্রতাপ। কামালপ্রতাপ গ্রামে জমিদার মুন্সি ইরফানউদ্দিন, রংপুরের সদরে আলা মুন্সি তমিজউদ্দিন, সাবজজ মুন্সি মফিজউদ্দিন প্রমুখের জন্মভূমি। এখানে সাধক লেংটা শাহ্ ফকিরের মাজার বিদ্যমান।[৮০]

লোহাগড়া থানা
নলদি ইউনিয়ন

ভাটুদহ : কালিগঙ্গা নদীর ফেলে যাওয়া দহের তীরে প্রথম ভাট বা ঘটক সম্প্রদায়ের লোকেরা বসতি স্থাপন করে বলে স্থানের নাম হয় ভাটুদহ।

নালিয়া : গ্রামের মধ্যে বিস্তৃত ছিল প্রাচীন নাল বা খাল। এই নালের দুপাশে বসতি স্থাপনের জন্য স্থানের নাম হয় নালিয়া।

শুজাপুর : কারো কারো মতে শুজা নামক কোনো ব্যক্তির নামে গ্রামটির নাম হয়েছিল শুজাপুরি। অন্যমতে, গ্রামের প্রাথমিক অবস্থান ছিল সোজা। এইভাবে সোজাপুর থেকে শুজাপুর স্থানের নাম হয়েছে।

মিঠাপুর : গ্রামের প্রতিষ্ঠা লগ্নে এখানকার খনিত একটি দিঘির পানি সুমিষ্ট ছিল বলে স্থানের নাম হয়েছিল মিঠাপুকুর। মিঠাপুকুর শব্দটি পরিবর্তিত ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে স্থাননাম হয়েছে মিঠাপুর। অন্য মতে, প্রাচীনকালে এখানে মিষ্টি বা মিঠাইয়ের বাজার ছিল। মিঠাই ও এখানে উৎপাদিত হতো। তাই এখানের নাম হয়েছিল মিঠাইপুরি। মিঠাইপুরি নাম পরিবর্তিত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে মিঠাপুর। গ্রামের যে অংশে এক সময় দরিয়া বা জলাশয় ছিল সেই স্থানের নাম হয়েছিল দরিয়ামিঠাপুর। দরিয়ামিঠাপুর থেকে আরেকটি স্থানের নাম হয়েছে দরিমিঠাপুর।

বলাডাঙ্গা : এখানে বসতি স্থাপনকালে একটি বলা গাছের অবস্থিতিকে কেন্দ্র করে স্থানের নাম হয়েছে বলাডাঙ্গা।

মতিনগর : এই অঞ্চলের নিম্নাঞ্চলে স্থানীয় ভাষায় সাগরে, এক সময় ঝিনুকের মধ্যে মতি বা মুক্তো পাওয়া যেতো। এইভাবে মতির সাগর থেকে স্থাননাম হয়েছে

মতিনগর। অন্যমতে, মতি নামের কোনো ব্যক্তির নামানুসসারে স্থানের নাম হয়েছে মতিনগর।

বারোইপাড়া : ১২টি পাড়ার সমন্বয়ে একটি বিস্তৃত গ্রামের স্থাননাম হয়েছে বারোইপাড়া। জনশ্রুতি আছে, বারোইপাড়া এক সময়ে কয়েক শত লুটেরা বসবাস করতো। তারা জনপদে লুটপাট করে জীবিকা নির্বাহ করতো।

জালালশি : হযরত জালাল শাহ-এর মাজার ও মসজিদকে কেন্দ্র করে স্থানের নাম হয় জালালশি। জালালশি আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে স্থানের নাম দাঁড়িয়েছে জালালশি। জালালশিতে মুঘল আমলের একটি প্রাচীন মসজিদ আছে।

নলদি : প্রাচীন উপবঙ্গে জয়দ্বীপ নামীয় নলখাগড়া বেষ্টিত দ্বীপ নলদ্বীপ নামে পরিচিতি পায়। নলদ্বীপ পরবর্তীকালে নলদিয়া নামে পরিচিতি পেয়েছে।[৮১] নলদি একটি বিখ্যাত পরগনা। সুবাদার শায়েস্তা খান বিশ্বস্ততার জন্য তার সেনাবাহিনী এক কর্মচারী সীতারাম রায়কে নলদি পরগণার ইজারাদারি দিয়েছিলেন। নলদিতে একটি অতি প্রাচীন নগরী ছিল। ১৬৫২ সালে এন. সসন (N. Sauson) অংকিত মানচিত্রে নলদির অবস্থান লক্ষণীয়। অনেকে ২৪ পরগণার দক্ষিণে নলুয়া নামক স্থানকে প্রাচীন নলদি বলতে চান। সতীশ মিত্র এই মত খণ্ডন করে বলেন, 'ঠিক সেই স্থানটিই নলদি না হইতে পারে। কিন্তু উহার সন্নিকটে সুন্দরবনের সেই অংশে যে প্রাচীন শহর নলদি ছিল, তাহার সম্বন্ধে কিছু প্রমাণ আছে।[৮২] সুন্দরবনের (প্রাচীন) ৫টি প্রাচীন শহরের মধ্যে নড়াইল জেলার বিলুপ্তনগরী নলদিই অন্যতম। নলদি নবগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। নলদি বন্দর হতে একসময় বহির্বিশ্বে ব্যবসা বাণিজ্য চলতো। সুসন ম্যাপ নির্মাণকালে ভুলক্রমে নলদি বুড়ন পরগণার মধ্যে দেখিয়েছেন।[৮৩] এই অঞ্চলে মুসলিম শাসনের শুরু থেকে নলদির গাজির মোকামে (কাজির মোকাম) প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আইন-ই-আকবিরতে নলদির উল্লেখ আছে। নলদি হতে মুঘল সম্রাট আকবরের নিকট বার্ষিক কতো সেনা ও অশ্ব পাঠানোর শর্ত ছিল তাও উল্লেখ আছে।[৮৪]

লাহুড়িয়া ইউনিয়ন

লাহুড়িয়া : মুঘল নৌ সেনাধ্যক্ষ লাহোরিয়া খাঁ-এর নাম অনুসারে এই স্থানের নাম হয় লহোরিয়া। লাহোরিয়া লোকমুখে উচ্চারিত হতে হতে বর্তমান স্থাননাম হয়েছে লাহুড়িয়া।[৮৫] মধুমতির তীরে লাহুড়িয়া একটি ঐতিহাসিক স্থান। অনেকগুলো পাড়া বা মহল্লার একীভূত অবস্থান হলো লাহুড়িয়া গ্রাম। বৃহত্তর যশোর জেলার বৃহত্তম গ্রাম লাহুড়িয়া। লাহুড়িয়ার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পাড়া হলো, ভিন্নাপাড়া, ত্রিলক্ষ্য, এগারনালি, ডহরপাড়া, প্রসন্নপাড়া, মোল্যাপাড়া, মাঝিপাড়া ইত্যাদি।

আরাজিমণ্ডলগাঁতি : স্থানটি ছিল মণ্ডল বংশীয়দের গাঁতিভুক্ত। এজন্য গ্রামের নাম হয়েছিল মণ্ডলগাঁতি। মণ্ডলগাঁতির বর্ধিত অংশের অধিবাসীরা এই শতাব্দীর প্রথম দিকে ভূমি জরিপের সময় মণ্ডলগাঁতি মৌজার ভেতর থাকতে অরাজি হওয়ায় স্থানের নাম হয় অরাজি মণ্ডলগাঁতি। উচ্চারণ বিভ্রাটে অরাজি মণ্ডলগাঁতি হয়েছে এখন আরাজি মণ্ডলগাঁতি।

কামারগ্রাম : আদিতে এই স্থানে কামার সম্প্রদায়ের লোকেরা বসতি স্থাপন করেন। তাই স্থানের নাম হয় কামারগ্রাম।

সরগুনা : মুঘল বিরোধী বিদ্রোহী পাঠান সেনানায়ক সারছিন খাঁ সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে বর্তমান স্থানে বসতি স্থাপন করেন। সারছিন খাঁ নাম থেকে সরগুনা স্থাননাম হয়েছে।[৮৬] জননেতা শেখ আঃ সবুরেব জন্মস্থান।

লোহাগড়া ইউনিয়ন

মাকড়াইল : উপবঙ্গে বড়ো বড়ো আইল বা আল বেঁধে জমির চাষ করা হতো। সেচ, কৃষি ও বন্টন ব্যবস্থায় আলের ব্যবহার ছিল। বর্তমান স্থানেও মধ্যম আকারের আইল দিয়ে বসবাসের ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল। এরপর 'মধ্যম আকারের আইল' সংক্ষিপ্ত হয়ে স্থাননাম দাঁড়িয়েছে মাকড়াইল।

কাশিপুর : হিন্দুদের তীর্থস্থান কাশির নাম অনুসারে স্থানের নাম হয়েছে কাশিপুর।

নয়াখোলা : নয়াকৌল বা কোলা থেকে প্রথমে স্থানের নাম হয়েছিল নয়াকোলা। নয়াকোলা আরো পরিবর্তিত হয়ে স্থাননাম হয়েছে নয়াখোলা। অন্য মতে এই এলাকায় ছিল ধানরোয়ার খোলা বা বীজতলা। ধানরোয়ার খোলা থেকে স্থাননাম হয় রোয়াখোলা। আবার রোয়াখোলা থেকে নাম হয়েছে নয়াখোলা।

চাকসি : চকদ্বীপ অর্থাৎ কোনো জমিদারের মহালের দ্বীপ বিশেষ। চকদ্বীপ থেকে স্থানের নাম হয় চকদি। চকদি থেকে তা আরো পরিবর্তিত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে চাকসি।

শালনগর : কারো কারো মতে বিশালনগর শব্দ থেকে শালনগর শব্দটি এসেছে। এই গ্রামে আছে সুবাদার আলিবর্দি খানের এক কর্মচারীর আবাসস্থল। বিশাল বাড়ি, বেশ কয়েকটি দেবমন্দির, নাটমন্দির এই বাড়ির বৈশিষ্ট্য। বাড়িটিকে চাকলানবিশবাড়ি বলা হয়। বিশালনগর–এর 'বি' বিযুক্ত হয়ে পরবর্তীকালে স্থাননাম হয়েছে শালনগর। শালনগর গ্রামটি মধুমতি নদীর তীরে। একটি খালের পরপারে শালনগরের আরেকটি অংশকে বলে পারশালনগর। শালনগর স্থাননাম সম্বন্ধে আরেকটি মত আছে তা হলো, খালের পারে স্থিত নগর বা বসতি বলে স্থানের নাম হয়েছিল খালনগর। খালনগর থেকে স্থাননাম হয়েছে শালনগর। শালনগর এর নামে বোজরুক শালনগর বা বাজে শালনগর নামে আরেকটি স্থান আছে। ভূমি জরিপের সময় এই অংশের অধিবাসীরা শালনগর গ্রামের পরিচয় দিয়ে স্থাননাম লাভ করে।

নোয়াগ্রাম ইউনিয়ন

তেলিগাঁতি : স্থানটির নামের পেছনে রয়েছে তেলি সম্প্রদায়ের স্মৃতি। তেলিরা যে ভূমির ইজারা নিয়েছিল সেটাই পরবর্তীকালে তেলিগাঁতি নাম হয়েছে।

মাধবহাটি : জনৈক মাধবের বসতবাড়িকে লক্ষ্য করে স্থাননাম হয়েছে মাধবহাটি। হাট অর্থ এখানে বসতি।

শামুকখোলা : নড়াইল জেলা এলাকায় স্থানীয়ভাবে এক জাতীয় সারস পাখিকে

শামুকখোলা বলে থাকে। তারা শামুক আহার করে। এই ভাবে যে বিলাঞ্চলে শামুকখোলা পাখি অবস্থান করতো। সেই স্থানের নাম হয়েছে শামুকখোলা। এই স্থানের বর্ধিত অংশের নাম চরশামুকখোলা।

নোয়াগ্রাম : নয়াবসতির গ্রাম বলে স্থানের নাম হয়েছিল নয়াগ্রাম। নয়াগ্রাম থেকে স্থানের নাম হয়েছে নোয়াগ্রাম।

আড়পাড়া : বিস্তৃত এলাকার মধ্যে আড়াআড়িভাবে স্থিতপাড়া থেকে আড়পাড়া স্থাননামটি এসেছে।

কাংকুল : গ্রামটি ছিল এক সময় গাঙ্গ বা নদীরকূলে। এই ভাবে গ্রামটি হয়েছিল গাঙ্গকুল। গাঙ্গকুল থেকে স্থাননাম হয়েছে কাংকুল।

রায়গ্রাম : রায় বংশীয়দের প্রতিষ্ঠিত গ্রাম বলে স্থানের নাম হয়েছে রায়গ্রাম।

কলাগাছি : যদিও এই গ্রামে কলাগাছ এখন আর তেমন নেই। তবে একসময় কলাগাছের আধিক্যের জন্য স্থানের নাম হয়েছে কলাগাছি। মুঘল সেনা বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ (পরে সীতারামরায়ের বিদ্রোহী দলভুক্ত) মেনাহাতির জন্মভূমি এই কলাগাছি। অন্যমতে কেলা বা দুর্গের গাছ থেকে প্রথম শব্দটি ছিল কেলাগাছি। পরে কেলাগাছি হয়েছে কলাগাছি।

কাশীপুর ইউনিয়ন

চালিঘাট : প্রাচীন নদীর গোব থেকে পথচলবার ঘাট থেকে স্থানের নাম হয় চলার ঘাট। চলারঘাট ক্রমান্বয়ে চালিঘাটে রূপায়িত হয়েছে।

শাহবাজপুর : সুলতানি শাসনামলের শেষ দিকে জনৈক পাঠান সেনাধ্যক্ষ শাহবাজ খাঁর নামানুসারে এইস্থানের নাম হয়েছে শাহবাজপুর। শাহবাজ খাঁ এই স্থানে শেষ জীবনে বসবাস করেছিলেন।

ধোপাদহ : নবগঙ্গা নদীর দহের উত্তরতীরে এক সময় এখানে ধোপা সম্প্রদায়ের বসতি গড়ে ওঠে। সেই থেকে স্থানের নাম হয় ধোপাদহ। এখন এই স্থানে ধোপাদের কোনো বসতি নেই।

বসুপটি : কায়স্ত বসু বংশীয় লোকেরা এখানে প্রথম বসতবাটি স্থাপন করে। সেই হতে স্থানের নাম হয় বসুবাটি। বসুবাটি রূপান্তরিত হয়েছে বসুপটিতে।

এড়েন্দা : প্রাচীন এড়োদ্বীপ থেকে স্থানের নাম হয়েছে এড়েন্দা।

রামপুর : রামনাথের নামে এই স্থানের নাম হয় রামপুরি। রামপুরি থেকে স্থানের নাম হয়েছে রামপুর। এখানে ফৈজুল্লাহ শাহ বা পজুশাহ দেওয়ানের দিঘি, মসজিদ ও মাজার বিদ্যমান।

লক্ষ্মীপাশা ইউনিয়ন

পদ্মবিলা : এখানকার বিলে এক সময় অজস্র পদ্ম ফুটে থাকতো। এইভাবে বসতি স্থাপনের পরে স্থানের নাম হয়েছিল পদ্মবিল। পদ্মবিল-এর সাথে 'আ' প্রত্যয় যোগে স্থানের বর্তমান নাম পদ্মবিলা।

গিলাতলা : বসতি স্থাপনের প্রথম দিকে এই স্থানে একটি গিলাগাছ থাকায় স্থানের নাম হয়েছে গিলাতলা।

ভাটগাঁতি : প্রাচীনকালে একদল ভাট-ঘটক নির্দিষ্ট জমিতে বসতি-স্থাপন করে। এরপর স্থানের নাম হয় ভাটগাঁতি। অর্থাৎ ভাটদের ইজারা পাওয়া জমি। বর্তমান ভাটগাঁতি প্রাচীন ভাটদের ইজারা পাওয়া জমি। বর্তমান ভাটগাঁতিতে প্রাচীন ভাটদের সন্ধান পাওয়া যায় না। হয় তো তারা তাদের ধর্ম ও পেশা পরিবর্তন হয়েছে। তবে এখানে বেশ কয়েক ঘর কাবদারের বসতি আছে।

খলিসাখালি : খলিসা মাছে সমৃদ্ধ খালকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বসতিকে খলিসার খাল বলা হতো। সেই খলিসার খালই পরবর্তীকালে খলিসাখালি স্থাননাম হয়েছে।

হামারহোল : শত শত বছর আগে এই স্থানে কামার সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস শুরু করে। প্রথমে স্থানের নাম ছিল কামারকোল। শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে স্থাননাম দাঁড়িয়েছে হামারহোল এ।

বয়রা : প্রাচীনকালে স্থানের নাম ছিল বহেড়াতলা। বহেড়া গাছকে কেন্দ্র করে স্থানের নাম গড়ে ওঠে। লোকমুখে শত শত বছর ধরে উচ্চারিত হতে হতে স্থানের নাম হয়েছে বয়রা।

উলা : নবগঙ্গা তীরবর্তী গ্রাম উলা অনেক আগে পার্শ্ববর্তী গ্রাম কোলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। এখানে সুলতানি বা পাঠান শাসনামলের একটি কেলা বা দুর্গ ছিল। সেই কেলা শব্দ থেকে 'কোলা' ও 'উলা' শব্দ দুটোর উদ্ভব হয়েছে। উলা একটি ঐতিহাসিক স্থাননাম।[৮৭]

দেউপাড়া : গ্রামের যে স্থানে দেউ বা দেবতার পূজা হতো সেই স্থান দেউপাড়া নামে পরিচিতি পায়।

নওরা : মুঘল নওয়ারা মহলের বা নৌবাহিনীর কর্মচারীদের দেও এককালীন ভূমিকে নওয়ারা মহল বলা হতো। নওরার অদূরে লক্ষ্মীপাশার পণ্যজীবী মজুমদার পরিবারে মুঘল নওয়ারা বা নৌবাহিনীর কর্মচারী ছিল বলে জানা যায়।[৮৮] সম্ভবত মজুমদার পরিবারের প্রাপ্ত নওয়ারা মহলের স্থানই পরবর্তীকালে স্থাননাম হয়েছে নওরা। অন্য মতে মগদমনের জন্য নওয়ারার অবস্থান স্থল।

আমাদা : আমদা ফারসি শব্দ। অর্থ হলো, ভূমি জরিপ কাজের সূচনা। ঐ এলাকার যে স্থান থেকে জরিপ কাজ শুরু হয় সে স্থানটির নাম হয়েছিল আমদা। আমদা থেকে হয়েছে আমাদা।

জয়পুর ইউনিয়ন

বাবরা : প্রথম দিকে স্থাননাম ছিল বাবরাতলা। বাবরা গাছের তলায় বসতি স্থাপনের জন্য এই নামের সৃষ্টি। পরে তা সংক্ষিপ্ত হয়ে শুধু বাবরায় রূপ নিয়েছে।

নাওরা : মুঘল নওয়ারা বা নৌবাহিনীর কোনো কর্মচারীর এককালীন প্রাপ্ত জমি নাওয়ারামহল ছিল এই এলাকা। নওয়ারা মহলের সংক্ষিপ্ত রূপ হলো নাওরা।

চোরখালি : নদীর চরের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত খালকে বলা হতো চরের খাল।

চরের খাল শব্দ থেকে সৃষ্ট হয়েছে চোরখাল। আর খাল শব্দের অন্তে 'ই' প্রত্যয় যোগে হয়েছে চোরখালি।

গোপাডিঙ্গা : স্থানটি ছিল ডাঙ্গার ঝোপ পূর্ণ। এইভাবে স্থানের প্রথম নাম হয় ঝোপডাঙ্গা বা ঝোপাডাঙ্গা। ঝোপাডাঙ্গা শব্দ থেকে স্থানের নাম হয়েছে গোপাডিঙ্গা।

নারায়ণদিয়া : স্থানটি ছিল একটি ছোট দ্বীপ বিশেষ। নারায়ণ নামক এক ব্যক্তি এখানে বসতি স্থাপন করায় স্থানের নাম হয় নারায়ণদ্বীপ। সেই নারায়ণ দ্বীপ লোকমুখে সংক্ষিপ্ত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে নারায়ণদিয়া।

আড়িয়ারা : আড়াআড়িভাবে স্থিত দ্বীপ থেকে স্থাননাম হয় আড়দ্বীপ। সেই আড়দ্বীপ লোকমুখে উচ্চারিত হতে হতে স্থানের নাম হয়েছে আড়িয়ারা। আড়িয়ারার চরাঞ্চল চরআড়িয়ারা নামে পরিচিতি পেয়ে আসছে।

আস্তাইল : রাস্তা ও আইলের সমন্বিত স্থানের নাম হয়েছিল রাস্তাইল। রাস্তাইল থেকে শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে স্থাননাম হয়েছে আস্তাইল।

শালনগর ইউনিয়ন

কালনা : শত শত বছর আগে লোহাগড়া থেকে নবগঙ্গা উত্তর পূর্বদিকে প্রবাহিত কালনার কাছে মধুমতি নদীতে প্রবাহিত হতো। ধীরে ধীরে নবগঙ্গার এই অংশ ক্ষীণ হতে থাকে। দেখাতো খালের মতো। স্থানীয় লোক তবু নবগঙ্গার গর্বে গর্বিত হয়ে বলতো, 'এটা খাল না নদী'। এই কথাটা সংক্ষিপ্ত হয়ে স্থাননাম হয় 'খালনা'। খালনা থেকে শব্দটি হয়েছে কালনা। কালনায় মুঘল আমলে সেনাফাঁড়ি বা থানা ছিল। এখানে ছিল নাওয়ারাবন্দর। আজো কালনায় কয়েকটি প্রাচীন তেতুল গাছ ও যুদ্ধ জাহাজ বেঁধে রাখার বিশাল পাথরের স্তম্ভ দেখা যায়।

কামঠানা : স্থানটি কালনার পার্শ্ববর্তী। সম্ভবত কালনা থানা শব্দ থেকে কালথানা। আরো পরে কালথানা থেকে কামঠানা স্থাননাম হয়েছে।

তেঁতুলিয়া : এখানে প্রথম বসতি স্থাপনকালে ছিল একটি তেঁতুলগাছ। গাছটি ছিল দ্বীপ বা দিয়ার উপরে। এইভাবে স্থাননাম হয় তেতুদিয়া। তেতুদিয়া থেকে স্থানের নাম হয়েছে তেতুলিয়া।

কুমারকান্দা : পূর্বে উল্লিখিত লোহাগড়া থেকে কালনায় গিয়ে প্রবাহিত নবগঙ্গা নদীর কান্দিতে যে গ্রাম গড়ে ওঠে সে স্থানই পরবর্তীকালে কুমারকান্দা। প্রথম দিকে স্থানটির নাম ছিল কুমিরেরকান্দা। এখানে নদীতে প্রচুর কুমির থাকতো। কুমিরের কান্দা পরিবর্তিত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে কুমারকান্দা। কুমারকান্দার নদীপথে মগফিরিঙ্গি দস্যুদের আটক করার জন্য সুবাদার শায়েস্তা খাঁ পরিচালিত মুঘলবাহিনী কুমারকান্দায় গোপনে ওৎ পেতে থাকতো।

পোদ্দারপাড়া : জনবসতির যে এলাকায় স্বর্ণালংকার প্রস্তুতকারী পোদ্দারেরা বসতি স্থাপন করে সেই স্থানের নাম হয় পোদ্দারপাড়া। পোদ্দারপাড়া পরে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের মর্যাদা পায়।

চরকরফা : প্রাচীন জমিদার কিংবা জায়গিরদারদের কাছ থেকে ইজারা নেওয়া জমিকে বলা হয় কোরফা। কোরফা ফার্সি শব্দ। কোরফা নিয়ে যে এলাকায় কেউ বসতি

স্থাপন করেন সেই স্থানের নাম হয় করফা। করফার মূল অংশের চর অংশই চরকরফা নামে পরিচিতি পেয়েছে।

মল্লিকপুর ইউনিয়ন

মঙ্গলহাটা : প্রাচীনকালে মণ্ডল বংশীয়দের দ্বারা বসতি স্থাপন করা স্থানকে মণ্ডলহাটা বলা হতো। হাট এখানে বসতি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এইভাবে স্থানের নাম হয়েছে মণ্ডলহাট। মণ্ডলহাট শব্দ থেকে পরবর্তীকালে স্থানের নাম হয়েছে মঙ্গলহাটা।

মহিশাপাড়া : মধুমতি নদীর তীরে সাধক মহিউদ্দিন শাহ নড়াইলের বর্তমান মহিশখোলা থেকে এসে এখানে অবস্থান করেছিলেন। এই ঘটনা স্বাধীন সুলতানি আমলের। মহিউদ্দিন শাহের নামানুসারে স্থানের নাম হয়েছিল মহিশাপাড়া। প্রায় ৪ শত বছর আগে হযরত জাহানদার খান বা জামদার খান এই এলাকায় কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি ফরিদপুরের গোপীনাথপুর অভিযান করেন। ফরিদপুর পশ্চিমপাড়ায় বড়োবাড়িতে বা মিয়াবাড়িতে তার মাজার আছে। মহিশাপাড়ার লস্করেরা তাঁর বংশধর। সম্প্রতি মহিশাপাড়া গ্রামটি নদীভাঙ্গনে প্রায় নিঃশেষ হয়েছে।[৮৯]

মল্লিকপুর : নবগঙ্গা প্রাচীন নদী খাতের পাশে মল্লিকপুর গ্রাম। প্রবাদ আছে, জনৈকা মল্লিকা রাণীর নামে একজন ব্রাহ্মণ এই এলাকার ইজারা নিয়ে ছিলেন। মল্লিকা ছিলেন ব্রাহ্মণের স্ত্রী। মল্লিকারপুরি থেকে স্থাননাম হয়েছে মল্লিকপুর। মল্লিকপুর খুব প্রাচীন গ্রাম। 'আইন-আকবির'তে গ্রাম মল্লিকপুরের উল্লেখ আছে। এখান থেকে কতো সেনা ও অর্থ দিল্লীর সম্রাটকে বার্ষিক দেওয়ার শর্ত ছিল তা জানতে পারা যায়। মল্লিকপুরের বর্ধিতাংশ পারমল্লিকপুর নামে পরিচিত। সুলতানি আমলে 'শাকরমল্লিক' উপাধিধারী কোনো লোকের আবাসস্থল থেকে নামটি আসতে পারে। অন্যমতে, ফারসি ভদ্র অর্থে ভদ্রজনের বশতি হলো মল্লিকপুর।

সোনাদহ : সোনামিয়ার দহ থেকে স্থানের নাম হয়েছে সোনাদহ।

পাঁচুড়িয়া : পাঁচ পিরের মাজারের অবস্থিতির জন্য স্থানের নাম হয়েছে পাঁচুড়িয়া। এটি সুপ্রাচীন ও ঐতিহাসিক গ্রাম। এখানে আজো প্রাচীন পাঁচ পিরের মাজার দেখতে পাওয়া যায়। পাঁচুড়িয়াকে বারোবাহাদুরের গ্রাম বলা হয়। লস্কর, মির, শেখ, কাজি প্রভৃতি ১২টি বংশের লোক বাংলার সুবাদারের কাছ থেকে বাহাদুর খেতাব পেয়েছিলেন বলে কিংবদন্তি আছে।[৯০]

কাওলিডাঙ্গা : সুলতানি শাসনামলে নিষ্কর জমিতে বসবাস স্থাপন করার জন্য স্থানের নাম হয় মাওলিডাঙ্গা। ফার্সি মাওলি শব্দের অর্থ হলো নিষ্কর ভূমি প্রাপ্তি। মাওলিডাঙ্গা পরিবর্তিত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে কাওলিডাঙ্গা।

ইতনা ইউনিয়ন

ইতনা : জমি জরিপের সময় এলাকার জরিপ ইতি হয়েছে বলে জনৈক কর্মচারী ঘোষণা করলে আরেকজন কর্মচারী জানান, 'ইতি না', অর্থাৎ শেষ হয় নি। গ্রামটি আরো বড়ো। এই ভাবে গ্রামের নাম হয়েছিল ইতিনা। 'ইতিনা' আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে ইতনা।[৯১]

বাগপাড়া : মধুমতি নদীর প্রাচীন বাঁকের ওপর বসতি গড়ে ওঠায় স্থানের নাম হয়েছিল 'বাঁকপাড়া'। বাঁকপাড়া পরিবর্তিত হয়েছে স্থাননাম বাগপাড়া।

রাধানগর : জনৈক রাধানাথ এইস্থানে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। তার নাম অনুসারে স্থানের নাম হয় রাধানগর।

কুমারডাঙ্গা : শীতকালে নদীর তীরে কিংবা বড়ো জলাশয়ের পাড়ে কুমিরের দল রোদ পোহাতো যে ডাঙ্গায় সেই স্থানের নাম হয় কুমিরের ডাঙ্গা। কুমিরের ডাঙ্গা শব্দ থেকে কুমারডাঙ্গা স্থাননাম হয়েছে।

ডিগরিরচর : দেওয়ানি মামলায় ডিকরি পাওয়ায় চরের স্থানই ডিগরিরচর স্থানন'মে পরিচিতি পেয়েছে।

মিরেরচর : মির-ই-নওয়ারা বহরের ব্যবহৃত চরকে বলা হয়েছে মিরেরচর।

দিঘলিয়া ইউনিয়ন

তালবাড়িয়া : তালগাছ ঘেরা একটি বাড়ি দ্বারা প্রথমে এই গ্রামে বসতি স্থাপনের কাজ শুরু হয়। এই তালগাছাঘেরা বাড়ি থেকে স্থানের নাম হয় তালবাড়িয়া।[৯২]

কুমড়ি : কুমড়ির ডাঙ্গা বলে খ্যাত। এক সময় এখানকার প্রাচীন কালিগাঙ্গের গোবে কুমির অবস্থান করতো। কুমিরের অবস্থানের কারণে স্থানের প্রথম নাম হয়েছিল কুমিরের ডাঙ্গা। সেই কুমিরের ডাঙ্গা পরবর্তীকালে লোকমুখে ক্ষয়ে যেতে যেতে হয়েছে কুমড়ি।[৯৩]

সারল : ভূমি জরিপের সময় স্থাটিকে সোজা বা সরলভাবে দেখানোর জন্য জরিপ বিভাগের ইচ্ছেয় স্থানের নাম হয়েছে সরল। পরবর্তীকালে সরল থেকে স্থানের নাম হয়েছে সারল।

কোলা : কোলা, উলা ও দিঘলিয়া পাশাপাশি প্রায় ৩টি গ্রাম। এই তিনটি গ্রাম সুলতানি শাসনামলে একটি পরিচয়ে পরিচিত ছিল। তা হলো কেলা বা কেল্লা বা দুর্গ। কেলা থেকে সৃষ্টি হয়েছে দুটো স্থাননাম কোলা ও উলা। কেল্লা সন্নিহিত দির্ঘিকা বা দিঘি থেকে আরেকটি স্থানের নাম হয়েছে দিঘলিয়া। অনেক আগেই নবগঙ্গা–বানকানার প্রবল স্রোতে সুলতানি শাসনামলের কেলা ও তার দিঘি বিনষ্ট হয়েছে। দিঘলিয়ার চরের অংশ চর দিঘলিয়া স্থাননামে পরিচিতি পেয়েছে।

কোটাকোল ইউনিয়ন

কোটাকোল : কোতোয়ালের কৌল বা অবস্থান স্থল থেকে কোটাকোল স্থাননাম হয়েছে। স্বাধীন সুলতানি শাসনামলে কিংবা মুঘল শাসনামলের শেষ দিকে মধুমতি নদীর তীরে মগ-ফিরিঙ্গিদের দমনের জন্য একটি কেলা বা গড় ছিল। কোটাকোলে মুঘল আমলে নির্মিত একটি জোড়বাংলা রাধাকৃষ্ণ মন্দির আছে। দুর্গটি গড় বা পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল বলে কোটাকোলের সংলগ্ন আরেকটি স্থানের নাম হয়েছে গড়েরহাট। গড়েরহাট অনেক আগেই মধুমতিতে নিমজ্জিত হয়েছে।[৯৪]

ভাটপাড়া : প্রাচীন ভাট-ঘটকদের বসতি থেকে স্থানের নাম হয়েছে ভাটপাড়া।[৯৫]

ভূসাঁইল : ভূ-স্বামী বা জোতাদার বা গাঁতিদারের জমির আইলের অবস্থিতি থেকে স্থানের নাম হয়েছিল ভূ-স্বামীর আইল। সেই ভূ-স্বামীর আইল থেকে শব্দটি হয়েছে ভূসাইল।

মাইগ্রাম : মাইগ্রাম নবগঙ্গা বানকানার উত্তরতীরে অবস্থিত। ইংরেজ শাসনামলে এখানে নীল গাছের চাষ হতো। কোনো কুঠিয়াল সাহেব এই স্থানটিকে দেখিয়ে বলেছিল, মাইগ্রাম অর্থাৎ আমার গ্রাম। সেই হতে স্থানের নাম হয়েছে মাইগ্রাম।[৯৬]

করগাঁতি : কায়স্থ কর বংশীয়দের গাঁতির মধ্যে ছিল এই গ্রাম। প্রথমে স্থানটিকে বলা হতো করের গাঁতি। করের গাঁতি থেকে স্থাননাম হয়েছে করগাঁতি।

কালিয়া থানা

বাবরা-হাচলা ইউনিয়ন

বারোইপাড়া : বারো জাতির পাড়া থেকে স্থানের নাম হয়েছে বারোইপাড়া। এখন আর বারো জাতির বসত নেই তবে স্থান নামটি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।[৯৭]

শিংগারডাঙ্গা : সিংহ বা সিং বংশীয়দের দখলি ডাঙ্গা থেকে স্থানের নাম হয়েছে শিংগারডাঙ্গা।

কাঞ্চনপুর : জনৈক কাঞ্চন এই স্থানে প্রথম বসতি স্থাপন করায় স্থানের নাম হয় কাঞ্চনপুরি। কাঞ্চনপুরি থেকে স্থানের নাম হয়েছে কাঞ্চনপুর।

বাঘারডাঙ্গা : নড়াইল জেলায় কিছু কাল আগেও বাঘের উপদ্রব ছিল। এইস্থানে ডাঙ্গার জলাজঙ্গলে মেছো বাঘ অবস্থান করে মাছ শিকার করে খেতো। এইভাবে স্থানের নাম হয়েছে বাঘেরডাঙ্গা। বাঘেরডাঙ্গা থেকে স্থানের নাম হয়েছে বাঘারডাঙ্গা।

শুক্তগ্রাম : নবগঙ্গা নদী ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এই গ্রামের পার্শ্ববর্তী হলেও গ্রামটি অক্ষত থাকার জন্য স্থানের নাম হয় শক্তগ্রাম। শক্তগ্রাম থেকে গ্রামটি হয়েছে শুক্তগ্রাম।

কলিমনখালি : জনৈক কলিমাহমুদ বা কলিমাউনের দ্বারা যে খালের কাছে প্রথম বসতি স্থাপিত হয় সেইস্থানের নাম হয় কলিমাউনের খাল। কলিমাউনের খাল থেকে স্থানের নাম হয়েছে কলিমনখালি।

মাউলি ইউনিয়ন

মাউলি : মাওলি ফারসি শব্দদ্বারা বুঝায় শাসকের পক্ষ থেকে নিষ্কর জমি প্রাপ্তি। এই স্থানটি সুলতানি শাসনামলে মাওলি হিসেবে পেয়েছিলেন কোনো পত্তনিদার। মাওলি শব্দ থেকে স্থানের নাম হয়েছে মাউলি।[৯৮] মাউলিতে প্রাচীন আমলের একটি ছোটো ইটের বাড়ি আজো বিদ্যমান। সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মানিকচন্দ্র বিশ্বাসের বসতভিটা খননের ফলে সম্প্রতি সম্রাট শাহজাহানের শাসনাকাল অংকিত একটি রূপার মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে।[৯৯]

চান্দেরচর : নবগঙ্গা নদীর ভরাট চরে জনৈক চান্দ মিয়া বসতি স্থাপন করায় স্থানের নাম হয় চান্দেরচর।

গোবরাডাঙ্গা : ফারসি গেওরা শব্দ দ্বারা বুঝায় নওয়াবা বহর চলাচলের জলপথ।

এই গেওরা শব্দ থেকে এসেছে গোবরা। গোবরা উঁচু ভূমিতে পরিণত হওয়ার জন্য স্থানের নাম হয়েছে গোবরাডাঙ্গা।

মহাজন : প্রাচীনকাল থেকে নবগঙ্গা নদীর তীরে শৌণ্ড সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করতো। তারা ব্যবসায় বাণিজ্যে বিশেষ সম্পদের অধিকারী হন। নড়াইল জেলা এলাকায় ধনী ব্যবসায়ীদের বলা হয় মহাজন। মহাজনদের বসতি স্থান বলে স্থানের নাম হয়েছে মহাজন। মহাজন আজো একটি ব্যবসায় কেন্দ্র। এবং এখানে ৩ দিন ব্যাপী লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে আড়ং বা মেলা হয়।[১০০]

ইসলামপুর : নবগঙ্গা নদীর পশ্চিম চরে যে গ্রামটি গড়ে ওঠে স্থানীয় লোকেরা সেই স্থানের নাম রেখেছেন ইসলামপুর বা শান্তিরস্থান। ইসলামপুরে একটি মাদ্রাসা আছে।[১০১]

সালামাবাদ ইউনিয়ন

হাড়িডাঙ্গা : প্রাচীন জনপদ থেকে আড়াআড়ি অবস্থানে থাকা ডাঙ্গার নাম হয় আড়াআড়িডাঙ্গা। আড়াআড়িডাঙ্গা লোকমুখে সংক্ষিপ্ত ও বিকৃত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে আড়িডাঙ্গা। পরবর্তীকালে আড়িডাঙ্গা আরো পরিবর্তিত হয়ে নাম হয়েছে। হাড়িডাঙ্গা।

দাসনাওরা : নবগঙ্গা নদীর দক্ষিণপারে মুঘল নওয়ারাবহর বা নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ মগফিরিঙ্গিদের দমনের জন্য অবস্থান করতো একটি নদীর মধ্য দিয়ে। এই নদী দিয়ে দ্রুত সুন্দর বনের দিকে চলে যাওয়া যেত। এই ছোট নদীটি মগফিরিঙ্গি দমনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এই নদীটির নাম হয়েছিল নওবার খাল বা নাওরার খাল। নাওরা খাল এখন কালিয়া শহরের অদূরে মির্জাপুরও গোবিন্দনগরের পার্শ্ব দিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় প্রবাহিত হচ্ছে। এই নওয়ারা খালের দুই পাশে গড়ে উঠেছে দুটো গ্রাম। একটি দাসনাওরা অন্যটি ঘোষনাওরা। ঘোষ সম্প্রদায়ের বসতিপূর্ণ গ্রামটি কালিয়া পৌরসভা এলাকার মধ্যে। আর দাস নাওয়া মাহিস্যদাস সম্প্রদায়ের গ্রামটি সালামাবাদ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত।

নলডাঙ্গা : এখানে বসতি স্থাপন করার আগে অধিবাসীরা দেখতে পেরেছিল নলখাগড়ার জঙ্গল। নলখাগড়ার জঙ্গল পূর্ণ ডাঙ্গাই হয়েছে পরবর্তীকালে নলডাঙ্গা।[১০২]

বৈদ্যবাটি : কালিয়া বৈদ্য সমাজের একটি প্রাচীন স্থান। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নিজেদের মধ্যে গোলযোগের কারণে একটি বৈদ্যপরিবার নলিয়া নদীর পশ্চিমতীরে বাটি বা বাড়ি নির্মাণ করে। সেই হতে স্থানের নাম হয় বৈদ্যবাটী।[১০৩]

ভাউড়িরচর : নলিয়া নদীর প্রাচীন বাওড়ের উপর যে বসতি গড়ে তার নাম হয়েছিল বাওড়ের চর। শব্দটি বিকৃত হয়ে পরবর্তীকালে হয়েছে ভাউড়িরচর।

বিলদুড়িয়া : নলিয়া নদীর পশ্চিম তীরে প্রাচীন বাওড় বা জলাশয় যাকে স্থানীয় লোকেরা বলতো বিল দরিয়া বা সাগরবিল। বিলদরিয়া বা সেই সাগরের মতো জলাশয়টি ভরাট হলে সেখানে বসতি গড়ে ওঠে। আর প্রথম দিকে স্থাননাম হয় বিলদরিয়া, বিলদরিয়া এখন বিলদুড়িয়া স্থাননামে পরিচিত।

কালিয়া পৌরসভা

কালিয়া : নবগঙ্গা নদী হতে পূর্বদিকে এগিয়ে নাওরা নদী পেরিয়ে প্রাচীনকালে কালিগঙ্গা নামে একটি নদী প্রবাহিত হতো। সেই প্রাচীন কালিগঙ্গা নদীর ভরাট বুকে নবগঙ্গার পূর্বে যে জনপদ গড়ে ওঠে সেই স্থানই কালিয়া নামে পরিচিত। বিশ্বনন্দিত নৃত্যশিল্পী উদয় শংকর, সেতারশিল্পী রবিশংকরের পৈত্রিক নিবাস কালিয়া।

রামনগর : রামচন্দ্র নামের এক ব্যক্তি প্রথম এখানে বসতি স্থাপন করায় স্থানের নাম হয়েছে রামনগর। নগর এখানে লোকালয় অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

মির্জাপুর : মির্জানাথানের লেখা বাহারীস্থান-ই-গায়বী গ্রন্থে (১৬০৯) নড়াইল এলাকায় বারো ভূঁইয়াদের সাথে যুদ্ধের কাহিনী জানতে পারা যায়। সুবাদার ইসলাম খান চিশতি খুলনার আলাইপুরের ফতেপুর গড়ে অবস্থান করে এই অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মির্জা নাথানও এই নওয়ারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। মির্জা নাথানের পিতা ছিলেন তখন নওয়ারা বা নৌবাহিনী প্রধান। মির্জাপুরে পার্শ্ববর্তী নওয়ারা নদী দিয়ে মুঘল বাহিনী মগফিরিঙ্গ দমনের জন্য বহু অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। অনুমান করা যায়, মির্জা নাথান অথবা অনুরূপ কারো নামে মির্জাপুর গ্রামের নামকরণ হয়েছে। মির্জাপুর গ্রামে মির্জাপদবির কোনো লোকের বাস করাতো দূরের কথা আজো মির্জাপুরের পাশ্ববর্তী এলাকায়ও কোনো মুসলমানের বসতি নেই।

জয়পুর : মগফিরিঙ্গি দমনে যে নাওরা নদী ব্যবহার হয়েছিল জয়পুর গ্রাম সেই নাওরা নদীর পাশেই অবস্থিত। এবং মির্জাপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম জয়পুর। সম্ভবত মুঘল নওয়ারা বাহিনী যে স্থানে মগফিরিঙ্গিদের উপর বড়ো রকমের যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল সেই স্থান এখনো জয়পুর নামে পরিচিত।

গোবিন্দনগর : এই স্থানে প্রথম বসতবাড়ি স্থাপনকারী গোবিন্দের নামানুসারে স্থাননাম হয়েছে গোবিন্দনগর। নগর এখানে লোকালয় অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

খাশিয়াল ইউনিয়ন

চোরখালি : নবগঙ্গা নদীর পূর্ব তীর দিয়ে একটি খাল প্রবাহিত হতো। এক সময় খালটি বালুচরে ভরাট হয়ে যায়। তখন খালের নাম হয় চরখালি। চরখালি থেকে স্থানের নাম হয়েছে চোরখালি।

শুড়িগাতি : শৌণ্ড বা সাহা সম্প্রদায়কে নিম্নার্থে নড়াইল জেলা এলাকায় বলা হয় শুড়ি। এই শুড়িদের গাঁতিদারির একটি মহল শুড়িগাঁতি নামে পরিচিতি পায়। এই ভাবে শুড়ির গাঁতি থেকে স্থানের নাম হয়েছে শুড়িগাতি।

তালবাড়িয়া : তালগাছ চিহ্নিত বাড়ি থেকে স্থাননাম হয় তালবাড়িয়া।

পুটিমারি : স্থানের পুরোনাম ছিল পুটিমারির খাল ; অর্থাৎ যে খালে প্রচুর পুটিমাছ মারা পড়তো সেই খালই ছিল পুটিমারির খাল। পুটিমারির খাল সংক্ষিপ্ত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে পুটিমারি।[১০৪]

পাকুড়িয়া : পাকুড় গাছ চিহ্নিত দ্বীপ স্থানের নাম হয়েছিলো পাকুড়দিয়া।

পাকুড়দিয়া শব্দটি সংক্ষিপ্ত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে পাকুড়িয়া।[১০৫]

পাটনা : নবগঙ্গা ও নলিয়া নদীর সঙ্গমস্থলের নাম পাটনা। প্রাচীনকালে এই এলাকায় নদী পারাপারের পাটনিনৌকা ব্যবহার হতো। এবং ওখানে গড়ে উঠেছিল একটি পাটনিপাড়া। পাটনিপাড়া শব্দটি লোকমুখে উচ্চারিত হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে স্থানের নাম দাঁড়িয়েছে পাটনা। পাটনা এখন ৩ ভাগে বিভক্ত। নলিয়া নদীর দক্ষিণপারের অংশকে বলা হয় পারপাটনা। নবগঙ্গার পূর্বপারের অংশ পাটনা। এবং আরো উত্তরের অংশকে বলা হয় ব্রাহ্মণপাটনা। এক সময় এই এলাকায় ব্রাহ্মণদের বসতি ছিল।

জয়নগর ইউনিয়ন

নয়নপুর : প্রথম বসতি স্থাপনকারীরা তাদের বাড়িটিকে নয়াপুরি বা নতুনপুরি আখ্যা দিয়েছিল। সেই থেকে স্থানের নাম হয় নতুনপুরি। নতুনপুরির স্থাননাম দাঁড়িয়েছে নয়নপুর।

পদুমা : এই স্থান কিছুকাল আগেও নিচু জলাশয় ছিল। ঐ জলাশয়ে ফুটে থাকতো অজস্র পদ্মফুল। স্থানীয় হিন্দুরা ঐ পদ্মের উপর দেবীকে কল্পনা করে স্থানের নাম দেয় পদুমা।[১০৬] অর্থাৎ পদ্মের উপর শোভিতা মা।

দুলালগাঁতি : দুলাল বাবুর গাঁতি থেকে স্থানের নাম হয়েছে দুলালগাঁতি।

তেবাড়িয়া : এখানে প্রথম ৩টি মাঝি পরিবার বসতি স্থাপন করে সেই হতে স্থানের নাম তেবাড়িয়া। এরপর বাড়ির সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেলেও গ্রামের নাম তেবাড়িয়াই থেকে যায়।

রামপুরা : দেবতা রামের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে স্থানীয় লোকেরা স্থানের নাম দেয় রামপুর। রামপুর শব্দের সাথে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে স্থানের নাম হয় রামপুরা।

গাছবাড়িয়া : গাছবেষ্টিত বাড়ি থেকে স্থানের নাম হয়েছে গাছবাড়িয়া।

পানিপাড়া : জনবসতির যে এলাকায় বিশেষত জোয়ারের সময় মধুমতি নদীর পানিতে ভেসে যেতো সেই এলাকার নাম হয় পানিপাড়া।

নড়াগাঁতি : নলনড়া কেটে যে গাঁতি বা আবাদি জমিকে উদ্ধার করা হয় তা-ই নড়াকাটাগাঁতি নামে পরিচিতি পায়। নড়াকাটাগাঁতি সংক্ষিপ্ত হয়ে স্থানীয় নাম হয়েছে নড়াগাঁতি। এই স্থানে রাণী বাসমণি এষ্টেটের একটি প্রাচীন কাচারি বাড়ি আছে। আছে নীলকুঠি।

কেশবপুর : কেশব নামের একজন হিন্দু ভক্ত এখানে বসতি স্থাপন করলে স্থানের নাম হয় কেশবেরপুরি। কেশবেরপুরি থেকে স্থারে নাম হয়েছে কেশবপুর।[১০৭]

পুরুলিয়া ইউনিয়ন

চাঁদপুর : চাঁদের পুরি বা চাঁদ নামের এক ব্যক্তির প্রথম বসতিকে লক্ষ্য করে স্থানের নাম হয় চাঁদেরপুরি। চাঁদেরপুরি থেকে স্থাননাম হয়েছে চাঁদপুর।

লক্ষ্মীপুর : লক্ষ্মী দেবীর ভক্তপূজারিরা গ্রাম প্রতিষ্ঠাকালে স্থানের নাম দেয় লক্ষ্মীপুরি। লক্ষ্মীরপুরি থেকে স্থানের নাম হয়েছে লক্ষ্মীরপুরি।

দাড়িয়াঘাটা : দরিয়া বা সাগরের ঘাট মূলত জলাশয়ের ঘাট থেকে স্থানের নাম হয়েছে দরিয়াঘাট। পরবর্তীকালে ঘাটের সাথে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ও একটু বিকৃত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে দাড়িয়াঘাটা।

আমতলা : বেশ কিছু আমগাছ কেন্দ্রিক বসতি হলে স্থানের নাম হয়েছে আমতলা।

বাজেবাবরা : বাবরা গ্রামের অংশ বিশেষকে জরিপ বিভাগের কর্মচারীরা নাম রাখে বাজেবাবরা অর্থাৎ নিকৃষ্টবাবরা।

দেয়াডাঙ্গা : নদীর ফেলে যাওয়া গোবকে দেয়া বা দিয়া বলা হয়। নবগঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে এমনই এক গোবচরা পড়ে যখন ডাঙ্গার সৃষ্টি হয় তার নাম হয় দিয়াডাঙ্গা। দিয়াডাঙ্গা থেকে স্থানের নাম হয়েছে দেয়াডাঙ্গা।

ফুলদহ : প্রাচীন চিত্রা নদীর একটি দহে যেখানে এক সময় পূজা অর্চনা শেষে বাসিফুল জড়ো হয়ে থাকতো তার জন্য সেখানে বসতি স্থাপনের পর স্থাননাম হয়েছে ফুলদহ।

পারভোমবাগ : নবগঙ্গা নদীর ভীম বাঁক বা ভীষণ মারাত্মক বাঁকের ওপর স্থাপিত জনপদকে প্রথম ভীমবাঁক নামে অভিহিত করা হয়। ভীমবাঁক পরিবর্তিত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে ভোমবাগ। ভোমবাগের পরপারের নাম পারভোমবাগ।

পেড়লি ইউনিয়ন

পেড়লি : পাড়োই বা মৎসজীবীদের বসতি থাকায় এই স্থানের নাম হয়েছিল পাড়োল। পড়োল থেকে স্থানের নাম হয়েছে পেড়লি।

কদমতলা : প্রাচীনকালে কদমগাছ কেন্দ্রীক যে বসতি গড়ে উঠে সে স্থানের নাম হয় কদমতলা।

মহিষখোলা : মহিষ পোষার জন্য একটি খোলা বা স্থান নির্দিষ্ট করেছিল প্রথম বসতি স্থাপনকারীরা। সেই মহিষ খোলা থেকে স্থানের নাম হয়েছে মহিষখোলা।

পেরুলিস্থান : পেড়লি গ্রামের পূর্ব দিকে আতাই-চিত্রা (কালুমালু খাল) নদীর পূর্বপারের স্থানের নাম রাখা হয়েছে পেরুলিস্থান। ঐ এলাকায় বিখ্যাত পির ও কামেল ব্যক্তিদের খানকা শরিফ বিদ্যমান।

শীতলবাড়ি : এখানে বসবাস স্থাপনকারী ব্যক্তিরা শীতল দেবীর ভক্ত থাকায় তারা একটি শীতল মন্দির নির্মাণ করেন। শীতলা মন্দিরকে বলা হয় শীতলবাড়ি। এই শীতলবাড়ি থেকে হয়েছে স্থানের নাম।

সাতবাড়িয়া : সাতটি পরিবার পাশাপাশি বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করার ফলে স্থানের নাম হয়েছে সাতবাড়িয়া। পরবর্তীকালে ঐ স্থানে বাড়ির সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু নাম রয়ে গেছে সেই সাতবাড়িয়াই।

বেন্দা ইউনিয়ন

চালিতাতলা : চালিতা গাছকেন্দ্রিক বসতি বলে স্থানের নাম হয়েছে চালিতাতলা।

নারায়ণপুর : একস্থানের প্রথম বসতি স্থাপনকারী ছিলেন নারায়ণ নামক একব্যক্তি।

তখন স্থাননাম হয় নারায়ণপুরি থেকে স্থানের নাম হয়েছে নারায়ণপুর।

সিলিমপুর : সিলাশব্দ দ্বারা বুঝায় অস্ত্র। এটা ফারসি শব্দ। স্বাধীন সুলতানি শাসনামল থেকে ভূষণা থেকে মধুমতি, নবগঙ্গা, চিত্রা, ভৈবর নদীর তীরে বেশ কয়েকটি সিলাখানা বা অস্ত্রাগার ছিল। উদ্দেশ্য ছিল মগফিরিঙ্গিদের দমন করা। নবগঙ্গা নদীর পূর্বতীরে এমনই একটি সিলাখানা ছিল এখানে। সিলা থেকে স্থানের নাম হয়েছিল সিলাপুর। সিলাপুর আরো পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান স্থাননাম হয়েছে সিলিমপুর।

রামানন্দপুর : দেবতা রামচন্দ্রের মন্দিরকে কেন্দ্র করে স্থানের নাম হয়েছিল রামানন্দপুরি। অর্থাৎ রামের আনন্দপুরি। পরবর্তীকালে স্থানের নাম হয়েছে রামানন্দপুর।

মাধবপাশা : বরিশালের একটি আঞ্চলিক রাজধানী ছিল মাধবপাশা। মগফিরিঙ্গিদের অত্যাচারে মাধবপাশার বেশ কিছু লোক কালিয়া থানার বেন্দা প্রভৃতি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন বলে 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' পাঠে জানা যায়। অনুমান করা যায়, বরিশাল মাধবপাশার অধিবাসীরা এখানে নতুন বসতি স্থাপন করে স্থানের নাম দিয়েছিল মাধবপাশা। সেই হতে স্থানের নাম হয়েছে মাধবপাশা।

পুকুরকূল : মাধবপাশার বর্ধিত জনবসতি একটি প্রাচীন দিঘি বা পুকুরের কূল পযন্ত বর্ধিত হওয়ায় ভূমি জরিপের সময় স্থান নাম হয় পুকুরকূল।

বেন্দা : প্রাচীন বসতবাড়ি নির্মাণকারীরা নবগঙ্গা নদীর তীরে একটি দহে বুন্দে বা নাড়া, খড় ও অন্যান্য আবর্জনা দেখতে পেয়ে স্থানের নাম করেছিলেন বুন্দেরদহ। বুন্দের দহ হতে স্থানের নাম হয়েছে বেন্দারদহ। পরবর্তীকালে নামটি আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে স্থাননাম হয়েছে বেন্দা। উপমহাদেশের বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী, সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক ও নজরুল সঙ্গীতের সুরভাণ্ডারি কমল দাশগুপ্ত ও সুবল দাশগুপ্তের পিতৃভূমি এই বেন্দা। বেন্দার বর্ধিত বসতি বেন্দারচর নামে একটি নতুন স্থানের পরিচিতি পেয়েছে। বিশিষ্ট সংসদ সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধা মরহুম এখলাসউদ্দিন আহমদের জন্মস্থান বেন্দারচর।

উথলি : নবগঙ্গার তীরে পলি পড়ে যখন জমির উর্বরা শক্তি খুব বৃদ্ধি পেয়েছে তখন সামান্য কয়েকটি পরিবার নতুন জমিতে ফসল রোপন করে বিশেষ সাফল্য পায়। তাদের ভাষায়, জমিতে ফসল উতলে উঠে। এই উতলে ওঠা শব্দ থেকে উতলিচর এবং উতলি শব্দ থেকে উথলি স্থাননামটি এসেছে।

কলাবাড়িয়া ইউনিয়ন

কলাবাড়িয়া : জাহান্দার আলি খান বা জামদার খাঁর পুত্র বিখ্যাত বাগেরহাটের পীর খানজাহান আলির ভ্রাতুষ্পুত্র বলে কথিত ওয়ালি মাহমুদ খানের স্থাপিত কেল্লা থেকে কেলাবাড়া এবং কেলাবাড়ি থেকে নাম হয়েছে কলাবাড়িয়া। ওয়ালি মাহমুদের কেলাবাড়া এখন (কলাবাড়িয়ার পশ্চিমপারে) 'ঠাকুরভিটে' নামে পরিচিত।[১০৮] এখানে সুলতানি ও মুঘল আমলের প্রশাসনিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ১৮৫৮ ও ১৮৬০ সালের দুটো প্রাচীন দলিল মোতাবিক কলাবাড়িয়া তরফের ইজারা পেয়েছিলেন মুহম্মদ জকি মোল্যা। তাঁর নামধেয় 'জকি মোল্যা এষ্টেট' ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল। ব্রিটিশ আমলের বি সি

এস এম নুরুজ্জামান, মুক্তিযোদ্ধাকমান্ডার আবুল কালাম আজাদ, নড়াইল টাউন কমিটি বা পৌরসভার প্রথম মুসলমান প্রেসিডেন্ট শেরে-বাংলা ফজলুল হক ও সৈয়দ নওসের আলির রাজনৈতিক সহযোদ্ধা এম. আসাদুজ্জামান এবং কবি মহসিন হোসাইন এর জন্মভূমি কলাবাড়িয়া।[১০৯]

লক্ষ্মীপুর : কলাবাড়িয়া থেকে কালিয়া যাওয়ার রাস্তার দুই পাশেই দেখতে পাওয়া যায় লক্ষ্মীপুর গ্রাম। এখানকার সরস নতুন মাটিতে ফসল উৎপাদন করে স্থানীয় নোমোসমাজ স্থানটিকে লক্ষ্মীরপুরি আখ্যায়িত করে। সেই লক্ষ্মীপুরিই পরিবর্তিত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে লক্ষ্মীপুর।

কালীনগর : কলাবাড়িয়া মৌজার পশ্চিম প্রান্তে ইংরেজ শাসনামলে খড়রিয়া মেজ জিলা সিণ্ডিকেট কোম্পানি কিছু নমঃশূদ্র বা নমোপরিবারের বসতি দিয়ে স্থানের নাম দিয়েছিল কালীনগর। উক্ত কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা দেবীকালীর ভক্ত ছিল বলে জানা যায়। যশোরের এক বিশিষ্ট আলিম কালীনগরের পরিবর্তে স্থানের নাম রেখেছিলেন আলিনগর। কিন্তু এই স্থাননামটি চালু হয় নি।

শিবপুর : প্রাচীনকালে দেবতা শিবের উপাসক কয়েকটি পরিবার এই স্থানে বসতি স্থাপন করে স্থানের নাম দিয়েছিলেন শিবেরপুরি। শিবের পুরি সংক্ষিপ্ত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে শিবপুর। প্রায় ৪ শত বছরের অধিক আগে শিবপুর গ্রামের ওপর ওয়ালি মাহমুদুর অভিযান চলেছিল। শিবপুর ছিল বিশাল জনপদ। ঐ সময় স্থানীয়রা স্থান ত্যাগ করে। কিছু লোক ধর্মান্তরিত হয়। ওয়ালি মাহমুদ শিবপুর গ্রামের পূর্বপার্শে নলিয়া নদীর পশ্চিমতীরে তার 'কেলাবাড়া' বা সামরিক ঘাটি স্থাপন করেন। শিবপুর গ্রামের বিশাল এলাকা ভিটিময় ছিল, লোক বসতি ছিলনা কয়েকশত বছর।

আইচপাড়া : নলিয়া নদীর দক্ষিণতীরে আইচ বা ভরাট কোলের ওপর প্রতিষ্ঠিত জনবসতির নাম হয়েছে আইচপাড়া।

পারোখালি : নলিয়া নদী থেকে পূর্ব দিকে একটি খাল প্রবাহিত ছিল। এখানে খেয়া পারাপার ছিল। এইভাবে স্থানের প্রথম নাম হয়েছিল পারের খাল। পারের খাল ক্রমে পারোখালিতে রূপায়িত হয়েছে।

খামার : পারোখালি গ্রামের সংলগ্ন ফসল তোলার খামার থেকে স্থানের নাম হয়েছে খামার।

কান্দুরি : নলিয়া নদীর কন্দরে গড়ে ওঠা জনবসতি কান্দর নামে পরিচিতি পায়। কান্দর শব্দের সাথে 'ই' প্রত্যয় অন্তে স্থানের নাম হয়েছে কান্দুরি।

গরিবপুর : বাঐসোনা গ্রামের সরদার গরিবউল্লাহ শাহ নামের প্রভাবশালী গাঁতিদারের একটি মহলে জনবসতি গড়ে ওঠায় স্থানীয় প্রজারা স্থানের নাম রাখেন গরিবের পুরি। গরিবের পুরি থেকে স্থানের নাম হয়েছে গরিবপুর।

ঘণশ্যামপুর : ঘণশ্যাম শ্রীকৃষ্ণের অপরনাম। দেবতা কৃষ্ণের ভক্তদের বাসস্থান বিধায় তারা স্থানের নাম রাখেন ঘণশ্যামপুরি। ঘণশ্যামপুরি থেকে স্থাননাম হয় ঘণশ্যামপুর।

দক্ষিণ বিলআফর : আফর ফার্সি শব্দ, এর অর্থ পোকা। আফরপোকা মাঠের ধানের

পাতায় লাগলে মনে হয় সারা এলাকার ধান পুড়ে গিয়েছে। এইভাবে যে মাঠের বা বিলের ধান আফরপোকায় পুড়িয়ে দেয় সেই স্থানের নাম হয় বিলআফর। বিল আফর গ্রাম এখন দুটো গ্রামে বিভক্ত যথাক্রমে উত্তর বিলাফর ও দক্ষিণ বিলাফর।

পদ্মবিলা : এক সময় বিলে পদ্মফুল ফুটে থাকায় বিলের নাম হয়েছিল পদ্মের বিল বা পদ্মবিল। এখন পদ্মবিল–এর সাথে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে পদ্মবিলা।

ঘোড়াখালি : সুলতানি শাসনামলে সেচ কিংবা পানি পথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নড়াগাতি নদী ও আঠার বাঁকির স্রোতের সাথে সম্পর্ক রেখে একটি খাল খনন করা হয়। সেই খালের গোড়ার অংশে একটি জনপদ গড়ে ওঠে এজন্য ঐ স্থানের নাম হয়েছিল গোড়াখাল। গোড়াখালের সাথে প্রত্যয় অন্তে স্থানটির নাম হয়েছিল গোড়াখালি। গোড়াখালি থেকে স্থান নাম হয়েছিল ঘোড়াখালি। উল্লিখিত কাটাখালের নামও ঘোড়াখালি। কলাবাড়িয়া তরপের বিশিষ্ট মোল্যা জমিদার পরিবার এই ঘোড়াখালি, শ্যামনগর, বিলাফর, ঘণশ্যামপুর প্রভৃতি এলাকার জমিদার ছিলেন।

ঠাকুরভিটে : ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে 'কেল্লাবাড়া' বা কেলবাড়ি'র পরবর্তী স্থাননাম হয়েছে কলাবাড়িয়া। 'কেলাবাড়ার' প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ওয়ালি মাহমুদ খান। 'কেলাবাড়ির' মূল স্থানটি এখন প্রায় জনশূন্য ঝোঁপজঙ্গলময় ভিটি। স্থানীয় লোকেরা স্থানটিকে বলে 'ঠাকুরভিটে'। 'ঠাকুর' তুর্কি শব্দ। সুলতানি শাসনামলে এই শব্দটি মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে এদেশে আসে। 'ঠাকুর' শব্দের অর্থ হলো, 'সম্মানিত ব্যক্তি', 'প্রশাসক', ইত্যাদি। 'কেলাবাড়ার' প্রতিষ্ঠাতা ও তার উত্তরাধিকারীকে স্থানীয় লোকেরা ঠাকুর সম্বোধন করতো বলে 'কেলাবাড়া' ভিটির জনপ্রিয় নাম হলো 'ঠাকুরভিটে'। স্থানীয় বয়সী লোকেরা জানান, 'ঠাকুরভিটে' ২৭ একর জমির ওপর স্থিতি লাভ করেছিল। এর চারপাশে ছিল 'গড়' বা 'গড়খাই'। সেই প্রাচীনকালে এখানে মক্তব বা পাঠশালা ও মসজিদ গড়ে ওঠে। এই ভিটের কোনো স্থানে ওয়ালি মাহমুদ খাঁ-র মাজার বর্তমান ছিল। 'ঠাকুরভিটে' এখন শুধু ধূসর স্মৃতি।

বারোকুড়ো : প্রাচীন শিবপুর গ্রামের জনশূন্য প্রান্তরে বেশ কয়েকটি প্রাচীন বিরান ভিটি দেখতে পাওয়া যায়। উলু খড়ের কাঁকরময় জমিকে লোকে বলে 'বারোকুড়ো'। স্থানটি ১২ কুড়ো জমিরসম পরিমিত বলে স্থাননাম হয়েছে বারোকুড়ো। এখানে একসময় গোরুদৌড়, ঘোড়াদৌড়, ষাঢ়ের লড়াই প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হতো।

দশানিপাড়া : মূল জমিদারির ষোল আনার ১০ আনা অংশীদারদের কাছ থেকে স্থানীয় মোল্যা পরিবার ভূমি পত্তনি নেওয়ায় স্থানের নাম হয় 'দশানিপাড়া'। পত্তনিদারের নাম মুহম্মদ জয়েনউদ্দিন মোল্যা। একচেটিয়া মোল্যা গোষ্ঠী ভুক্ত লোকদের বসতি স্থান বলে 'দশানিপাড়ার' পূর্ব নাম ছিল 'মোল্যাপড়া'। স্থানটি এখন 'মোল্যাপাড়া'ও 'দশানিপাড়া' উভয় নামেই পরিচিত। 'দশানিপাড়া' বা 'মোল্যাপড়ার' প্রাচীন মোল্যা জমিদারেরা মাঝি বা জেলে সম্প্রদায়ের লোকদের চাকরান জমাজমি দিয়ে একটি পটক বা পাড়া সৃষ্টি করেন্ সেই পাড়ার স্থানটি এখন 'দশানি মাঝিপাড়া' নামে পরিচিত। মূলদশানি পাড়া ও দশানি মাঝিপাড়ার দূরত্ব প্রায় ১ কিলোমিটার। দশানি মাঝিপাড়া এখন কলাবাড়িয়া বাজারের পূর্ব ও উত্তরদিক সংলগ্ন। দশানির ডিহি কাচারি ও পরবর্তীকালের তরফের

কাচারি আজ বাংলাদেশ সরকারের তহশিল অফিস বা ভূমি কার্যালয় হিসেবে বিদ্যমান।

ছয়ানিপাড়া : খড়রিয়া মেজজিলা সিণ্ডিকেট কোঃ লিঃ-এর ছয়আনা জমিদারির কাচারি স্থাপনকে কেন্দ্র করে স্থানের নাম হয়েছে ছয়ানিপাড়া। নবশাখ হিন্দু সম্প্রদায়ের জনৈক মদন ও তৎপুত্র গঙ্গাধর সরকার মেজজিলা সিণ্ডিকেট লিঃ থেকে ৫৬ বিঘা লাখেরাজ বা নিষ্কর জমি পেয়ে ছয়আনিতে গাঁতিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই গাঁতি সম্পত্তি 'গঙ্গাধর এষ্টেট হিসেবে পরিচিত পায়। ছয়আনি কাচারিবাড়ি প্রায় ৫০ বছর আগে বিলুপ্ত হয়েছে।

আবদার ভিটে : দশানির মোল্যা জমিদার পরিবারের বিখ্যাত বড়োমিয়া চাঁদ মাহমুদ (চান মোল্যা) বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার শুকতাইল গ্রামের গজমাহমুদ (গজ মাউন) খাঁ-র কন্যাকে বিয়ে করেন। গজ মাহমুদ খাঁর পুত্র আগর মাহমুদ খাঁ চান মোল্যাও কোরেশ মাহমুদের সহোদরা পরিজান বিবিকে বিয়ে করে মোল্যা পরিবার থেকে ৩৬০ বিঘা চাষী জমি ও ১২ বিঘা বাড়ি নির্মাণের জমি দানসত্ত্ব পেয়ে ছিলেন। আগর মাহমুদ খাঁর বংশধরেরা পরবর্তীকালে মোল্যা পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় বংশীয় পদবি খাঁ হারিয়ে মোল্যা পদবিতে ভূষিত হয়। আগর মাহমুদ খাঁর পৌত্র আবেদ মোল্যার নাম অনুসারে তাদের প্রাচীন বসত ভিটা আবাদার ভিটে স্থাননামে পরিচিতি। এই প্রাচীন ভিটেটি এখন জনশূন্য। আবেদ মোল্যার পৌত্র সাবেক ইউপি মেম্বর কারি আবু সাঈদ মোল্যা।

রায়েরভিটে : আবদার ভিটের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে একটি প্রাচীন ছাড়া ভিটে দেখতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা স্থানটিকে বলে রায়ের ভিটে কিংবা জয়নার ভিটে। প্রাচীনকালে রায় বংশীয় কোনো লোক এখানে বসত করেছিল বলে হয়তো স্থানটির নাম হয়েছে রায়ের ভিটে। প্রায় ৮০ বছর আগেও এই ভিটের পুকুরও তার পাকা বাঁধা ঘাট দেখা যেতো।

চানরোরবিল : নলিয়ার পূর্বতীরে গ্রামের উত্তরে চান্দেরদোহার বিল এখন চানরোর-বিল নামে পরিচিত। বড়ো মিয়া চাঁদ মাহমুদ বা চান মোল্যার নামে হয়েছে স্থাননাম।

মুন্সির ভিটে : দশানিপাড়া বা মোল্যাপাড়ার প্রাচীন মসজিদের পূর্বপাশের ভিটাটিতে কোনো এক সময় মুন্সি পদবিধারী লোকেরা বসবাস করতো বলে স্থানটি মুন্সিরভিটে নামে পরিচিত। স্থানীয় মোল্যা বংশের একাধিক ব্যক্তি মুন্সি পদবি পেয়েছিলেন হয়তো তাদের কারো বাসস্থান ছিল ভিটাটি। অন্যমতে, গোপালগঞ্জ জেলার রাতইলের মুন্সি বংশীয় লোকদের পূর্ব পুরুষ এখানে বসবাস করতো। মুন্সিরভিটের সংলগ্ন দুটি স্থান হলো, 'তালাব' ও 'খানেখোদা'।

চরকান্দি : নলিয়া নদীর পূর্বতীরের কান্দি বা প্রাচীন ভাঙন তীরে একটি চর জেগে ওঠে। ঐ জেগে ওঠা চরে জনবসতি গড়ে ওঠায় স্থানটির নাম হয়েছে চরকান্দি।

মোল্যারচল : কলাবাড়িয়ার দশানির মোল্যা জমিদারদের প্রাচীন জমিদারি মহলের একটি অংশ মোল্যারচক বলে পরিচিতি পায়। ফার্সি চক শব্দের অর্থ হলো জমিদারের খাসভূমি বা মহল। চক শব্দটি মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে চল-এ রূপ নিয়েছে। এইভাবে স্থাননাম হয়েছে মোল্যারচল।

বোয়ালের চর : কলাবাড়িয়া গ্রামের মাঝখান দিয়ে নলিয়া নদীর দক্ষিণে এক সময় বোয়াল মাছের খুব আমদানি ছিল। কালক্রমে সেই স্থানটিতে চারপড়ায় ও বসতি গড়ে ওঠায় স্থাননাম হয় বোয়ালমাছের চর। এর সংক্ষিপ্ত স্থাননাম হলো বোয়ালেরচর।

শ্রীনগর : নলিয়া নদীর দক্ষিণতীরে শিবপুর গ্রামের নামকরণ করেন খড়রিয়া মেজজিলা সিণ্ডিকেটস কোঃ লিঃ-এর জমিদারেরা ভূমি জরিপের সময়। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসের শ্রী সৌন্দর্য জ্ঞানের প্রকাশই শ্রীনগর স্থাননামে জড়িয়ে আছে।

বাঐসোনা ইউনিয়ন

বাঐসোনা : বাবুই পাখির স্থানীয় নাম বায়োইপাখি। এই স্থানে (নড়াগাতি নদীর পশ্চিমতীরে) প্রথম বসবাস স্থাপনকারী ঘোরোনশাহ ফকির দেখতে পান প্রচুর বায়োই পাখি একটি তালগাছের খোলার মধ্যে বাসা তৈরি করেছে। এইভাবে স্থানের প্রাথমিক নাম হয় বাঐখোলা। পরবর্তীকালে এই বাঐখোলা থেকে স্থাননাম হয়েছে বাঐসোনা।[১১০]

কানাইপুর : দেবতা কৃষ্ণের অপরনাম কানাই। কৃষ্ণের ভক্তেরা গ্রাম প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকেই কৃষ্ণ বা কানাই পূজার ব্যবস্থা করেছিল বলে স্থানের নাম হয়েছিল কানাইপুরি। কানাইপুরি থেকে স্থানের নাম হয়েছে কানাইপুরি।

নলামারা : মধুমতি নদী থেকে জন্ম নিয়ে একটি খাল দক্ষিণ পূর্বদিকে প্রবাহিত হতো। এখানে প্রচুর নলামাছ শিকার হতো। স্থানীয়ভাবে মাছ শিকারকে 'মারা' বলে। এক সময় স্থানের নাম ছিল নলামারা খাল। নলামারা খাল সংক্ষিপ্ত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে এখন নলামারা।

শরিফপুর : বাঐসোনার শরিফ বংশীয়দের একটি গঁতি মহলে বসতি স্থানের নাম দেন তারা শরিফপুর।[১১১]

মধুপুর : হিন্দুদের তীর্থস্থান রাধা ও কৃষ্ণের স্মৃতিধন্য মধুপুরকে স্মরণ করে রাধাকৃষ্ণের ভক্তরা এইস্থানের নাম রাখে মধুপুর।

রামনগর : দেবতা রামের স্মরণার্থে স্থানের নাম হয়েছে রামনগর। নগর এখানে লোকালয় অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

পহরডাঙ্গা ইউনিয়ন

পহরডাঙ্গা : মূল জনপদ থেকে যে স্থানে গমন করতে ১ প্রহর সময় লাগতো সেই স্থানকে বলা হতো প্রহরডাঙ্গা। প্রহরডাঙ্গা থেকে স্থানের নাম হয়েছে পহরডাঙ্গা।[১১২]

সরসপুর : সরস বা ফসলের পুষ্টিরসপূর্ণ মাটিতে উত্তম ফসল ফলায় এখানে মধুমতি নদীর দক্ষিণ তীরে একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা পায়। পরবর্তীকালে এই স্থানের নাম হয় সরস-পুর।

কচুডাঙ্গা : এই স্থানে এক সময় কচুর ক্ষেত ছিল। কচুর ক্ষেত থাকার দরুন স্থাননাম হয়েছে কচুডাঙ্গা। কচুডাঙ্গা থেকে স্থানের নাম হয়েছে কচুয়াডাঙ্গা।

পাখিমারা : যে বিলে এক সময় পাখি শিকার বা মারা হতো সেই স্থানটি পাখিমারা

নামে পরিচিতি পেয়েছে। নড়াইল এলাকায় মারা শব্দ দ্বারা শিকার বুঝায়।[১১৩]

বাগুডাঙ্গা : এক সময় যেখানে বাওড় ছিল পরবর্তীকালে তা ডাঙ্গায় পরিণত হলে ধীরে ধীরে সেখানে বসতি গড়ে ওঠে। তখন স্থানের নাম হয় বাওড়ডাঙ্গা। বাওড়ডাঙ্গা শব্দটি বাগুডাঙ্গায় পরিণত হয়ে স্থানের নাম হয়েছে।

মূলশ্রী : বসতি স্থানের একটি বিশেষ বাড়ি বা বসতির মূল শ্রী বা সৌন্দর্য বলে পরিচিত হওয়ায় স্থানের নাম হয় মূলশ্রী।

পশ্চিম চরগোবরা : ফারসি গেওরা শব্দ দ্বারা নওয়ারা বা নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ চলাচল বা বাইচকে বোঝায়। মধুমতি নদী থেকে আঠারবাঁকি যেখানে উৎপত্তি লাভ করে আরো দক্ষিণ প্রবাহিত হতো সেই আলাইপুরে মুঘল বাহিনীর যুদ্ধজাহাজ চলাচল করতো। যে স্থান থেকে গেওরা শুরু হতো সেই স্থানটি গোবরা নামে পরিচিতি পায়। মূল গোবরা এখন মধুমতি-আঠার বাঁকি নদীর পূর্বপারে অবস্থিত। গোবরার বর্ধিত অংশ পশ্চিমচরগোবরা নামে নড়াইল জেলার অংশ বিশেষ।

চাঁচুড়ি ইউনিয়ন

সাতঘরিয়া : সাতটি ঘর বা পরিবার যে স্থানে প্রথম বসতি স্থাপন করে সেই স্থানটি সাতঘরিয়া স্থাননামে পরিচিত। এরপর এই স্থানের পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও স্থানের নাম ঠিক সাতঘরিয়াই থেকে যায়।[১১৪]

আটঘরিয়া : এই স্থানে প্রথম আটটি ঘর বা পরিবার বসতি স্থাপন করে। সেই থেকে স্থানের নাম হয় আঘটরিয়া।[১১৫]

বনগ্রাম : বিশাল বনের মধ্যে গ্রামটি প্রতিষ্ঠা পাওয়ায় স্থানের নাম হয়েছে বনগ্রাম।

মোল্যাডাঙ্গা : মোল্যা বংশীয় লোকদের ডাঙ্গা কিংবা মোল্যা বংশীয় লোকেরা যে ডাঙ্গায় বসতি স্থাপন করে সেই ডাঙ্গাই মোল্যাডাঙ্গা বলে পরিচিতি পায়।

দক্ষিণ বাগডাঙ্গা : চিত্রানদীর বাঁকের ওপর যে বিস্তৃত ডাঙ্গা ছিল সেখানে বসতি স্থাপিত হলে স্থানের নাম হয় বাঁকডাঙ্গা। বাঁকডাঙ্গা থেকে স্থানের নাম হয়েছে শেষমেষ বাগডাঙ্গা। বাগডাঙ্গা গ্রামের দক্ষিণ অংশ একটি পৃথক গ্রামের মর্যাদা পেয়ে স্থানের নাম হয়েছে দক্ষিণবাগডাঙ্গা।

সুমেরু খোলা : সুমেরুখোলা চিত্রা-আতাখালের পূর্ব-দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। পরপারে সিলাপুর বা সোলপুর। অর্থাৎ যে স্থানে অস্ত্রাগার ও সেনানিবাস ছিল। সেনানিবাসের পরপারে বিভিন্ন সময়ে বা যুদ্ধ হওয়ায় স্থাননাম হয়েছিল সমরখোলা। সমরখোলা থেকে স্থাননাম হয়েছে সুমেরুখোলা।[১১৬]

হাড়িয়ারঘোপ : চিত্রা-কালুমালু নদীর পূর্ব উত্তর পারে বিশাল আড়াআড়ি অবস্থিত ঘোপে পলিপড়ার ফলে যে বসতি গড়ে ওঠে সেই স্থানের নাম হয় আড়িয়ার ঘোপ। কালক্রমে আড়িয়ারঘোপ হাড়িয়ারঘোপ নামে পরিচিতি পেয়েছে। হাড়িয়ার ঘোপ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কবিয়াল ও যাত্রাপালাকার রসময় সরকার।[১১৭]

কদমতলা : প্রাচীন চিত্রানদীর উত্তরপাড়ে একটি কদম গাছকে কেন্দ্র করে যে গ্রামটি গড়ে ওঠে তার নাম হয় কদমতলা। কদমতলা গ্রামে মুঘল আমলের একটি ছোট্ট মসজিদ

আজো দেখতে পাওয়া যায়।

চাঁচুড়ি : হিন্দুদের চর্চর বা ধর্মীয় অগ্নিউৎসব থেকে স্থানের নাম হয়েছে চাঁচুড়ি। এই এলাকায় প্রাচীনকালে চর্চার উৎসব প্রচলিত ছিল। চাঁচুড়িতে প্রাচীনকালে বড়ো ধরনের নৌবন্দর ছিল। এই স্থানের সাথে সরাসরি কোলকাতা বন্দরের যোগাযোগ ছিল।

তথ্যনির্দেশ

১. বাংলা স্থাননাম, ড. সুকুমার সেন, পৃ. ১৪, ১৯৫৭
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫, ২৬
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮, ১৪
৪. চুয়াডাঙ্গার স্থাননাম, রাজিব আহমেদ পৃ, ৫১, ১৯৯৭
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮, ১৪
৬. A Mussalmani Bengali English Dictionary, William Boldsack, page 26
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৮. শতাব্দীর সাক্ষী, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, পৃ. ৩, ৩৯, ১৯৮৪
৯. মুহম্মদ দারাউদ্দিন আহমদ গ্রাম, নড়াইল, থানা : নড়াইল
১০. প্রাগুক্ত
১১. শেখ মুহম্মদ সুলতান, কুরিগ্রাম, নড়াইল ১৯৮২
১২. প্রদ্যোত ভট্টাচার্য (৬০), ব-খালি, নড়াইল
১৩. শওকাত হোসেন (৪০), লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া ১৯৮৬
১৪. আশিস বিশ্বাস (৫২), বেতেঙ্গা, নড়াইল
১৫. বিমানেশ বিশ্বাস (৪৬), ধোপাখালি, নড়াইল, ১৯৮৬
১৬. শেখ মোহাম্মদ সুলতান কুরিগ্রাম, নড়াইল
১৭. মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম (৫৫), হাটবাড়িয়া, নড়াইল
১৮. বাহারীস্তান-ই-গায়বী, মির্জানাথান, পৃ. ১৯৯২
১৯. যশোরাদ্যদেশ, হোসেনউদ্দিন হোসেন, পৃ. ৩০,৩১
২০. দুর্গাদাস ঘোষ (৭০), গ্রাম : উজিরপুর, নড়াইল, ১৯৮৪
২১. যশোহর-খুলনার ইতিহাস, সতীশচন্দ্র মিত্র, পৃ. ৩৯৩-৩৯৫
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩
২৩. সুনীলকুমার চক্রবর্তী (৫০), মাইচপাড়া, নড়াইল, ১৯৮৩
২৪. প্রাগুক্ত,
২৫. প্রাগুক্ত ও মুহঃ জালালউদ্দিন বিশ্বাস মাইচপাড়া, নড়াইল, ১৯৮৫
২৬. মুহঃ জালালউদ্দিন বিশ্বাস মাইচপাড়া, নড়াইল
২৭. প্রাগুক্ত
২৮. প্রাগুক্ত

২৯. প্রাগুক্ত
৩০. সুনীলকুমার চক্রবর্তী (৫০), মাইচপাড়া, নড়াইল, ১৯৮৬
৩১. প্রাগুক্ত
৩২. আশিস বিশ্বাস বেতেঙ্গা, নড়াইল
৩৩. প্রাগুক্ত
৩৪. প্রাগুক্ত
৩৫. প্রাগুক্ত
৩৬. প্রাগুক্ত
৩৭. নূর আকবর (৬৫), ডুমুরতলা, নড়াইল, ১৯৮২
৩৮. প্রাগুক্ত
৩৯. সৈয়দ শামসুর রহমান (৬৫), চণ্ডিবরপুর, নড়াইল
৪০. প্রাগুক্ত
৪১. প্রাগুক্ত
৪২. আজিজুর রহমান (৪৮), রতডাঙ্গা, নড়াইল
৪৩. প্রাগুক্ত
৪৪. প্রাগুক্ত
৪৫. প্রাগুক্ত
৪৬. মুন্সি রুহুর আমীন (৫৭), গোয়ালবাখান, নড়াইল
৪৭. মুন্সি ফছিরউদ্দিন (৫০), গোয়ালবাখান, নড়াইল
৪৮. প্রাগুক্ত
৪৯. মুহম্মদ আলি মোল্যাহ (৫২), বাগশ্রীরামপুর, নড়াইল
৫০. মুহম্মদ ফুলকাজি (৬৫), সীমানন্দপুর
৫১. A Mussalmani Bengali-English Dictionary, Willeam Goldsack, p-61, ১৯৮৪
৫২. দেলোয়ার হোসেন মল্লিক (৭১), নাকসি, নড়াইল, ১৯৮৪
৫৩. আশিস বিশ্বাস বেতেঙ্গা, নড়াইল
৫৪. ওবায়দুর রহমান তরফদার (৫০), পেড়লি, নড়াইল
৫৫. প্রাগুক্ত
৫৬. আশিস বিশ্বাস (৫৫), বেতেঙ্গা, নড়াইল
৫৭. প্রাগুক্ত
৫৮. মুহম্মদ দারাউদ্দিন আহমদ নড়াইল, নড়াইল
৫৯. আশিস বিশ্বাস (৫৫), বেতেঙ্গা, নড়াইল
৬০. প্রাগুক্ত
৬১. প্রাগুক্ত
৬২. মুহম্মদ দারাউদ্দিন আহমদ নড়াইল, নড়াইল

৬৩. যশোরাদ্যদেশ, হোসেনউদ্দিন হোসেন, পৃ, ৮৫, ৯১
৬৪. যশোরাদ্যদেশ, হোসেনউদ্দিন হোসেন, পৃ, ৫৪
৬৫. কালিয়া উপজেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মহাসিন হোসাইন, পৃ, ২৯, ৩০
৬৬. মুহম্মদ দারাউদ্দিন আহমদ নড়াইল, নড়াইল
৬৭. প্রাগুক্ত
৬৮. প্রাগুক্ত
৬৯. প্রাগুক্ত
৭০. কবিয়াল রসময় সরকার (৭০), হাড়িয়ার ঘোপ, নড়াইল
৭১. প্রাগুক্ত
৭২. বাহারীস্থান-ই-গায়বী, মির্জানাথান, এবং যশোরাদ্য দেশ, হোসেনউদ্দিন হোসেন, পৃ. ৩০-৩১
৭৩. মসলেমউদ্দিন বয়াতি (৭৭), তারাপুর, নড়াইল
৭৪. রোস্তম মোল্যা (৭০), ভদ্রবিলা, নড়াইল
৭৫. আবদুল কাদির শেখ (৮২) ও মুহম্মদ জহুরুল হক শেখ (৬০) সর্ব সাং : মিরেপাড়া, নড়াইল, ১৯৮৫
৭৬. বেদুইন আঃ সাত্তার (৫৫), বিষ্ণুপুর ও মোজামশেখ (৭৫), সরখেলডাঙ্গা, নড়াইল
৭৭. বেদুইন আঃ সাত্তার বিষ্ণুপুর, নড়াইল ১৯৮২
৭৮. প্রাগুক্ত
৭৯. প্রাগুক্ত
৮০. প্রাগুক্ত
৮১. যশোহর-খুলনার ইতিহাস, সতীশচন্দ্র মিত্র, পৃ. ১৪৫
৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. পরিশিষ্ট-৩০
৮৩. ধূসর অতীত, আবুল কালাম সামসুদ্দিন, পৃ. ৭৫, ১৯৮৫
৮৪. আইন-ই-আকবরী, রাখালদাস, বন্দ্যোপাধ্যায়, (অনুবাদ) ১৯৭০
৮৫. হারুন জমাদ্দার, লাহুড়িয়া, লোহাগড়া, ১৯৮৬
৮৬. শেখ আবদুল সবুর (৫২), সরশুনা, লোহাগড়া
৮৭. অধ্যাপক সাঈদুর রহমান, লোহাগড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয়
৮৮. রায়-মজুমদার-সরকার বংশের ইতিবৃত্ত, অবিনাশচন্দ্র সরকার
৮৯. শওকাত হোসেন (৪৪), গ্রাম লক্ষ্মীপাশা লোহাগড়া
৯০. মহসিন আলি মির (৭০), পাঁচুড়িয়া, লোহাগড়া
৯১. জয়নাল আবেদিন, ইতনা, লোহাগড়া
৯২. সৈয়দ হাসমত আলী (৪৪), কুমড়ি, লোহাগড়া
৯৩. প্রাগুক্ত
৯৪. দুলাল চক্রবর্তী (৫৬), কোটাকোল, লোহাগড়া

৯৫. প্রাগুক্ত
৯৬. ড. খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (৫৪), মাইগ্রাম, লোহাগড়া, ১৯৮১
৯৭. আবদুল খায়ের মাষ্টার (৫৪), বারোইপাড়া, কালিয়া
৯৮. মানিকচন্দ্র বিশ্বাস, মাউলি, কালিয়া
৯৯. মুদ্রাটি বর্তমান লেখকের সংগ্রহে আছে
১০০. তারকচন্দ্র সাহা (৬২), মহাজন, কালিয়া, ১৯৮৬
১০১. শেখ তবিবর রহমান (৫২), ইসলামপুর, কালিয়া
১০২. ভক্তচন্দ্র দাস (৬০), নলডাঙ্গা, কালিয়া
১০৩. প্রাগুক্ত
১০৪. আনোয়ারুল হক শিকদার (৬৫), পুটিমারি, কালিয়া
১০৫. প্রাগুক্ত
১০৬. শেখ নজরুল ইসলাম (৪২), কালীনগর, কালিয়া
১০৭. আশানন্দ পাল (৪০), কেশবপুর, কালিয়া, ১৯৮৬
১০৮. আজিউল্লাহ মৃধা (৬২), কলাবাড়িয়া, কালিয়া
১০৯. আবদুল মান্নাফ মিয়া (৮৫), কলাবাড়িয়া, কালিয়া
১১০. বাদশাহ মোল্যা (৫৬), বাঐসোনা, কালিয়া
১১১. লকি শিকদার (৬৫), বাঐসোনা, কালিয়া, ১৯৭৮
১১২. ইসহাক আলি বিশ্বাস (৬২), পহরডাঙ্গা, কালিয়া
১১৩. মশিয়ুর রহমান নেরু (৪৩), পাখিমারা, কালিয়া
১১৪. অনীলকুমার সরকার (৬৫), চাঁচুড়ি, কালিয়া
১১৫. প্রাগুক্ত
১১৬. কবিয়াল রসময় সরকার (৭০), হাড়িয়ার ঘোপ
১১৭. প্রাগুক্ত

নড়াইল জেলার নদনদী ও খালবিল নামের উৎস ও বৈশিষ্ট্য

নড়াইল জেলার নদীসমূহ নিম্নোক্ত : ১. নবগঙ্গা ২. চিত্রা ৩. মধুমতি ৪. কালিগঙ্গা ৫. নলিয়া ৬. কাজলা ৭. আতাখাল-বা কালুমালু খাল ৮. ঘোড়াখালি (ক) ৯. ঘোড়াখালি (খ) ১০. আঠারবাঁকি ১১. নড়াগাতি নদী ও ১২. হ্যালিফ্যাক্স ক্যানেল।

নড়াইল জেলার নদীগুলোর বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবার শুধু নামকরণ উল্লেখ করা হলো।

১. **নবগঙ্গা** : গঙ্গা নদী হিন্দু পুরাণের পবিত্র নাম। গঙ্গা উপখ্যানকে গুরুত্ব ও পবিত্রতা আরোপ করে এই নদীর নাম রাখা হয় নবগঙ্গা অর্থাৎ নতুনগঙ্গা।

২. **চিত্রা** : শান্তস্নিগ্ধ টলটলে পানির চিত্রানদীর মধ্যে আকাশ, বনবনানী ও লোকালয়ের ছবি বা চিত্র দেখা যায় বলে এই নদীর নাম হয়েছে চিত্রা।

৩. **মধুমতি** : মধুমতি নদীর পানি মিষ্টত্বে মধুর সঙ্গে তুলনা করে নদী নাম রাখা হয়েছে মধুমতি। অন্য মতে, এই নদী দিয়ে সুন্দরবনের মধু সংগ্রহ করে দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে নেওয়ার জন্য নদীর নাম মধুমতি।

৪. **কালিগঙ্গা** : যে নদীকে কালে পেয়েছে অর্থাৎ যার স্রোত হারিয়ে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে তাকে বলে কালিগঙ্গা। নড়াইল জেলায় অসংখ্য কালিগঙ্গা নদীর সন্ধান পাওয়া যায়।

৫. **নলিয়া** : নলনটার মধ্যে প্রবাহিত ছিল বলে নদীর নাম হয়েছিল নলিয়া। প্রায় দেড়শত বছর আগের কাগজপত্রে নলিয়া নদীর নামটি পাওয়া যায়।

৬. **কাজলা** : কাজল কিংবা কাকচক্ষুর মতো শ্যামরঙের পানিস্রোতের জন্য নদীর নাম হয়েছে কাজলা।

৭. **আতাখাল বা কালুমালুর খাল** : আতাখাল অর্থ দানকৃত খাল। সুলতানি আমলে খালটি খনন করা হয়েছিল জনস্বার্থে তা এক প্রকার দানই। সম্ভবত কালুমালু নামের দুই সহোদর এই খাল খননে সক্রিয় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে এটাকে কালুমালুর খালও বলা হয়।

৮. **ঘোড়াখালি (১);** খোড়াখাল বা খনন করা খাল থেকে খালের নাম হয় ই প্রত্যয় যোগে খোড়াখালি। খোড়াখালি খালের নাম হয়েছে প্রাগুক্ত।

৯. **ঘোড়াখালি (২)** : পূর্বোক্ত

১০. **আঁঠারবাঁকি** : নদীটি এক সময় ১৮টি বাঁকের সমন্বিত হওয়ায় নদীর নাম হয় আঠারবাঁকি।

১১. **নড়াগাতি নদী** : নড়াগাতির মধ্যবর্তী দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার জন্য নদীর নাম হয়েছে নড়াগাতি নদী। নড়াগাতি নদী খনন করা বলে জানা যায়।

১২. **হ্যালিফ্যাক্স ক্যানেল** : ১৯১৮ সালে যশোরের ক্যালেক্টর হ্যালি ফ্যাক্স খালটি খনন করায় খালের নাম হয়েছে হ্যালিফ্যাক্স ক্যানেল।

নড়াইল জেলার নদনদী ছাড়াও আরো দুধরনের জলাশয় ও ছোট নদী বা খাল রয়েছে। এ জলাশয়গুলোকে বিল বাওড় বলা হয়। বিল-বাওড় ও খালগুলোরও বিচিত্রসব নাম রয়েছে। কোনোটা দূর ভবিষ্যতে কোনোটা অদূর ভবিষ্যতে লোকালয় হবে। এবং পরিণত হবে স্থাননামে। তাই পাঠকও গবেষকদের সুবিধার্থে নড়াইল জেলার ৩টি থানার খাল ও বিলবাঁওড়গুলোর একটি তালিকা দেয়া হলো :

লোহাগড়া থানার বিলসমূহ

১. ইছামতির বিল ২. মল্লিকপুরের দোয়া ৩. গাঘার বাঁওড় ৪. কুমড়ির বিল ৫. ফোটকের বিল ৬. মাইগ্রামের বিল ৭. আন্দারকোটার বিল ৮. পাংখারচরের বাওড় ৯. তুলার গোব ১০. উত্তরপাড়ার দোয়া ১১. রুইয়ের বিল ১২. তুষখালির দোয়া ১৩. এগারোনালির গোব ১৪. বাজারের গোলা ১৫. ডিক্রিরচরের গোলা ১৬. তালদোয়া ১৭. চালিঘাটের দোয়া ১৮. নোয়াগ্রামের বিল ১৯. ভামুরিয়ার বিল ২০. বড়োবিল ২১. বসুপটির দোয়া ২২. পদ্মবিল ২৩. শামুকখোলার বাওড় ২৪. ধামাঘষার বিল ২৫. ঘাটবিল ২৬. চাড়ালদিঘির বিল ২৭. ন্যালোর বিল ২৮. পাঁচুড়ের বিল ২৯. চাকসিবাওড় ৩০. মোমিনের গ্যাড়ে ৩১. ঘষিবাড়ির গোব ৩২. ঠাকুরবাড়ির গোব ৩৩. কুমিরের গ্যাড়ে ৩৪. নাওদাড়ার বিল ৩৫. গজালের বিল ৩৬. খয়রাপচার বিল ৩৭. গাঙ্গনালিয়ার বিল ৩৮. দোয়ারের বিল ৩৯. চাপুলিয়ার বিল ৪০. মৌলভির গ্যাড়ে ৪১. যুগির পুকুর ৪২. পাথরঘাটার বিল ৪৩. চতকের দোয়া ৪৪. হাবোখালির ডোব ৪৫. রামকান্তপুর ডোব ও ৪৬. পিল্লাদের গ্যাড়ে।

লোহাগড়া থানার খালসমূহ

১. গাঘার খাল ২. ধলইতলার খাল ৩. তেলকাড়ার খাল ৪. পুটিয়ার খাল ৫. সাতরার খাল ৬. ধোপাদহের খাল ৭. পুটিয়ার খাল (২) ৮. ভূঁইয়ের খাল ৯. কাটা খাল ১০. জেলের খাল ১১. দুধদোয়ার খাল ১২. কুচবাড়ের খাল ১৩. এড়েন্দার খাল ১৪. জেলের খাল ১৫. মিঠেপুরের.খাল ১৬. নলদির খাল ১৭. মুচিখালির খাল ১৮. জেলের খাল ১৯. তেঁতুলব্যাড়ের খাল ২০. বাজারের খাল ২১. হাজরাখালির খাল ও ২২. নীলকুঠির খাল।

নড়াইল থানার বিলসমূহ

১. দুধপাতলার বিল ২. মদ্যিডাঙ্গার বিল ৩. দক্ষিণডাঙ্গার বিল ৪. খয়রামারির বিল ৫. ডুংখোরের বিল ৬. কানাপুরের বিল ৭. চাকদার বিল ৮. কালীকীর্তনিয়ার বিল ৯. ঘড়িভাঙ্গার বিল ১০. কুমোরগাড়ে ১১. নলামারার বিল ১২. গোলামারাবিল ১৩. কুমির গাড়ে ১৪. বকচরের বিল ১৫. নলাবিল ১৬. কাড়ার বিল ১৭. বড়েন্দার বিল ১৮. কুরির ডোব ১৮. ক্যালের বিল ১৯. বাহারবিল ২০. আজোগারবিল ২১. বাউনের বিল ২২. পাথরঘাটার বিল ২৩. আন্দাইকোটর বিল ২৪. মাদিমারার বিল ২৫. বাঁশতলার বিল ২৬. আড়োদাঁড়ার বিল ২৭. বাবনখাদা বিল ২৮. হাতিগাড়ে ২৯. নুতকালার বিল ৩০. মান্দারতলার বিল ৩১. কালীদারবিল ৩২. নলডাঙ্গারবিল ৩৩. চাঁচুড়িরবিল ৩৪.

রুনজ্বালার বিল ৩৫. আজোগার বিল ৩৬. ছোটোকাড়ার বিল ৩৭. বড়োকাড়ার বিল ৩৮. বাউনের বিল ৩৯. শিবেরবিল ৪০. আগ্রাহাটিরবিল ৪১. চাঁনপুরেরবিল ৪২. পাথরঘাটার বিল ৪৩. দিঘের বিল ৪৪. ফেদির বিল ৪৫. রাহার ডোব ৪৬. পাটাকুমার বিল ৪৭. শৈলগাড়ে (ক) ৪৮. শৈলগ্যাড়ে (খ) ও ৫০. ভূমুরদের বিল।

নড়াইল থানার খালসমূহ

১. দোয়ারখাল ২. গাঠারখাল ৩. শোইলদুরা ৪. নলামারারখাল ৫. দুধপাতলার খাল ৬. ট্যাংরোখালির খাল ৭. সিংগে- নেবুগাঁতির খাল ৮. মোনার খাল ৯. দাঁড়ার খাল ১০. রোইমখালির খাল ১১. মুচিদোহা খাল ১২. চাকদা খাল ১৩. গোলামারা খাল ১৪. ট্যাংরোখালির খাল ১৫. বড়োগাঁতির কাটা খাল ১৬. সীমানার খাল ১৭. সুখের খাল ১৮. পাগলারখাল ১৯. হাড়িভাঙ্গার খাল ২০. চোরাখাল ২১. আইড়িয়ার খাল ২২. শিয়েপাগলা খাল ও ২৩. কাটাখালির খাল।

কালিয়া থানার বিলসমূহ

১. চাঁচুড়ির বিল ২. পাটেশ্বরী বিল ৩. কালীদহের বিল ৪. বড়োনালের বিল ৫. ডাকাতের বিল ৬. রাণীঘাটের বিল ৭. মোল্যার চল (চক) ৮. টোনার গোব ৯. ছোয়াড়ের বিল ১০. দাবুড়ের বিল ১১. গোল্লাবিল ১২. ধোপার গ্যাড়ে ১৩. বিলাফরের বিল ১৪. বল্লাহাটির বিল ১৫. গাজির বিল ১৬. খাশিয়ালের বিল ১৭. গজালের বিল ১৮. চান্দার বিল ১৯. কুমিরের গাড়ে ২০. চানরোর বিল ২১. কানাবিল ২২. রুনজ্বালার বিল ২৩. জোয়ারের বিল ২৪. মাদার গাড়ে ২৫. ধলেশ্বরের গাড়ে ২৬. পদ্মবিল ২৭. পদুমার বিল ২৮. পুণ্যের গাড়ে ২৯. কানাগোব ৩০. বাইরগোর ৩১. হামার বিল ৩২. পরামানিকের গাড়ে ৩৩. চিতলের বিল ৩৪. চিতলের বিল ৩৫. পিঁপড়েকান্দার বিল ৩৬. হাজিমারগোব ৩৭. মেছেরের ডোব ৩৮. পিয়ারাকান্দা ৩৯. বরোইতলার বিল ৪০. হাবুড়ের গোব ৪১. বায়োনডাঙ্গার বিল ৪২. খয়রাপচার বিল ও ৪৩. ফুলদহ।

কালিয়া থানার খালসমূহ

১. শুক্তগ্রাম খাল ২. গন্ধবাড়িয়ার খাল ৩. সুন্দরির খাল ৪. চাঁচড়ির খাল ৫. ম্যাটেরিয়ার খাল ৬. বনগ্রাম খাল ৭. বাঁশগ্রাম খাল ৮. বুড়ির খাল ৯. মির্জাপুরের খাল ১০. কদমতলা-জুশালার খাল ১১. কালেকতোয়ার খাল ১২. বেন্দার খাল ১৩. রামেশ্বর খাল ১৪. গাছবাড়িয়ার খাল ১৫. টোনার খাল ১৬. বড়োনালের খাল ১৭. নড়াগাতির খাল ১৮. লাইনের খাল ১৯. বালিচার খাল ২০. ছিটকিতলার খাল ২১. পরামানিকের খাল ২২. দাশের খাল ২৩. ভোমবাগ খাল ২৪. মাধবপাশা খাল ২৫. জটার খাল ২৬. মধুপুর খাল ২৭. টাকিমারার খাল ২৮. পেড়লির খাল ২৯. শীতলাবাড়ির খাল ৩০. খড়রিয়ার খাল ৩১. মদিনার খাল ৩২. ডহরবল্লাহাটির খাল ৩৩. নলামারার খাল ৩৪. ঘোষের খাল ৩৫. সুন্দরির খাল ৩৬. গুপির খাল ৩৭. মোল্যার খাল ৩৮. লোহারগাঁতির খাল ৩৯. খুরুল্লের খাল ৪০. কাটাখাল ৪১. পুটিমারির খাল ৪২. পানিপাড়ার খাল ৪৩. আনেসমোল্যার খাল ৪৪. পাটনার খাল ও ৪৫. গাঙ্গনালের খাল।

নড়াইলের লোকসঙ্গীত

দক্ষিণ-মধ্য বঙ্গের একটি নদীমাতৃক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হলো আধুনিক নড়াইল জেলা। নড়াইল জেলার সীমান্তে রয়েছে মাগুরা, যশোর, খুলনা, বাগেরহাট ও গোপালগঞ্জ জেলা। এছাড়া সীমান্তের অদূরে রয়েছে বৃহত্তর বরিশাল জেলা। এই এলাকার নদী মধুমতি, নবগঙ্গা, চিত্রা, আঠারবাঁকি, নলিয়ার ভাঙাগড়া ও বিভিন্ন এলাকার জনগণের ভাষা, সংস্কৃতি, সঙ্গীত, কিসসা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মিলেমিশে সংস্কৃতির এক ভিন্ন উপাদান সৃষ্টি করেছে। এই ভাবে নড়াইল এলাকার জনমনে মননশীলতা, নির্মাণশৈলী বিশেষত শিল্পশৈলী অনন্য আবেগধর্মী। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা হতে এই এলাকার মানুষ ভাবুক প্রকৃতির।

এখানকার মানুষ যেমন গান রচনায় পারদর্শী, তেমনি গায়কিতেও অনন্য। এন্টুনি ফিরিঙ্গির প্রশিষ্য কবিয়াল রাজমোহন তাঁতি ছিলেন বিখ্যাত গান রচয়িতা ও গায়ক। তিনি নড়াইলের অধিবাসী ছিলেন। এরপর নড়াইল জেলায় যারা লোকসঙ্গীত চর্চা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন, কবিয়াল তারক সরকার, কবিয়াল বিজয় সরকার, জারিয়াল সোনাউল্লাহ বয়াতি, জারিয়াল ছায়েজউদ্দিন বয়াতি, জারিয়াল মসলেমউদ্দিন বয়াতি, জারিয়াল রাহাতুল্লাহ বয়াতি, কবিয়াল রসময় সরকার, ভাবগান–রচয়িতা মুন্সি মোজাহারউদ্দিন, কবিয়াল নেপাল সরকার, ধুয়া-রচয়িতা তফুমোল্লা সরকার, পুঁথি-কেতাব রচয়িতা হাজি আবদুল করিম প্রমুখ। এ ছাড়া নড়াইল জেলায় জানা–অজানা অসংখ্য গান রচয়িতা জন্ম গ্রহণ করেন এবং আজো বিদ্যমান আছেন। নড়াইল জেলার লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডার বেশ সমৃদ্ধ–এ কথা কারো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। লোকবিজ্ঞানীরা নড়াইলকে 'চারণকবির এলাকা' বলে সম্বোধন করেন।

রচয়িতাদের নাম জানা যায় এমন গান ছাড়াও আরো অনেক গান নড়াইল এলাকায় প্রচলিত রয়েছে যার রচয়িতার সন্ধান পাওয়া যায় নি। সহজ কথায়, ঐ গানগুলো লোকগীতি বলে পরিচিতি। আমরা বর্তমান আলোচনায় নড়াইল এলাকায় প্রচলিত গীত গানগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ কিছু গান উদ্ধৃত করবো। প্রথমে ধরা যাক আধ্যাত্মিক গানকে। আধ্যাত্মিক গানকে আমরা ভাগ করেছি ভক্তিগীতি, দেহতত্ত্ব, বাউল, মুর্শিদি, মারফতি ও জাগরণগান নামে।

ভক্তিগীতি

যে গানের কথায় ও সুরে ভক্তিরসই প্রাধান্য পায় তাকে আমরা ভক্তিগীতি বলবো। ভক্তিগীতিতে ভক্ত তার রচনার মধ্য দিয়ে পরম ভক্তিভাজন স্রষ্টার প্রতি ভক্তি নিবেদন করে। এই জগৎসংসার ভক্তরচয়িতার কাছে অসার মনে হয়। তার কাছে সার হলো, পরম ভক্তিভাজন আল্লাহ। ভক্তিগীতির মধ্যে রচয়িতার গভীর নিবেদনই প্রশ্রয় পায়। এখানে কয়েকটি ভক্তিগীতি সংযোজন করা হলো :

১.

হুকুমে এসেছে বান্দা তলবে যাবে
আসিলে যাইতে হবে মরণকে ভয় কী তবে॥

যে দিন হয় ভবে আগমন, ভাইবন্ধু বান্ধবগণ
আনন্দিত হয়ে সবে আজান দিলো ভবে
ভ্রমে পড়ে কেঁদে ছিলে হায়! হায়! রবে
ক্রন্দনে আনন্দ যার কোন বিচারে বান্ধব হবে॥

কান্না শুনে হাসে যারা, কোন বিচারে বন্ধু তারা
ভেবে হই দিশেহারা দেহ দহে ক্ষোভে;
এমন সাধনা ভাই করা চাই, যাত্রা দিনে কাঁদবে সবে
তুমি হেসে হেসে দেশে যাবে॥

মরাকে মেরেছে যারা, মরার কি ভয় করে তারা
মরার আগে হয়ে মরা পথে খাড়া রবে
কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু শমন পাঠাবে
শমন পেয়ে রওনা হবে আজরাইল পথ দেখাবে॥

মহামুর্খ দীনহীন, বলে মোজাহারউদ্দিন
যে দিন হবো আয়ুহীন সে দিন হবে কবে
লোকে বলে মরা কিন্তু সেই দিন বাঁচিবে
এমন বাঁচা সে দিন হবে আর না মরিতে হবে॥

২

কতো রঙ দেখলাম আমি কলিকালে
দিনে দিনে আর কি হবে কি হয় জানি কপালে॥

বাঘের কোলে বাঘিনী, শৃগাল সেই শব্দ শুনি
কেড়ে নিলো বাঘিনীকে চড় মেরে বাঘের গালে॥

কোলাব্যাঙ কেউটে সাথে, যুদ্ধ করে জঙ্গলেতে
বেজি এসে কেন্দে পড়ে বাঘের চরণ যুগলে॥

রাজা হয় রাজ্যহারা তক্তে বসে শয়তানেরা
কোটাল হলো [illegible] মতির মালা জেলের গলে॥

বিধবা মহাজনি করে, অন্ন নাই রাজার ঘরে
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব গেলো পৈতা নিলো চণ্ডালে॥

হস্তিঘোড়া সস্তা হলো, ছাগল ভেড়ার দাম চড়িলো
পদ্মাবুকে চর পড়িলো বাণ ডাকে খালে নারে॥

মোজাহার বলে ভেবে, এরপর আর কী হবে
চন্দ্রকে ঢাকিতে যায় জুনি পোকা আগুন জ্বেলে॥

৩

কোথা আছে তারের ঘোড়া, কয়টা খাম্বা আছে গড়া
ওরে কলের ঘরে কোন চক্রে কী বোল বলে তার ভিতরে॥
মনের মানুষ বলে যারে, কী বোল বলে কী আঁকারে
ওরে কী আঁকারে বলে ফেরে ধরবো তারে কেমন করে॥

কতো দূরে তার জুড়েছে, আদিঅন্ত কোথায় আছে,
আমি জিঙ্গাসি তাই উর্দ্ধ–অধঃ তাই বাদ্য বাজে কয়টি তারে॥

মোহাজারের ভাবের বচন, তারের মানুষ না হলো সাধন
ওরে গুরু এবার দয়া করে অচীন মানুষ চিনাও মোরে॥

৪

খোদার নুরে নবী পয়দা আদম পয়দা নবীর নূরে
ও মন বেড়াচ্ছো কেন ঘুরে॥

আরশ কুরছি লোহ মাফুজ, স্বর্গমর্ত্য চাঁদ সুরুজ
চৌদ্দভুবন বারো বুরুজ–পয়দা কুন স্বরে;
আদম ছুফি খাকে পয়দা রোজ শুক্রবারে
ওরে চৌদ্দভুবন পয়দা হলো লক্ষ কোটি যুগের পরে॥

আদম হাওয়া স্বর্গে ছিল, শয়তান গন্ধম খাওয়ালো
আদম ছফি হলেন পাপি হুকুম রদ করে;
সর্প, ময়ূর, শয়তান, আদম সঙ্গে পাঁচজনারে
ফেলেন বারি দু'নের পরে দুই জনাকে ল্যাংটা করে॥

শিষ নবী স্বর্গের হুরপরী বিয়ে করে
শিষের বংশে যতো নবী পয়দা হলো এ-সংসারে,
মোজাহারের ভাবের কাওয়াল এক গানে বাইশ ছওয়াল
পেয়েছিস কী গরুর রাখাল এসে সংসারে॥

৫

আমি আশায় করে ঘর বাঁধিলাম রে, আমি থাকবো চিরকাল
আমার সে ঘর হলো কাল,
আমার আশার ঘরে এমনি করে দয়াল কে মারিল অগ্নিবাণ
আমার সে ঘর হলো কাল॥

আমি যে ডাল ধরি ভেঙে পড়ি রে
আমার কী হবে গতি, আমার নেই সঙ্গের সাথী
আমি কেন্দে আকুল হইলাম রে বইসা নদীর কূরে রে
আমায় কে বা পার করে
আমি ঘাটমাঝির নাম জানি না, দয়াল কী বোল বইলা ডাকি রে
আমায় কে বা পার করে॥

কালা জলের কালো কুমির উঠলো বালু চরে রে
হায় রে আল্লা কোনদিন যেন ধইরা খাবে
আমার কর্ম দোষে রে,
আমায় কে বা পার করে॥

ছায়া নিতে গিয়েছিলাম বটবৃক্ষের তলে
ও হায় রে বটবৃক্ষ দেয় না ছায়া আল্লা
আমার কর্ম দোষে রে
আমায় কেবা পার করে॥

৬

শুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব জেনে প্রেম করো মন মনুরায়।
হলে শুদ্ধ প্রেমের অনুরাগী প্রেমের মানুষ পাওয়া যায়॥

চণ্ডিদাস আর রজকিনী প্রেম করলো দুজনে
তারা এক মরণে দুজন মরে প্রেমের কারণে
লাইলি মজনু শিরি ফরহাদ প্রেমের পথে প্রাণ হারায়॥

প্রেম করিলো রাধাকৃষ্ণ শ্রী বৃন্দাবনেতে
রাধাকে ছাড়িয়া কৃষ্ণ যায় মথুরাতে
অভিমান ছেড়ে থাকা প্রাণ সঁপিলো কৃষ্ণের পায়॥

রামের প্রেমে মজে হনুমান, করে রাম নামের ধ্যান
চার যুগেতে অমর হনু শাস্ত্রে তাই প্রমাণ
হনুরামের পদে সঁপিয়ে প্রাণ রামকে লাভ করলো ধরায়॥

প্রেম করিলো বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির সাথে
ভরা নদী পার হইলো মরা লাশ বুকেতে
শেষে হিমাদ্রি পর্বতে গিয়ে বসলো প্রেমের সাধনায়॥

প্রেমের সাথে শুধু কাঁটাফুল করো শুদ্ধ প্রেমস্থূল
কাম অনুরাগ ভক্তি বিবেক, প্রেমের আদি মূল
ভুল করিয়া আঃ ছালাম প্রেমের পথ ফেলছে হারায়ে॥

৭

নিশি প্রভাত হলো শ্যাম এলো না
নিকুঞ্জেতে কে আমার পুরায় মনোবাসনা
আমি শ্যামচাঁদের আশায় পেয়ে
বাসর শয্যা হইলাম নিরখিয়ে
উদয় হলো ভানু এল না কালিয়ে সোনা॥

আমি বলি তোমাকে সখি
শ্যামচাঁদের দেরি দেখি
দেখি ঝরে দুটি আঁখি
প্রভাত হলো সুখশর্বরী হরি এল না॥

ডাকে শারি শুক কুহু রবে
ভ্রমর গুঞ্জে মধুর লোভে
তবু কালাচাঁদ নিকুঞ্জে এল না
শ্যাম আসবে বলে, কৃষ্ণকলি ফুলে
আমি গাঁথলেম মালা শ্যামকে দেখি না॥

ডাকে শুকশারি পোহালো শর্বরী
ছিল শ্যামের আশা হইলো নৈরাশা
তবু আমার শ্যামকে দেখি না॥

হায় করি কি উপায়
এমন সময় বংশীধারী রইলেন কোথায়
মন সাধ পুরাইতাম ধরি রাঙা পায়
আমি বাসর শয্যা করি,
কোথায় রইলো প্রাণের হরি
পোহাল সুখশর্বরী এল না হেথায়॥

গেঁথে ফুল কৃষ্ণকলি রহিলাম আশায়
গাঁথামালা রইলো তোলা দিবো কার গলায়
আমি প্যারি ভেবে মরি
কোথায় রইলেন বংশীধারী
পোহালাম সুখ শর্বরী শ্যামেরই আশায়॥

পূর্বেতে উদয় ভানু দেখি না কালায়
এমন সময় দীনবন্ধু রহিলেন কোথায়
শ্যাম কালো তমাল কালো
আমার হৃদিপদ্ম কালো
কালায় কালো সাজবে ভালো আমার এই কায়॥

৮

আমার মন চায় যারে আমি কোথা পাই তারে
কোন দেশে গেলে পাবো দরদি রে
তারে না দেখিয়া চোখে মরি মনদুখে
অসুখে অসুখে দিন কেটে গেলো রে॥

সারা জীবন ভরে যাহার খেয়ে গেলাম নুন
ফলে জলে গেয়ে যাচ্ছে যার মহাগুণ
বাদল হাওয়ায় যেন মাদল বাজায়
নব বরিষার কতো জলধি ভরে॥

বরষান্তে শরদেন্দু হাসে নীলিমায়
কী যেন কী কইয়ে যায় তার চোখের ইশারায়
হেমন্ত শিশিরে শ্যামলা ঘাসের শিরে
ভাসে আঁখি নীরে যেন কাহারি তরে॥

শীতান্তে বসন্তের মিঠালি হাওয়ায়
সাজে বসুন্ধরাদেবী নব পত্রিকায়
চৈতালি খুরুনে মিলি ধরাসনে
শান্তি দেয় পরাণে এসে মলয় সমীরে॥

গ্রীষ্মের আগমনে ধরণীর উল্লাস
আমজাম খেজুর কাঁঠাল আনারস
এ সব যার আনারস, আমি করি তার তালাস
মোসলেমের বিশ্বাস তাহার আশ্বাসে ঘোরে॥

৯

আমার প্রাণপতির লাগিয়া রে
আমি পথের ভিখারি হলাম রে,
হবে যারে দেখে প্রাণে শান্তি
তারে না হেরিলাম রে॥

জীবন-যৌবন জাতি কূলমান তারে করলেম দান
আমি যে তার সে আমার পরাণের পরাণ
আমার আঁধার ঘরের পূর্ণিমার চাঁদ
কোন বনে হারালাম রে॥

আগে যদি জানতাম আমি সে এতো চতুর
প্রেম শিখায়ে আশায় দিয়ে হবে সে নিঠুর
আমি তবে কি আসতেম এতো দূর
ভুল করে মরিলাম রে ॥

ঘটকালি করিয়া বিবেক আমায় গেলো কইয়ে
তোমার সাথে তোমার স্বামীর হইলো আজি বিয়ে
তুমি ঘর করো গে তারে নিয়ে
শুনে সুখী হলাম রে॥

হাতের কাছে নড়ে চড়ে দেখিতে না পাই
আবার যেন দেখি দেখি ছাড়ি দীর্ঘ হাই
অধীন মসলেম কয় তারে যে- দেশে পাই
সে দেশে চলিলাম রে॥

১০

লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদ রসুল
ঐ নাম হয় না যেন ভুল
ওই নাম ভুলে গেলে তুই
পড়বি ফেরে হারাবি দুই কূল
দিন থাকিতে তরিক ধরো নামাজ পড়ো
নবীর আইন করো কবুল
আখেরে সেই নিদানে মন আমার
শাফায়েত করিবেন রসুল॥

আর রাসুল রতন অমূল্যধন চিনলি না রে মন
ভজো সেই মুর্শিদের চরণ

আল্লা বলেন খাশ জবানে শোন রে অধম তুই
আখেরে আছে নবী জানতে পাবি
নবী নামে পাকনিরঞ্জন
মিছে কেন বেড়াও নেচে অবোধ মন
নিকটে এলো কাল শমন॥

আর হীরের ধারে অগ্নিখেয়া
আমার রাসুল করবেন পার
ভজো সেই দমের শামান্দার
দোনো ঈমাম দাঁড়ি হয়ে করবেন পার
মোস্তফা মাস্তুল লইয়া বাদাম দিয়া
দাঁড়িয়ে আছে তরীর ওপর
মসলেম কয় সাধন জোরে মন আমার
হয়ে যাবা ভবনদী পার॥

১১

কাজ কি এ ছার পোড়া জীবনে দরদি বিনে
তুই যা উড়ে যা মনুয়া পাখি
আমার মনপোড়া বন্ধুর সন্ধানে
অন্তরে লাগাইয়া কালি
কোন দেশে গেছে চলি বেন্ধে বন্ধনে
আমার দেল কাঁদে আর পরাণ কাঁদে
দুটি নয়ন কাঁদে তার অদর্শনে॥

কেমন মূরতি তাহার
না দেখে প্রাণ কাঁদে আমার কিসের কারণে
যেমন লাইলি বিনে মজনু পাগল
ঘুরে বেড়ায় বনে বনে॥

বিল্বমঙ্গল চিন্তামণি চণ্ডিদাস বিনে বিনোদিনী
গোকুলে আকুল পরাণে
কতো ভাব রয়েছে ভবে
যার মনে যা সে তা ভাবে পাওয়ার কারণে
মোসলেম ভাবে অজানা বন্ধুর মিলন প্রেমরস আস্বাদনে॥

১২

আগে পারের কড়ি সঙ্গে নাও
চ্যাতন ধরে চ্যাতন হও

চ্যাতনকে সঙ্গে নিয়ে যাও গে রে পারঘাটা
যদি তুই পার হবি পঞ্চাশের কোঠা॥

গুরুর তফিল ঠিক রাখিয়ে ধরগে গিয়ে মেয়ের পায়
অধঃউর্দ্ধ দুটি পদ্ম শুকলো পক্ষে যুগল হয়
আমাবশ্যা পূর্ণিমায় ওই পদ্ম এক যোগে রয়
সে দিন নামলি জলে পড়বি ফ্যারে–
শিক্ষা করো সেই নামাউঠা॥

অনুরাগে উর্দ্ধযোগে লালবাদাম টানো কষে
দিয়ে দশজন দাঁড়ি ছয়জন গুণি হাইল মাচায় থাকো বসে
চলবে তরী ধীরে ধীরে অনুরাগ বাতাসের জোরে
উনপঞ্চাশ বাধ্য হলে আর তোমারে ঠেকায় কেটা॥

সুখ প্যায়ে ঘুমায়ে রলে নিশাতে হলো রে ভোর
ফাইট প্যায়ে সিঁদ দিলো মদনচোর
সে চোরের বুদ্ধি ভারি জাগ্না ঘরে করে চুরি
তাই মাছিম কয় সেই চোর পাকড়াতে
হাইকোটে এক আরজি পাঠা॥

১৩

চুরো আশির ধাক্কায় যেন পড়িস না রে ভাই
ধাক্কায় য্যাড়ে ভক্কা দিলে পাঁক দিবে তার এড়ান নাই॥

নদীর বাঁকে পাঁকে পাঁকে
ম্যাগনেট ঘুরছে অবিরত
হুমা ডাকে জোয়ার আসে
শুকনাতে হয় অসার
কতো হাঙ্গর কুমির সাঁতার খ্যালে
নামলি জলে নাই রিহাই॥

গুরু মন্ত্র কর্ণে রেখে ভাবসায়রে পাড়ি ধর
দশ ইন্দ্রিয় ষড়রিপু তার মধ্যে মদনকে রাখো চিকার
অষ্টস্বার্থ ঠিক রাখিয়ে গুরুর কর্ম করা চাই॥

মাছিম বলে শোন রে মোকসেদ অনুরাগের মারো বৈঠে
ভাঙ্গিস না আর গুরুর তফিল মনের দুয়ার বান এঁটে
যাইস না আর উল্টোডাঙ্গা তারের ডুঙ্গা
এর ভিতরে জমা নাই॥

১৪

আগে ধম্বন্তরি শিক্ষা নাও
নামের মালা গলে দাও
প্রেম না জানিয়ে সাপ ধরিতে যে জন যায়
ধরে সাপের মাজা চিপে অজাগাতে হাত দেয়
অজাগাতে হাত দিলে ওঠে সাপ ফণা ধরে
মাথাডা নিচু করে কামড় দিলে এ্যাকেবারে দফা সারা॥

নামে প্রেমে মত্ত হয়ে সাপ ধরিতে যে জন যায়
কামিনী কাল নাগিনীঁ ওমনি সে ধরা দেয়
তার কাছে নাই কামের গন্ধ নাম দিয়ে সব করে বন্ধ
ধুলো পড়া মাথায় দিলে থাকে জ্যান্ত মরা॥

মাছিম বলে সাপাসাপি এক জাগাতে দুজন রয়
সাপ যদি দংশন করতো স্যাপায় ঝ্যাড়ে বিষ নামায়
দুজনা রয় এক সঙ্গে ভেসে যায় প্রেম তরঙ্গে
করে একটি দরে বেচাকেনা আত্মসুখী হয়ে মরা॥

১৫

পিরীত করো মনের কপাট এ্যাটে (হ্যায়)
তুমি আগে ছাড়ো কুরীতি শেষ করো পিরীতি
সুরীতির পিরীত কখনো যায় না রে ছুটে॥

যার সাথে যার ভালোবাসা সে করে না অন্যের আশা
তাহার ছবি আঁকিয়াছে হৃদয় চিত্তপটে (হায়)–
যেমন মেঘের জল চাতকের আশা, জলে মিটায় পিপাসা
প্রাণ দিলেও মুখ দেবে না সে অন্য জলে মোটে॥

দাস্য প্রেমে বনের পশুরা, বাৎসল্য প্রেমে ব্রজের গোপীরা
সখ্য প্রেমে রাধা কৃষ্ণ শ্রীদাম সুধাম বটে (হায়)–
তারা করছে অখণ্ড পিরীত, রাধাকৃষ্ণে সুরীতি পিরীতি
যুগল মিলন দেখবি যদি আয় ছুটে॥

দীন মাছিমের মন কেঁদে ওঠে, কাঁচা প্রেমে সাধ না মেটে
দুধ মন্থনে মাখন ওঠে ধান ঝাড়লে হয় চিটে (হায়)
শেষে চিটা কুমারের বাড়ি পুই শালে দিয়ে পুড়ায় হাড়ি
তেমনি মতো কাঁচা প্রেমিক মরে বাণের চোটে॥

১৬

হায় গো আল্লাহ্ বারিতালা দ্বীন দয়াময়
এখন আর না দেখি উপায়
ঈমামের কষ্ট দেখে বুক ফেটে যায়
এজিদের সাথে রণ করছিল
এমাম হোসেন দোস্ত কারবালায়
তাই তে ঈমান হলো পরাজিত
ধড় কেটে কাফের লয়ে যায়
তাতে শিশু ছেলে জয়নাবসহ কারাগারে বন্দি রয়॥

আর এজিদ হারামজাদা কমজাত কমিন
কাচারি মিলায়েছে সে দিন
ঈমামের বিটির তরে কহে কমিন
তুমি শোন হে ঈমামজাদী
খোরমা কিছু খাও তবে এনে দি
বিবি বলে আনদি এতিম বলে দয়া হয় যদি
আমি সাত রোজ ধরে খাই না খানা
ঈমামের কাটা মুণ্ড ছিল ঘরে
তাই বিবির সামনে ধরে
বাপের ছের দেখে বিবি হায় হায় করে॥

তুমি শুন শুন বাবাজান, অভাগিনী তোমার সন্তান
ডাকি তোমারে, তুমি উঠে জবাব দাও মোরে
কোলে তুলে নাও মোরে
রাহাতুল্লা বলে, কোন দোষেতে এজিদ গোঁয়ার
খুন করলো তোমারে॥

১৭

ঘর ছেড়ে মনুরায় পাখি পালাবে যখন
সোনার দেহ কেন্দে বলছে রে তখন
পাখি আমায় ছেড়ে ঘোর জঙ্গলে
কোথায় করছে গমন
আমার সময় ছিল ছিলাম ভালো
করতে আলাপন
এখন নাই যে সময় অসময় পাখি রে
ভুলে কোথায় গমন॥

আমি জানলাম ওরে নিঠুর পাখি দয়া মায়া নাই
হাতে হাতে তাহার প্রমাণ পাই
কতো যতন করে ক্ষির ননী তোমাকে খাওয়াই
তুই নুন খাওয়া গুণ গালি না রে
তোর মতন নিঠুর হারাম নাই
ভবে কে এমন আছে রসিক সুজন
আমি কার ছায়ায় দাঁড়াই
ভবের আশা সুমার পশার পাখি কেবল দীনবন্ধু সার॥

বলদি পাখি তোর সনে কী আর দেখা হবে।
মধুর আলাপন আর কি করিবে
এমন সুখের শয্যা বাসর মিলন
আর কি মিলিবে–
আমি রাহাতুল্লাহ বোকা হতভাগা
ঘুরতেছি জ্ঞানের অভাবে
পাখি তুমি বা কি আমি বা কি না দেখলাম ভেবে
কয় চিজে হয় পাখির জনম শুনলে প্রাণটা জুড়াবে॥

১৮

এমন বান্ধব কে আছে ধরায়
যার শরীরের হাওয়া লেগে
হাবিয়া দোযখ নিবে যায়॥

পাইলেন খিলাত মোহর নবুয়াত
ছিল মারা রয় মোহরায়
উম্মততারণ পতিতপাবণ
তাহাতে নাম লেখা রয়
তাহার মতো দোজাহানে
দরদি আর কেহ নয়॥

পারের ভেলা রাসুলুল্লাহ
লা মোকামে যখন যায়,
নূর তাজেল্লা মওলা
নির্জনে নিজ কালাম কয়–
এস্কের তরে ইয়াদ করে
দ্বীনের নবী হাফেজ হয়॥

দেল গমাভরি শরা জারি

গুপ্ত ভেদ ছায়ে ছিনায়
তরিকতি জাহেরি ভেদ
একিন মনে জানতে হয়
ওরে তাই মধু বলে অদুল করলে
জাহান্নামি হতে হয়॥

১৯

ভজনা করবো বলো কোন প্রকারে,
সাধনার পুঁজিপাটা হরে নিলো ছেচড়া চোরে॥

ছয়জনা মোর প্রতিবেশী
দাগাবাজ সব অবিশ্বাসী
কেউ গাঁজাখোর শিংগেল চোর
ফাঁক পেলে শিং দেয় মোর ঘরে॥

মৃত্যুরূপে কাল ভুজঙ্গ
ধরেছে সে আমার অঙ্গ
কি জানি কি দেখায় রঙ্গ
কোন সময় সে প্রাণে মারে॥

রোগশোক সঙ্গের সাথী
তারা করে মোর দুর্গতি
আমি কী দিয়া করি আরতি
মধু কয় তাই বলো মোরে॥

২০

পরের প্রেমে পরাণ দিয়ে
মজবো না রে প্রাণ সখি
যে জন পরের প্রেমে পরাণ দেছে
তাব পরের জন্য ঝরে আঁখি॥

পরের জন্য যে প্রেম করে
পরমায়ু থাকতে মরে শুনলো সখি
যে জন প্রেম করে বিরহে মরে
তার প্রেমে আর সুখ আছে কি॥

প্রেম করতে হয় রসিক চিনে
যে জন প্রেমের মর্ম জানে ধর্মজ্ঞান দেখি

তবু সই করতে হয় ভুলে ভুলে
এক মন হয় না কি॥

গোপাল কয়, রসিক পুরুষ
রমণ সময় রাখে না হুঁশ করে শুধু ফাঁকি জুকি
রূপের ঘরে গেলে পরে মরে বই আর বাঁচে না কি॥

২১

আমার মন পাগল হলো রে খুঁজে পাই না তারে
খুঁজে যদি পাতাম তারে রাখতাম হৃদয় মাঝারে॥

একে তো আমার মন উতলা
বাঁশি বাজায় নন্দের কালা
বসে কদমতলা দুপুর বেলা
বাঁশির সুরে মন উতলা করে
আমায় ঘরে রইতে দিলো না রে॥

কালায় যখন বাজায় বাঁশি
আমি তখন রাঁধতে বসি
রান্না থুয়ে বাইরে আসি
বাউলায়িনী বেশে
আমি যাই ছুটে কালার তরে॥

একদিনে যমুনায় দেখা
শ্যামরূপ আমার অঙ্গে লিখা
থেকে থেকে দেয় সে দেখা
নরেন বলে, যমুনার ঘাটে
আমার হৃদয়ে ঝলকা মারে॥

২২

নবীজি আসলেন ভবে করিতে উম্মত-উদ্ধার
ফুল রূপে এই জগতে হইলেন প্রচার
ও ফুল বেহেস্তে ছিল একিনের পর ভর করিলো॥

শুনতে মজা চমৎকার
ফুলের গাছে চারডালে আছে ডাল শূন্যের উপর
ফুলের মূলে বসা আছে গো আমার দ্বীনের নবী পয়গম্বর,

নবী নাম জগত মাতাবে কোরানে প্রমাণ শুনি
নিরানব্বই নামটি ধরলেন মালেক রববানি
এ ছাড়া কতো নাম আছে শুনতে চাই মুর্শিদের কাছে
আমি অন্ধ নূর মুহম্মদ সরকার না জানি॥
বাতুনে ছিলেন নবী বলো কোন আকারেতে
কোন আকারে বসলেন নবী কিসের মধ্যেতে
আমি পাই না তাহার অন্তলীলা শুনবো সাধুর মুখেতে
পাতালে বসত করে যারা কোন নাম জপেছে মুখেতে
অন্ধ নূর মুহম্মদ বলে দয়াময় কোন নামে তরাইবে আকবাতে॥

২৩

জাত নূরে গড়লেন যারে খুশি হইয়া
সেই নবীর নূর ঝরিলো সৃষ্টি হইলো এই দুনিয়া॥

আমার আপে নিরঞ্জন গড়িয়া আদম
নিষেধ করিলো তারে খাইতে গন্দম
নিষেধ সে না শুনিয়া গন্দম খাইলো
দুনিয়ায় আইলো দুষি হইয়া॥

মওলার কুদরতে আদম পড়লো জিদ্দাতে
উদয় হইলো যাইয়া আরফাতে
দেখে তোয়েব কলেমায় আকাশের গায়
সিজদায় আদম যায় মিশিয়া॥

আদম করে মুনাজাত, আমার আপে পাকজাত
নবীর খাতিরে তারে দিলো নাজাত
হাবিব কি পাবে আছান হে দোজাহান
হাশর মিজান তোর নাম কইয়া॥

দেহতত্ত্ব

মুসলমানদের বিশ্বাস, মোমিন বা বিশ্বাসীর হৃদয়াসনে খোদার অবস্থান। আল্লাহ মানুষের শাহরগের চেয়েও কাছে। ইসলামি দর্শন মতে, 'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু' অর্থাৎ যে তার আত্মাকে জানলো সে তার রব বা মালিককে জানলো। উপনিষদে আছে, 'আত্মাং বিদ্ধি' অর্থাৎ 'নিজেকে জানো'। যাকে জানতে হবে তার ঠিকানা জানতে হবে। দেহতত্ত্বগানে দেহবিচার বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে–যাতে সেই বিচারবিজ্ঞানের মাধ্যমে পরমসত্তাকে স্পর্শ করা যায়। দেহ বিচারের বিভিন্ন বিশ্লেষণ হলো দেহতত্ত্ব গানে। এবার কয়েকটি দেহতত্ত্ব গান উদ্ধৃত করা হলো :

১

ভবে এসে রইলে বসে মনমাঝি
পরের কথায় হও রাজি
বসে বসে সব খোয়ালি রে
এখন হলো না মহাজনের পুঁজি॥
কাজ না করে নাম দাও করিম কাজি
যাবার বেলা ভবের খেলা
কে হবে ভবতরীর মাঝি॥

তরীর গোলোই আটন দ্বারা পতন
চৌদ্দ পোয়া সার
আমি ভাবছি বসে অনেক বার
কোন সন্ধানে কাষ্ঠ এনে রে সুতার
ও সুতার তরী কইরাছে তৈয়ার
মাঝ খানে আগুনের কুণ্ড যাহার
বলছে আবদুল মেস্তরির কী গুণ
হাল ধরে সে বইসাছে কর্ণধার॥

তরীর মধ্যে এক বৈতাল মেয়ে বসে আছে
কোলে দুইটি শিশু আছে
উর্দ্ধনয়ন পঞ্চ বদন রে
শিশুর হাতে চার ফুল আছে
মদন মোহন নেই ফুলের উপর বসে
বলছে আবদুল পাবা সে ফুল
মন রে মন চল গুরুর কাছে॥

২

একবার শুনে লাগে ভয়
আমার মনে সন্দো হয়॥

শুনি এই দেহের মাঝখানে
এক নারী আছে গোপনে
শত মুখে বলছে কথা শুনিলাম কানে
তার দক্ষিণে এক রমণী দুই লাখ মুখ কথা কয়॥

সেই রমণীর কোলে এক ছেলে
স্বামীতে ডাকছে মা বোলে

শ্বশুর এসে গলা ধরে রয়েছে ঝুলে
জামাই এসে হেসে হেসে হাত বুলায় শাশুড়ির গায়
কয়জনার মিলন হইলো গর্ভে এক ছেলে জন্মিলো
এই ছেলে কারে বাবা বলবে অধীন কাসিম ভেবে কয়॥

৩

শোন রে মন রে গুরু নাম স্মরণ করে
সিন্দু নদীতে ভাসাও তরী
একেতে তোর জীর্ণ তরী কূলে যেতে বোঝাই ভারি॥
বাধ্য রাখো ছয় জনা দাঁড়ি
তরী যাবে উজান বাঁকে
পড়বে না আর গোলার পাঁকে
গুরুজি কে রাইখো কাণ্ডারি॥
গুরু আমার আদ্যাশক্তি
শনিআদি কী করবে তাহার;
জীবনকে মুক্তি দেয়
কর্ম দোষে শাস্তি দেয়
যাহাদের কুকর্ম ভারি॥

হাবিব কয়, বিনয় করে
গোলাম কবির কই তোমারে
বোকা হয়ে চালাও কেন তরী
দশে ছয়ে ঐক্য হয়ে গুরু নামে নিশান দিয়ে
ভবসাগরে চালায়ো এই তরী॥

৪

ওরে আমার মন চেনা আপনা আপন
তার দেখা পাবি এই ঘরে॥

যদি চিনতে চাও তারে
খোঁজো আলফাজের ঘরে
মোকাম মাহমুদায় বিরাজ করে
একে জাত মুর্শিদের ছবি
যাহার করো পায়রাবি
দেখা পাবি খোদ কাবার ঘরে॥

কুলবেল মোমিন আরশে আল্লা কোরানে প্রমাণ

মানব দেহে আছেন তিনি জানো তারি সন্ধান
মোরাকাবায় বসিবে মোশাহেদায় দেখিবে
নজর দিলে দেখা পাবি তারে॥

নফি এজবাতে এসমে জাত শব্দ আল্লাহ
ফানাফিল্লাহ যাবে আল্লা রবে মাত্র হু
করলে নফি আল এজবাত তার পাবি হাকিকাত
হাবিব বোঝায় কবিরে রে॥

৫

মারফত নিগূমের দেশে কে যাবি আয়
গেলে নিগূম দেশে দেখা পাবি মানুষের
মন মানুষে মানুষ মিশে রয়॥

সে দেশে নাই জন্ম মরণ
আপনি মুর্শিদ দিলে দরশন
তথায় পাঞ্জেগানের নাই কো প্রয়োজন
যার দেখা সে যদি দেয়॥

নফি আল এজবতের ঘরে
সাধন করো মনরূপ সাকারে
তাকে মুশাহেদায় হাজির করে
জ্ঞান নয়ন প্রাণ জুড়ায়॥

হিসেব করো নিজের জাহের বাতন
মুর্শিদ পাল্লায় যাইয়া হও গে ওজন
মুর্শিদ চেনা হলো দায়॥

৬

বৎসরের ছত্রিশ দিনে প্রভু এসে দখল করে
দ্যাখ যমুনার পাড়ে, মানুষ নামলে কী আর মরে॥

আমার বিশ্ববিধি গড়েছে এক ঘর
উপর নীচে দুই দরোজা ঘরের মধ্যে কতোসজ্জা চমৎকার
দেখি দুটি খুঁটির কিবা চমৎকার বেঁধেছে ঘর কর্মকার
ঘরের ভেতরের স্তরে স্তরে রয়েছে কতো মহলদার
তিনশত সাইট জোড়া তার মাল কুঠার চারিধার
তিন শত ছত্রিশ জন বিরাজ করে নিরন্তর॥

ও দেখি মালকোটার পাশে মনের হরষে প্রহরি দেয় পাহারা

থাকিতে পাহারা মাল নেয় চোরা শুনে হলাম ভয়ংকর
মজিদ শুনে কান্দে বারিধারে কি হবে সে শেষের দিনে
ভাবি বসে রাত্র দিনে পরোয়ার॥

৭

ও বেঁধে এক কলের ঘর
আগুন পানি হাওয়া মাটি চার
কি যে তৈয়ারি ঘর দুই খুঁটি পাড়ের উপর
ঘরে ও তার বাউনি আড়া
সামনে দিয়ে বেড়া
দুই ধারে জানলা কাটা তার॥

ও ঘর শূন্যের পরে হেলে দুলে
কতো ঝড় ঝটকা ভূমিকম্প
সেই ঘরের উপর চলে
দুই বাতি রাত্রি দিন জ্বলে।
মন মহান্ত হয়ে ক্ষান্ত দীননাথ পেয়ে অর্ঘ
সেই ঘরের নিনা দিনা করে॥

ঘর নতুন ছিল ছিল ভালো
পুরাতন হলো রাগ পড়িলো
যুৎ ছিল বেযুৎ হলো
ঘরের বাতা ঘুনি ধরায় খালো॥

ও তাই বাহাদুর কয় ঘরের বেড়া
সদয় করে নড়াচড়া
ঘরের বেড়া উইপোকায় খালো॥

৮

ভয় ভয় অভয় দে মা তারা
হেরিয়ে ভব তরঙ্গ আতংকে হই আত্মহারা॥

ঠেকে ভবপারের দায় ভেবে হলাম নিরুপায়
ভয় পেয়ে ডাকি তোমারে ও মা ভবতারা
অভয়দায়িনী জাগো ভব ভয়হারা
তাই জেনে ভব সাগরে ধরলাম পাড়ি
দেখিস মা রাখিস যেন যাই না মারা॥

পার হতে ভববারি বিবেকের উদবেগ ভারি
অভাগা ছয়জন দাঁড়ি দাঁড় ধরেছে তারা
মনমাঝি হয়েছে রাজি ভবের পাড়ি ধারা
ব্রহ্মময়ী মা তোমার সহায় করে বাসনা
ভাব সাগরে পাড়ি ধরা॥

নৌকাতে নাবিক যতো, অনুনয় করে কতো
সেধে করলাম সম্মত উজান বাড়ি মারা
মাল্লা মাঝি সবি তৈরি কাজ কী দেরি করা
দিয়ে ব্রহ্মময়ী নামের বাদাম অবিশ্রাম
পেতেছি পেতে কিনারা॥

গোপাল কয়, মা আমারে রেখ না মূলাধারে
যম্বুদ্বীপ দাও পার করে ওমা ব্রহ্মময়ী তারা
যাবো পরম ব্রহ্মপুরে জুপাপাটা সারা
এবার কালী নামের জোরে
জয় ডাংকায় মেরে টিকারা॥

৯

কী করে পার হবি তুই ত্রিবিনায়
কপট সাধু যারা যাচ্ছে মারা
ত্রিবিনায় ত্রিমোহনায়॥

ত্রিবিনা হয় তিন গুণে ত্রিশক্তি রয় সেখানে
জীবের মুক্তির কারণে যোগের দিনে হয় উদয়
আছে শক্তি পদে ভক্তি যাহার
মা তারে পারে লয়ে যায়॥

যোগসিদ্ধ যোগী যারা সেই ঘাটে যেয়ে তারা
হারায়ে নদীর ত্রিধারা আতংকে আত্মহারা
কেউ সাধন বলে যাচ্ছে পারে
কেউ হাবুডুবু খায়॥

আমাবস্যা আর পূর্ণিমায় বাণ ডেকে বেগ বেশি হয়
ভীষণ তরঙ্গমালায় নদীর জল ওঠে কিনারায়;

সেথায় কাম কুম্ভিরের চোট অতিশয়
নামিলে কামকুম্ভিরে খায়॥
ত্রিবিনার তিনটি গোড়া তাহে বহে ত্রিধারা
উপরটা আছে ঘেরা পশমি করা চাঁদোয়ায়;
গোপাল কয়, তার কেশীঘাটে
নিশিথে নরবলি হয়॥

১০

বলবো কী ফুলের বিষয় ফুল বড়ো আশ্চর্য কথা
সে ফুলের মূল বলো রলো কোথা,
সে ফুল চেনে যারা মানে তারা জানে ফুলের কথা
রূপে বামনং করে গমনং ভুবনং চৌদ্দ পোয়ায় মূলপাতা
সাধু বিনে পাবি তা কোথা
যোগী যারা যোগে তারা পেয়েছে ফুলের বীজকথা॥

মাসে মালি এসে দৃষ্টি করে ফুল
কতো রসিক রসে ডোবে দেখতে যেয়ে সে ফুল
কেউ ভাব না জেনে মনে মনে কয় চিনি ফুল
তারা না জানে ফুলের আদি মূল
মদন এসে ফুলের বসে বাণ কষে মারতেছে হুল
সাধক জনে মনে মনে জানে যায় না সরবরের কূল
তারা জেনে নিয়ে ফুলের আদি মূল॥

ফুলের নাম রক্ত জবা চব্বিশ জবায় শুভা করে
দেখি ফুল তিন ঘরে আমোদ করে,
আছে বারো বুরুয চন্দ্র সূর্য বুরুযে বিরাজ করে
লাগে আমাবস্যায় মাসে মাসে পূর্ণিমার জ্যোতিতে দীপ্ত করে
প্রেমের হাওয়া বহে মন্দাসুখে
প্রেম নদীর ঢেউ লাগলে পরে সে ফুল যায় সরোবরে॥

১১

ওহে নিরঞ্জন আমি ঐ নাম করি স্মরণ
যোগসাধনে হইলাম উদয়,
তোমরা দোয়া করবেন অধমেরে যতো মুরব্বি সবাই
করবেন দোয়া দিবেন পদছায়া
যাতে ভবসিন্দু তরে যাওয়া যায়॥

আমি শিষ্য হইলাম এই সভায়

তোমায় জিজ্ঞাস করি গুরু মশায়
কে হাশমে রব্বেল জেকের করে
সেতারায় কোন শব্দ হয়
শূন্য ভরে থাকে কে অনাহারে
কখনো কখনো গুপ্তভাবে রয়॥

মক্কার ঘর সৃজায় পরোয়ার
ইসমাইল সে হিল্লায় রয়
পাঁচ পাহাড়ের পাঁচ পাথর
কে এনেছিল মক্কায়
সেই পাথরে কী নাম ধরে ডাক দিছিল
ফজর বিশ্বাস কয়ে যায়॥

১২

দেখে এলাম এক রমণী ত্রিবেণীর ঘাটে
ও তার জটাধারী মুখে দাড়ি সিঁদুর শোভা ললাটে॥

অষ্টাদশ চক্ষু তাহার হয়
দ্বাদশ হস্ত বুঝি সেই রমণীর রয়
ও সে আপন রূপের বাতি জ্বেলে ভ্রমণ করে সব ঘটে॥

অর্ধ অঙ্গ প্রেম সরোবর
অর্ধ অঙ্গ থাকে যে তার দশম দলপুরে
কি অপরূপ যায় গো দেখা শূন্য ভরে যায় হেঁটে॥

ভাবিয়ে মুকুন্দ বলে
অরুণ রবির তরুণভাতি রয় পদতলে
আমার জীবন অন্ত'কালে স্থান দিয়ো ঐ পদে॥

১৩

আজগুবি এক প্রেমের মরা জলে ভেসে যায়
ঐ মরাকে ধরবার আশে কতো প্রেম শকুন উড়ে বেড়ায়॥

ঐ যে মরা সতী ছিল, দৈবাতে তার মৃত্যু হলো
মৃত্যুর পরে গর্ভ হলো গর্ভে জন্ম নিলো তিন জনায়॥

যখন মরার গন্ধ ছোটে, যমুনার জল উথলে ওঠে
মরার গন্ধে প্রেমানন্দে ত্রিবেণীর জল উজান ধায় ॥

ভাবিয়ে মুকুন্দ বলে অরুণ রবির তরুণ ভাতি রয় পদতলে
আমার জীবন অন্তঃকালে স্থান দিয়ো যুগল পায়॥

১৪

নবীজি এলেন ভবে করিতে উম্মতের উদ্ধার
ফুল রূপেতে এই জগতে হলেন প্রচার॥

এ ফুল স্বর্গে ছিল মর্তে এলো
একিনের পরে ভর করিলো
দেখতে কিবা চমৎকার
এ ফুল ধরতে গেলে যায় না ধরা
ডাল ছাড়া ফুল শূন্য ভর
সে ফুলের মূলে বসা আছে গো
আমার দ্বীনের রাসুল পয়গম্বর॥

বাতেনে ছিল নবী বলো কোন আখেরাতে
কি আঁকারে রাখলেন খোদা কিসের মধ্যেতে
আমি পাই না তাহার অন্তঃলীলা
কে বোঝে তাহার খেলা
শুনবো সাধুর দ্বারেতে
শুনি পাতালের বাসুকী যারা
কোন নাম জপে মুখেতে
অধীন মওলান খাঁ কয় ওগো দয়াময়
কোন নামে তরাইবেন আখেরাতে॥

১৫

দেখিয়ে যা ভাই সগলেরা আজব এক তরী
গোছা লাগাইছে দুসারি
তরীর আড়ে দিঘি সাড়ে তিন হাত
গড়ছে তরী দীননাথ
সুতার মিস্ত্রি আমি চার যুগে ভ্রমণ করি
পালাম না সেই সে তরী
তার আগা নৌকায় বসা আছে মন মনুরায় ব্যাপারি॥

শুকনোর পরে হাওয়া ভরে
চালায় তবী চড়নদার আলেক সোয়ারি
ওরে দল সমেত উঠলো ব্যায়ে পাইল বেহারি

উয়ার মাঝি বিটা বড়ো ঠ্যাটা
হাইল ধরে বাধায় নেটা
উপায় কি করি, আমি তফু মোল্লা হাল ধরি॥

একা উজোন বেয়ে মরি
উয়ার আগা নৌকায় সোনাউল্লাহ বসে বাজায় খুনজরি
যে দিন আমাবস্যা ত্রিতো যোগ
তরী হইলো ডুবাডোব উয়ার মাঝির নাই রে বল
নড়ে গেছে হালির কল
কোন দিন যেন সাধের তরী শুকনায় হবে রসাতল॥

১৬

আমি আসরে পাল্লার ভারে গুরু ভগবান
অপর পক্ষে সেবক আমার সদা ভক্তি দেয় যোগান
একটি কথা জিজ্ঞাস করি সেবক শব্দের অর্থ কও সত্য করি
বুঝবো গুরুভক্তির বাহাদুরি॥

সে-কারেতে আর ব-কারেতে কিবা অর্থ হয়
ব-কারেতে কোন দেবতা কি করে সদায়
গুরুশিষ্য দেহের মাঝে কে কোথায় করে যাপন
উর্দ্ধ শক্তি অধঃশক্তি যে, মধ্যশক্তি শিষ্যের ভক্তি
বলো কোন জাগায় থাকে–
কোন শক্তিতে কোন ঋতু হয় করো তা সত্য প্রমাণ॥

গুরু শব্দের অন্তর্গত
গু-শব্দে কোন দেবতা ধ্যানে হয় রত
রেফ শব্দে কে অবিরত উ-শব্দে বসতি কার
অজিত বরে, করবো পরীক্ষা
সকল দিয়াছি তোমারে শিক্ষা
আমি শুনবো মণি ইহার ব্যাখ্যা ভণ্ডামি সেবকের ভান॥

১৭

দেখে যা রে ভাই সগলরা কলের জাহাজ
গড়েছে আপনি দয়াময়
কলে হ্যালে কলে চলে শুকনো বায়
উয়ার মন পবনের হিল্লোলে
মন গুণ টানে চলে তারা তিনজনা
জাহাজ বরিশাল হতে ঢাকা যায়

ঘোরে না জাহাজ ডানি বাঁয়
উয়ার চার মোকামে চার ফকিরি
জেকের করে নিরালায়॥

উয়ার জাহাজের চৌরি মাঝে
এক সোয়ারি মিলাইছে কাচারি
ওরে আমলারা সব বসা আছে
সারি সারি জাহাজে আছে মাণিক পুরা
কম বেশি লেখে না তারা বেশ মহুরি॥

আঠার জন সহকারী আর ষোল জন ব্যস্ত ভারি
আছে নয় দুগোণি সারি তবু জাহাজে হয় চুরি
যি দিন আমাবস্যে তিতো যোগ তরী হলো ডুবোডোব
এই কলিকাল সোনাউল্লাহর নাইকো বল
কোন দিন যেন সাধের তরী শুখায় হবে রসাতল॥

১৮

ওরে ভাই রে শোন এক আজব কথা
এক মানুষের পেটের মধ্যে মাথা
আগুন দিয়ে পোড়ালি সে কয় না কথা॥

ওরে ভাইরে বত্রিশের ঘরে আছেন সাঁই
হাত পা আছে রে তার ধড়ের ঠিক নাই
মাথায় তার নাড়িরে ভাই পৈতা গলায॥

ওরে ভাই সে মানুষের জন্ম রে চার জাতির ঘরে
তাও কি সকলে চিনতে পারে
পেট নাই মুখে সদাই আহার করে
হাকিম বলে সেই মানুষের বেমার হলে বাড়োলি সারে॥

১৯

সামাল সামাল ডুবলো তরী ওরে মন নায়ে
তুমি কার হুকুমে বোঝাই তরী তুফান মাঝে দাও বেয়ে
ওরে হাল যেন ঘোরে না মাঝি ভাই
থেকো হুঁশিয়ার॥

চেয়ে দেখ তোর ভরা খোলে লেগেছে লোনা
তুই দিনে দিনে মহাজনের হারালি ষোল আনা
পদ্মা নদীর মাঝখানেতে রে ও তাই ডুবালি ভরা॥

নৌকায় চড়ে সুখ হলো না মেহেরচান তাই কয়
কোন দিন যেন ডাকাত এসে সাধের তরী মেরে নেয়
তুই মহাজনরে কি জব দিবি রে ভেবে দেখ না এ সময়॥

২০

এক রথের ধুয়া বানদে
ঈদু বিশ্বাস রাত্তো দিনে কান্দে
বেহাল রূপ সব এই পাগলা চান্দে॥

রথ উজ্জ্বলা হয়েছে রে ভাই
এই সাড়ে চব্বিশ চান্দে
উহার বিনি সুতার ডুয়া
ডুয়া সুতার রথে রেখেছে বেন্দে
তোরা দেখ সে এক বক বেঁধেছে ভাই রে উড়ো ফান্দে॥

সে রথ ভালো যাচ্ছে দেখা
মেটে তকতা অতি ওরে কমপাকতা
বকের শরীর চর্ম দিয়ে ঢাকা
রথ উজ্জ্বালা হয়েছে রে ভাই
চার চকিদার ষোল প্রহরী বকের পরায় লেখা
যে দিন বক উড়িবে রথ পড়িবে ঘোরবে না আর দুই চাকা
ঈদু বিশ্বাস বলে, ভাই রে ও মন রথে না হবে থাকা॥

২১

লাইলাহা ইল্লাললাহু মুহম্মদ রসুলউল্লাহ
মালেক আল্লা ডাকতেছি তোমারে
তুমি করিম করোকার আমি গুনাগার॥

আছি ভবের পরে পুলসেরাতে
কেয়ামতে তরাও অধীনারে
তোমার নামের জোরে রোজ হাশরে
হায় হায় গো তরে যাবে যতো গুনাগার॥

তুমি আল্লা মালেক সাঁই
তোমা বিনা ভরসা নাই
তুমি আল্লা সাঁই নিরাকারে
তোমার আকার সাকার কিছু নাই
শুনি কোরনের মাঝারে
কিঞ্চিত দয়া পদছায়া

দাও ছায়েজউদ্দিন মোল্যারে
আমি অতি অভাজন না জানি সন্ধান
হায় হায় গো নিদয় হয়ো না আমারে॥

২২

আর কল্যাণ মিত্র নামটি ধরে
সভাতে দিলাম পরিচয়
জিজ্ঞাস করি একটি কথা
বলো কৃষ্ণ দয়াময়॥

কুকর্ম করিরে লোকে চলে যায় কেন অধপাতে
পুণ্য করলে শোন বলি সে ক্যান যায় স্বর্গেতে॥

তোমার যদু বংশ হলো কেন ধ্বংস গান্ধারী নারীর শাপেতে
তুমি বলো দি খুলে কেন একা বেঁচে রলে হরি কী জন্যেতে॥

ছায়েজউদ্দিন তাই ভেবে বলে, শোন বলি নন্দের ছেলে
সকল জীব দেখিবা তুমি সমান চখেতে॥

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় বলি হে তোমায়
গেলে কেন তোমার বওনাইর সাথে
তুমি ভীমির কাছে কও গদার বাড়ি দাও
দুর্যোধনের উরোতে॥

বাউল গান

হিন্দি বাউরা শব্দ থেকে বাউল শব্দটি এসেছে। বাউরা শব্দের অর্থ হলো পাগল। এক শ্রেণীর সাধক আছেন যারা ঘর সংসার আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করে একটি একতারা ও বায়া সহযোগে গান গেয়ে ফেরেন। এবং বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এঁরা শরিয়তপন্থী নন। অথচ আল্লাহ রসুলের গুণগানও পরিবেশন করেন। এঁরা পঞ্চরসের সাধনায় দেহের মুক্তি সন্ধান করেন। বাউলদের অধিকাংশ গানই নারী পুরুষের অবাধ ও নির্বিঘ্ন মিলনের বক্তব্যে ভরপুর। শখের বাউলদের গান ব্যতিক্রমী। বিষয়ের জন্য না হলেও কথা ও সুরের আকর্ষণে শ্রোতারা বাউল গানকে পছন্দ করে। নড়াইল এলাকায়ও বাউল গানের প্রচলন রয়েছে। আমরা এখানে নড়াইল এলাকায় প্রচলিত কিছু বাউল গানের উদ্ধৃতি দিলাম :

১

তুমি থাকোরে মন সচেতনে
অচেতনে ঘুম যাইও না,
গুরুকে ভজনা করো মন ভ্রান্ত হয়ো না॥

বেহাধ যখন পাখি ধরতে যায়
সে যেমন উর্দ্ধমুখে চায়
এক নিরিখে নিরিখ ধরে আঁখি না ঘুরায়
ঘুরিলে আঁখি উড়িবে পাখি রে নয়ন পলক মারে না॥

ছিদ্র কুম্ভে জল আনিতে যায়
সে জল কোন প্রকারে রয়
আসা যাওয়া সার রে কেবল পিপাসায় প্রাণ যায়।
গোপনে গোপীদের ধর্ম রে
তা জানে রসিক জনা॥

নারকেলেতে জলেরই সঞ্চার
তার আচার কী বাহার
ভেতরে জল পরিপূর্ণ দেখতে চমৎকার
গোঁসাই নঈমুদ্দি কয় ঐ জলের দায়
ঘুরছে কতো রসিকজনা॥

২

একবার সাধু হওরে মন
করো প্রেমভক্তি চিত্তশুদ্ধি
সদা সত্য করো আলাপন॥

সাধু হও সাধু সেজো না
কোপনি এঁটে লেংটি পরে
লোক ভুলাইয়ো না
ছাড়ো প্রেম অভিমান গার্বতজ্ঞান
দেখবি ঘরে বসে নারায়ণ॥

বিশ্বরূপের মধ্যে আছিস ভাই
মরিস কেন ঘুরে ঘুরে কোথাও কিছু নাই
করো আত্মবিশ্বাস পাবি আশ্বাস
হৃদে দেখবি বৃন্দাবন॥

হিংসা নিন্দা পরশ্রীকাতর
লোভ মোহ মদ মহাআপদ
হয় না যেন তোর
হবে সর্বভুতে সর্বদর্শন
শ্বাশত সেই সনাতন॥

বিষয় ধ্যানে মত্ত হইয়ো না
উটের মতো নাটা গাছে চাটা দিয়ো না
রথীন বিষয় বিষে হারায় দিশে
বিষয় ভোগে অকারণ॥

৩

এই ভবের পরে ও গুরুধন
আমি পর বলিবো কারে
এই ভবের পরে॥

ভবে যদি পর ভাবিতো
তবে কি পিতা জন্ম দিতো
মায়ে কি আর গর্ভে রাখতো—
রাখিতো উদরে॥

আনিয়ে এক পরের মায়ে
পর যার শেষে আপন হয়ে
পরিহার করিবো কারে
এই ভবের পরে॥

ফকির বাহেরচাঁদ কয় সাঁই সনাতন
তুমি পরের হাতে বন্ধন
ওই বন্ধনে আমি বন্ধন
বন্ধন সংসারে॥

৪

মানবতা শ্রেষ্ঠ ধর্ম জগতে
মানে যারা মানবতা তারাই আছে ঠিক পথে॥

যাহাতে হয় জীবের কল্যাণ
ধর্ম নাই ভাই তাহার সমান
আছে তাহার যুক্তি প্রমাণ
কোরান বাইবেল ভাগবতে॥

মনে যাহার হিংসা আছে
ধর্ম রয় না তাহার কাছে
ছুত মার্গে কি জাতি বাচে
মানবতা নাই যাতে॥

হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান,
মানুষ বলতে সবাই সমান
সবাই পরম পিতার সন্তান
ছিন্ন শুধু ভিন্ন মতে॥

৫

আহাদে আহমদ বলছে পাক সাঁই
ছাড়ো মনের বড়াই॥

নিরাকার নীরের পরে ভাসলেন পরোয়ার
পাক পাঞ্জাতন সঙ্গে করে ভাসছিলেন একেশ্বর
পানিতে ঢেউ ফেলা হলো লাল মাটি করিলো সাঁই॥

খাস জবাবে বলছে খোদা ওরে আদম জাত
আমি সাধে গড়েছিলাম স্বর্ণকুটির নতুন রথ
আমি আদম দেহ তৈয়ার করে সেই ঘরের ভিতরে যাই॥

ফকির পাচুশাহ্ কয়, ওরে মানুষ রইলি অচেতন
মানুষ হয়ে করলি না তুই মানুষের সাধন
কলবে সাঁইর পাবি দরশন
করো মানুষ ভক্তি পাবি মুক্তি মানুষ ছাড়া নাই॥

৬

মোহে মজে খেলায় ভুলে ডুবলি আঁধারে
ও তোর সময় যেমন গলে বয়ে
ভজলি না পরম পিতারে॥

চিনলি না তুই মানিক রতন
ঠকলি বোকার মতন
করলে সাধুজনের চরণ ভজন
হতো না জীবন বৃথা রে॥

বিবেকের কথা বলে
হারালি সুদ আসলে
ওরে মরলি তুই গোলায় পড়ে
পারবি না উঠিতে তীরে॥

বেলা তোর গেল চলে
শমনের ডাক এলো বলে
ওরে নামের বল করে সম্বল
ও তুই যাবি ও পারে॥

জানি সর্ব জীবে তুমি বিরাজ
আমা প্রতি কেন নারাজ
অধীন অমরের এই শেষ নিবেদন
তরাইয়ো অধম পাপিরে॥

৭

বরণ করো রে বরণ
ও তোর মরা বাঁচায় ভয় রবে না
মরণ করিলে স্মরণ॥

ও তুই ভাবিস কেন মিছে মিছে
একবার মরিলে তুই যাবি বেঁচে
ও তুই মরিতে আয় নেচে নেচে
মরিলে পাবি তারণ॥

এই ভাবে বাঁচার আশা যে করিলো
একেবারে সেই মরিলো
আবার মরিয়া যে জন বাঁচিলো
সে কিরে ডরায় মরণ॥

তুমি ভাবিলে মরবে না বলে
মরণ কি তাই যাবে চলে
অধম ছামাদ শাহ্ ফকিরে বলে
ও শামচু করগে মরণ॥

৮

তুমি সর্বর্ভতা
তুমি মহাকর্তা আমি যে তোমার দাস রে
তুমি যে অসীম
আমি যে সসীম জীবেরে তুমি ভালোবাস রে॥

কুন শব্দ করিলে

মাটিতে জুড়িলে এই মহাবিশ্বভুবন
কবে করবে ফানা
নাই আমার জানা হঠাৎ করে যেন নাশ রে॥

তুমি গুণমণি
তুমি সর্বজ্ঞানী খেলছো একা রঙ্গবাসরে
তুমি ভিতরে
তুমি বাহিরে আছো গীতি আসরে॥

তোমার কৃপাবারি
যদি পেতে পারি হৃদয়ের জ্বালা আমার পাশরে
সাগরেকে শুকাও
মহাদেশ ভাঙাও পাপিকে তুমি ত্রাস রে॥

ক্ষ্যাপা হোসাইন
আমি মতিহীন দয়াবিন্দু দিতে আস রে
আমি গাহি তব জারি
পারি না পারি দয়াল তুমি ভ্রান্তি গ্রাস রে॥

৯

হে রহিম মহামহিম তুমি অসীম পরোয়ার
এই অসমকালে পড়ি বেহালে
ডাকি তোমায় করতার॥

তুমি আদি তুমি অন্ত তোমার জ্ঞান জানি অনন্ত
জীবের সে জ্ঞান ভ্রমানন্ত
জানে না মূর্খ গোনাগার॥

তুমি সৃষ্টি তুমি স্রষ্টা তুমি মহান ভুবনদ্রষ্টা
তুমি মিটাও জীবন তেষ্টা
বাদশাহ তুমি দুনিয়ার॥

তোমারি নাম করতে জারি
এসেছি আসরে হে পাকবারি
তোমা বই কারো ধার না ধারি
করুণা চাহি তোমার॥

ক্ষ্যাপা হোসাইন হালে বসে

লায়েক টানে দাঁড়টি কষে
তুমি থামায়ো না তরী ওগো মোর দোষে
বিপদ সিন্ধু করো পার॥

১০

দুর্যোগের কাণ্ডারি তুমি হে রহমান
পড়িয়াছি আজ বিপদে বাঁচাও আমার প্রাণ॥

তুমি ছাড়া নাই তো কেহ বিপদ তরাবার
চলাফেরা উঠাবসা তোমার পরে ভার
সমুখ হতে তাড়াও আঁধার বাঁচাও আমার প্রাণ॥

জ্ঞান মান ধন যশ সকলি তুমি
তুমি আদি তুমি অন্ত সৃজনের ভূমি
চোখের জলে তোমায় নমি: হে বিশ্বের পরাণ॥

পড়িয়াছি ঘোর বিপদে চোখে ব্যথার জল
তুমি ছাড়া হতভাগার নাইকো কোন বল
করিয়ো না আমাকে ছল করো বিপদ আছান॥

ক্ষাপা হোসাইনের এই মিনতি রাখো আমার সাঁই
তোমা পদে রাখো বেঁধে আর না কিছু চাই
যদি তুমি না দাও গো ঠাঁই জান করবো কুরবান॥

১১

বন্ধু তোর মনে কি এতোই ছিল বিষ
ওরে ভালোবেসে বুকে এসে আমায় কতো জ্বালা দিস।

তোর ইশারায় যেয়ে আমি দিলাম তোরে প্রাণ
মিলন রাতে গাইলাম আমরা কতো মধুর গান
সেই মিলন বাসর হলো বিরান
পাই না খুঁজে তোর হদিস॥

আজো আমার আছে মনে বন্ধু নিঝুম বনানী
মোদের দেখে গাইতো পাখি মিলনশুনানি
করতো ফুলে ফুলে জানাজানি
বনের পাখি দিতো শিষ॥

আজো আমি বনে আসি ফোটে যবে ফুল

মন মানে না তোরে খুঁজি বনে যাওয়া ভুল
তোর মন কি হয় না আকুল
কী ভেবে দূরে থাকিস॥

ক্ষাপা হোসাইনের এই মিনতি একবার বন্ধু আয়
শুধাই তোরে শেষের কথা অতি নিরালায়
আমায় তোর মনে চায় কি না চায়
একবার নিজে তুই বলিস॥

১২

আমি তোমারে চাহি নি কভু
তুমি আমায় চেয়েছো
আমি না ডাকিতে হৃদয় মাঝারে
এসে দেখা দিয়েছো॥

চির আদরের বিনিময়ে
শুধু অবহেলা পেয়েছো
আমি দূরে চলে গেছি
দুহাত বাড়ায়ে তুমি
কোলে টেনে নিয়েছো॥

কাজল পরা চোখ ইশারায়
কতোবার মোরে ডেকেছো
মনের থেকে তোমার ছবি
মুছে দিতে গেছি
হৃদয়ের মায়ামুকুরে
আবার দেখা দিয়েছো॥

১৩

জীবনে কখনো চাই নি যাহারে
হৃদয়ে সে কেন আসে বারে বারে
স্বপনে শয়নে জীবনে মরণে
যারে চাই তারে কেন পাই না
কাছে যাকে পাই তাকে কেন চাই না॥

প্রাণে জাগে আকুল পিপাসা
গোপন প্রিয়ার সে ভালোবাসা

মরণে পশিয়া কাঁদে নীরবে
সহি পিপাসার যাতনা॥

সেই থাকি ভালো একি যে যাতনা
যে দহন জ্বালা সইতে পারি না
ছলনার পিছে ঘুরে মরি শুধু
কিছুইতো বুঝিতে পারি না॥

১৪

আহারে পিঞ্জিরার পাখি রে
পাখি ধরা বিষম দায়,
ফাঁক পড়িলে টাক মারিয়া
দূরে সরে যায় ওরে॥

ছিয়া ছবেদ এই পাখির ভেদ
লাল জোহরা হীরামতি কয়
নয় দরোজার খবর জানলে
তারে ধরা যায়
সব দরোজা বান্ধা আছে বন্ধু তাবে তারে
নয় দরোজায় বন্ধুর বসত
বান্ধ ভক্তিডোরে॥

মোরাকাবায় দোম টানিও
বন্ধ আকারে
আল্লাহ বলিয়ে যেন
আঁখির বারি ঝরে
পীরানে পীর নূর মহম্মদ
নবগুণ শক্তি ধরে
পিঞ্জিরাব পাখি দেখা দিবে তোমার
পীরের রূপ ধরিয়া রে॥

নয় দরোজায় তার বাড়ি ঘর
তারির খবর কয়
বন্ধু বিনে কেউ কোনো দিন
পায় না তাব দিদার
আল্লার সাথে রসুল বান্ধা
পীরেব হাতে তার

তার হাতে বান্ধা পড়লে
যাবি পরপারে রে॥

বন্ধুর সাথে বেচাকেনা
করো দিয়ে তারে মন
পাচু শাহ কয় সে বিনে
নাই রে পরম ধন
কালা আমার গলের মালা
আমি তারি দাসি
যে দিকে ফিরাই আঁখি
কালা রূপ দেখি রে॥

১৫

খোদা মানুষের ভেতরে আছে নীরের রূপ ধরে
ও সে নিঝুমের ঘরে
ও সে এমনি নিঝুম ঘর হাওয়ার নাই রে অধিকারে॥

অমৃত লহরে নিঝুম ঘরে আপনার রূপ ধরে
সুফিরা বলে, তারে আল্লাহ্ থাকে নি-আকারে
পারা লাগাও হিমদর্পণে রূপ দেখবি নয়নে
মব্বতের ঘরে ছাড়া পাবি না তারে॥

মোকাম মাহমুদের ঘরে নজর করে দেখ তারে
বীণা বাজে গুনগুন সুরে কী মধুর লীলা করে
ভক্তি ছাড়া পাবি না তারে সেই মহব্বতের ঘরে॥

মানুষের সঙ্গে থাকে চিৎপুরের চিতের পর
আহাদে আহম্মদের বিলায়েতের খবর কর
লাম আলেফের খবর পাবি তহিদের ঘরে॥

বিলায়েতে মালের কোঠা সেই রংপুরের শহর
ধনির মণি মিলতে পারে যদি ভাগ্যো থাকে তোর
ফকির পাচু শাহ'র বুলি লালন পড়লি ভুলির পরে॥

১৬

গাফুরোর রহিম যিনি মালেকুল মোক্তারও তিনি
যার নূরে কুল আলম সংসার
তুমি রহিম রহমান প্রভু করতার এ জুল ও জালাল

তুমি জলিল জব্বার তোমার লীলা অতিশয়
লীলাকাহিনী ও তোমার লীলা বুঝা ভার॥

তোমার নাম অধর কালা জানো কতো লীলাখেলা
লীলায় তোর মায়ার শৃঙ্খল পুরা
তুমি হাওয়া আদম পয়দা করো
আদবে মাতোয়ারা
এ সৃষ্টির সেরা, তুমি নেকি বদি করলে কতো গো
এ সকল তোমারই ইশারা॥

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তব গুণ গাহিছে তারা
জ্বেন-ইনসান ফেরেস্তা দিন রজনী
ভবে আমি অতি হীন গোনাগার সাধনা জানি
এ নির্বোধিনী করি অহরহ তোর গুঞ্জনগুঞ্জনী
আকরাম তোর চরণে ভিখারি॥

১৭

এই চেয়ে দেখ আজমিরি কাল
মনের গাড়ি ছাড় বাড়ি চল যাই সকাল সকাল
বেনাপোলের বর্ডার যেয়ে
ঐ খানে এক ইন্দ্রজাল॥

বর্ডার ছেড়ে আগে পড়ে রেলগাড়ির টিকিট নাও
শিয়ালদা নামিয়ে মোটর করে হাবড়ায় যাও
একটা হোটেল নিয়ে খেয়ে পিয়ে
অঙ্গে একটু বাড়াও বল॥

হাবড়ার গাড়ি তাড়াতাড়ি তিনদিন পরে দিল্লি যাও
দিল্লি যেয়ে টিকিট নিয়ে গাড়ি বদল করে নাও
সেই গাড়ি চব্বিশ ঘণ্টায় যাবে রওজায়
হুঁশিয়ার পকেট সামাল॥

এবার রওয়ায় যেয়ে দেখ চেয়ে ইলাহির কি কুদরতি
লাখে লাখে নারী পুরুষ আর কতো যুবতী
তারা হায় খাজা! হায় খাজা! বলে
ঝরাইতেছে চোখের জল॥

মাছিম বলে রওজায় গেলে তো থাকে না মনের বিকার

কতো ওলিআল্লাহ গাউস দরবেশ রয়েছে হাজার হাজার
তাদের পরশ গায় লাগলে
ঘুচে যায় মনের যন্ত্রণা॥

১৮

ওরে তার তরী কি মারা যায়,
দয়াল নামের বাদাম যার নৌকায়
পাঁচ নুক্তায় আলিফ খাড়া
মিমকে ধরলে জানা যায় ॥

হাসান হোসেন কানের বালি
গলেতে হার হযরত আলি
শেরস্থানে দ্বীনের নবী
মাঝখানে ফাতেমা রয়॥
পাঁচে পাঁচা পাঞ্জাতন
পাঁচ পাঁচা পঁচিশের বন্ধন
তফা গাছে মৌ রূপে
আসন করলে দয়াময়॥

আলিফ হে আর মিমে দাল
আহমদ নাম অবিকল
তিন অক্ষর দিয়ে মিশাল
সজিলো জীব এ ধরায়॥

আলেফে আর মিমে দালে
মোহাম্মদ নাম লিখলো তাতে
লাম আলেফে দিয়ে জবর
মিমের তালা খুলে যায়॥

মাছিম বলে, নূরের পাখি
কোনদিন যেন দিবে ফাঁকি
আবদুল করিম দিচ্ছে ফাঁকি
মকসেদে এই মতলব খাটায়॥

মুর্শিদি গান

পার্থিব বিয়ে বন্ধনের জন্য যেমন ঘটকের প্রয়োজন তেমনি আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য দরকার একজন মাধ্যম বা মুর্শিদ। মুর্শিদ সৎউপদেশের মাধ্যমে মুরিদ বা

ভক্তকে পরিচালিত করে থাকেন। অনেক ভক্তের ভক্তি ও বিশ্বাস থাকে মুর্শিদকে খুশি করতে পারলে তারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারবেন। তাই ভক্তের বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে পারলৌকিক মুক্তির জন্য যে গান রচিত হয় তা মুর্শিদি গান নামে পরিচিত। মুর্শিদি গান বড়োই করুণ ও বিরহের। এবার দেখুন নড়াইল এলাকায় প্রচলিত কিছু মুর্শিদি গানের দৃষ্টান্ত :

১

তোমার মিতা আমার মিতা বিশ্ব নবী মোস্তফা,
নবীর ঐ শরিয়ত শিরে রে তোল কেউ ভুলো না॥
লাইলাহা ইল্লাল্লা মুহম্মদুর রসুলউল্লাহ
আমার নবীকে না বানায়ে খোদা দুনিয়া বানায় না
তাই তো আমার দয়ার নবী এলেন আখেরি জামানা॥

আউয়োলেতে পয়দা নবী আখেরাতে সোনার ছবি
দোজাহানের বাদশা নবী তাও কি জানো না,
দোস্ত বলে ডাক দিয়াছে পাক বারিতালা॥

লায়লাহা ইল্লাল্লাহু ছিল আরশের গায় লেখা
তাই দেখিয়ে পড়লেন ভাই রে আদম সুফিউল্লাহ
আদম হাওয়ার গুনাহ মাফ কররেন বারিতালা॥

হাশেম বলে নয়নজলে নবীজির ঐ চরণতলে
নবীজির পরে ঈমান আনো পড়ো দরূদ সাল্লাহ
কেয়ামতে নবী হবেন উমমতের [illegible]লা॥

২

শোন বলি ও অবুঝ মন করো গে সাধ্য-সাধন
ভজো নিরিখ নিরঞ্জন নবীর তরিক ধরে
পড়ো কালেমা নামাজ যাতে হবে কাজ
ভব মাঝারে এ ভক্তি ভরে॥

আমার আল্লা দেছে উম্মতের ভার
দ্বীনের রসুল পয়গম্বর
আসলো নূরের ছবি তাউজ রূপেতে তারি
আলেম সে দ্বীনের নবী তোবা গাছের পরে॥
সেই ফুল যার হবে সদায়
সেই বিনে আর কেবা পায়

ফুল যাকে দিচ্ছে পরোয়ারে
ফুলের শোভাতে হয় আমোদিত এই ধরা পরে॥

এ দিচ্ছে যারে সেই যে গাছে তিনটি ফুল
ও ফুল কে ধরিতে পারে
সদাই মুখে বলে সেই পাক বারির নাম
তসবি জপ করে এ সাধন জোরে
অধীন মওলান খাঁ কয়, ফুল রূপে উদয়
এলেন আরব্য শহরে॥

৩

বসে কান্দিরে নদীর কেনারায়
মুর্শিদ আমারে কি নিবা তোমার নায়
কতো পাপিতাপি তরে গেলো মুর্শিদ
আমি উঠলে বোঝাই হয়॥

ঈমাম হোসেন নৌকার দাঁড়ি
টানতেছে গুণ সারি সারি
আমার মুর্শিদের নৌকায়
পীর মান্দার শা সে বাদাম হয়ে
মধ্যি নৌকায় পাল খাটায়॥

মা ফাতেমা ধরে ডুরি
টানতেছে গুণ সারি সারি
আমার মুর্শিদের নৌকায়
আমার মুস্তাফা সে মাঝি হয়ে
বসে হাল মাচায়॥

৪

আমার মন পাগলারে
আমার দেল পাগলারে
হরদমে আল্লাজির নাম লইয়ো লইয়ো রে॥

ভার নাই বোঝা নাই রে
ও নাম মাথায় করে রবো
জিব্বার পরে থুয়ে ও নাম ধীরে ধীরে নেব॥

বাজারেতে মানুষ নাই রে
ও তারা বসে চালে চালে

বোবায় বসে দেচ্ছে দোকান খইরেদ করে কালে॥

পুষ্কনিতে পানি নাইরে
তার কিনার ক্যানে ডোবে
খোঁপেতে কবুতর নাই তার পায়রা কেন ওড়ে॥

৫

বত্রিশ দাঁড়ের পানসি আমার রে মুর্শিদ ধন
ফেরে ঘাটে ঘাটে
এখন কাণ্ডারি বিহনে তরী গো
আমার বান্ধা রইলো ঘাটে রে॥

পাথর হয়ে ভাসে রে মুর্শিদ ধন
শূন্য হয়ে ডোবে
আমারি এই ভাঙা তরী রে
হালধরিয়া বস রে
নাও আমার চলে না ঠেকলো বালুচরে॥

৬

ওকি আইসো রে দয়াল আমার মুর্শিদ রে
হারে ওরে বইস রে দয়াল আমার মুর্শিদ রে॥

মুর্শিদ ধনের বাড়ি যাতি দোসারি দেয়া কাঁটা
আমি যে দিকে হেলাই সোনার তনু রে
দয়াল মুর্শিদ সেই দিক ফোটে কাঁটা রে॥

মুর্শিদ ধনের বাড়ি যাতি ম্যাগ করেছে ভেরা
কেমনে পার হবো আমি পদ্মা নদীর খেয়া রে॥

মুর্শিদ ধনের বাড়ি যাতি সামনে ক্ষিরেই নদী
আড়ি উড়ে যাবার আশায় করি রে
দয়াল মুর্শিদ পর দেয় নাই ক্যান বিধি॥

৭

মুর্শিদ অমূল্য রতন
অসময়ের কাণ্ডারি তিনি জীবনের জীবন রে॥

কাষ্ঠের মধ্যে পোকা থাকে বাঁচে তার জীবন

তেমনি মানবদেহে থাকে মুর্শিদ কর অন্বেষণ রে॥

মানুষের ভেতরে মানুষ নাচে আরো গায়
বন্ধুর সাথে পীরিত করিলে তারে দেখা যায় রে॥
কামক্রোধ অনিবার্য সকাল দাও ঐ নামে
কাম তোমার হবে স্বকাম বন্ধুর ও নামে রে॥

রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ এই তো পঞ্চরস
বন্ধুর নামে মালা গাঁথিলে হইয়া যাবি পাশ রে॥

শয়নে স্বপনে রাখো ঐ রূপেতে মতি
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলে পরে হবে ভবপারের সাথি রে॥

কেমন বান্ধব ছিল সেই শেখ ফরিদ আউলিয়া
বায়ান্না খুন মাফ করিলো নিজাম আউলিয়া রে॥

পাচু শাহ কয় এমন বান্ধব মিলে কি আর ত্রিসংসারে
লালনকে রাখিও তোমার চিরদাস করিয়ে রে॥

৮

মুর্শিদ যারে দয়া করেছে আশেকের বাণ মেরে
কালবো জারি করেছে॥

গুরুর প্রতি নেহার ভক্তি একনিষ্ঠা রুচি যার আছে
রূপের হলুদ গায়ে মাখিয়া একরূপ হয়েছে
কাল শমন নাই তার কাছে রে
সে যে রূপ নেহারে ডুবেছে॥

মুর্শিদ অমূল্য রতন গেয়ে প্রেমের মহাজন
প্রেম দিয়া প্রেম আদায় করে এমনি তার কারণ
করে প্রেম দিয়া প্রেম আলিঙ্গন রে
তারে সূক্ষ্ম প্রেমিক করেছে॥

ভক্তির সাথে শক্তির আলাপন প্রেমভক্তি জোগাড় করে
যে পেতেছে আসন প্রেম শৃঙ্গারে হিম দর্পণে
পেয়েছে যে জন রে
তবে মুর্শিদ তারে খাস করেছে॥

যার প্রেমেতে আরতি তার খুলে যায় জ্যোতি
দিবানিশি দেখতে পায় সে রসবাজ মূর্তি,
মুর্শিদ প্রেম দিয়া প্রেম আদায় করেছে
তারে ফানা ফিল্লা কইরাছে॥

যে জন ডুবেছে রূপের সাগরে শমনে কি করবে তারে
সদাই থাকে রূপের ঘরে ফকির পাচু শাহ কয় সেই মোহিনীরূপ রে
যার নয়নে লেগেছে॥

৯

আল্লাহ তোমারই নামে– আল্লাহ্ তোমারই নামে
নামে যতো মেহেরবানি এই ধরাধামে
আল্লাহ তোমারই নামে॥

আল্লাহ্ তোমারই নামে
রবি–শশি-গ্রহ-তারা চলিছে নভে
তারা বিরাট-বিশাল স্থিতিতে আছে অনন্ত অসীম
আল্লাহ্ তোমারই নামে॥

আল্লাহ্ তোমারি নামে
অণু থেকে পরমাণু—আর জড় থেকে জীবাণু
চালিত হয় সবি কিছু এই ধরাধামে
আল্লাহ্ তোমারই নামে॥

আল্লাহ তোমারই নামে
সৃষ্টি হয় যে বিশ্বভুবন–স্থিতিতে সংস্থাপন
তারপরে লয় সমূহ জীবন–অনন্ত অসীমে
আল্লাহ্ তোমারই নামে
সুশৃঙ্খল সবই কিছু চলে ও-থামে
আল্লাহ্ তোমারই নামে॥

১০

শেষের ভাবনা ভাবলি নে একদিন পাগলা মনা
তোর ভাবগাঙ্গে লাগলো কাটাল টান
ও–তুই চূর্ণী নদীর ঘূর্ণিপাকে হারাবি পরাণ॥

ব্যবসার লোভে পথ ভুলিলি ঝাপসা কুয়াশায়
যা ছিল তো পুঁজিপাটা নিলো ছয় ব্যাটা চোরাই

মূল তহবিল হিসাবের বেলায়
আসলে হলো লোকসান॥

আপন ভেবে যাদি তুরে করলাম জীবন পণ
সে দিবে মোর বক্ষে ছুরি ভাবি নাই কখন
আগে যদি জানতাম এমন
দিতাম না এ মন প্রাণ॥

নদীতে লাগিলে ভাটি ফিরে পায় জোয়ার
যৌবনে লাগিলে ভাটি আসে না কো আর
কাঙাল কিবরিয়া কয় নাই সারিবার
সম্মুখে এক পাগলা বাণ॥

১১

আমি কি গাহিতে পারি নবীজির জীবনী
হায়াতুন মুরসালিন নবী আশেকেরই রব্বানি॥

দুনিয়া সৃষ্টি করার পূর্বে তাকে সৃষ্টি করিলে
আরশ মহল্লায় তার নামটি ঝুলায় রাখিলে
ফেরেস্তারা কয় ওহে প্রভু
শুনাও নবীর কাহিনী॥

মুহম্মদ নাম নিজেই রাখলে ওহে প্রভু রব্বানা
আবদুল্লাহর পরিচয় দিয়ে পেলো মাতা আমিনা
শিশু জন্ম নিয়ে সিজদায় গেলো
ফুটলো কতো কামিনী॥

ঈসা মুসা দাউদ নবী সব নবী রয় প্রতীক্ষায়
আরশ কুরসি চেয়ে আছে তার চরণ ধূলির আশায়
কিবরিয়া কয় নিও সালাম
মানববৃন্দের শিরোমণি॥

১২

লাইলাহা ইল্লাল্লাহু
জপ রে মন হৃদয় দেলে॥

গেলে ফানাফিল্লার ঘরে
দেখবি নূর বরিষণ যে করে
আলিফ, লাম, মিম যুগল ঘোরে
পাবি তারে সাধন বলে॥

পাপি তাপি উদ্ধারিতে
আসিলেন এই দুনিয়াতে
জন্ম নিলেন আরবেতে
পাইল না আমিনা কোলে॥

ভবের খেলা খেলতে বেলা
ফুরাইলো আয়ু বেলা
কাঁদি বসে একেলা
আছি শুষ্ক মরুতলে॥

অগতিরও তুমি গতি
মন-মন্দিরে জ্বালাও বাতি
আমার নাই সাধন শক্তি
যেয়ো না আমাকে ভুলে॥

ভব পারের ভবতরী
লও না আমায় পার করি
রোজ কিয়ামত যেন তরি
কিবরিয়া ভাসে নয়ন জলে॥

১৩

মরুর বুকে ফুটলো রে ফুল দেখবি যদি আয়,
ফুলের শোভা মনোলোভা গন্ধে প্রাণ জুড়ায়॥

ফুলটি ছিল আরশেতে অতি যতনে
মুক্তা দিয়ে ঘেরা ছিল মধুর মিলনে
বারোই রবিউল আওয়াল সোমবারেতে
কোন ফুল ছড়ালে গন্ধ এই ধরাতে
অন্ধকারে আলো দিলো লজ্জা পেলো সবিতায়॥

১৪

কি যেন কি দিলে রে আল্লা রাসুলের মাঝারে
জ্বলে নূরের বাতি দিবা-রাতি দুনিয়ার বাজারে॥

খোদার কালাম করে কবুল
সৃষ্টির বিশিষ্ট রসুল

ফুটলো ধরার বুকে আলোর মুকুল গভীর আঁধারে॥

তরাতে এই সরেজাহান
পুণ্য দিন সাতাশে রমজান
সে দিন নাজিল হলো পবিত্র কোরান শুভ সমাচারে॥

শুনায়ে তৌহিদের বাণী
নবী ডাকিলেন দিয়ে হাতছানি
ছুটলো মরুতে বেহেস্তের পানি অসীম জোয়ারে॥

পাগল বিজয় বলে রসুল বিনা
কেহ পুলছিরতের কুল পাবি না
ওহে দ্বীনের নবী ভুলিয়ো না শেষ দিনে আমারে॥

১৫

ফুটলো রে ফুল আরবের গুল বাগিচায়
রবিউল আউয়াল মাসের বারই তারিখ ভোরবেলায়॥

আমিনা মা-র পরাণ পুতুল
রাসুলুল্লাহ বেহেস্তি ফুল
বিকাশে যার বিশ্ববিপুল
রাঙলো আলোক রঙবিভায়;
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা শূন্যচারী ফেরেস্তারা
সাগরগিরি দিগবালারা সাদর সম্ভাষণ জানায়॥

চৌদিকে পাহাড়ে ঘেরা
তার মাঝে বায়তুল সেরা
অদূরে পবিত্র হিরা মগ্ন নিঝুম মৌনতায়॥

গুহাতে তার পরম ধ্যানী
পেলো পাক কোরানের বাণী
আয়াত শুনে জগৎখানি জাগলো নতুন চেতনায়॥

বিপথগামী আদম সন্তান
পায় না খুঁজে আলোর সন্ধান
নিয়ে সত্য সুন্দরের দান এলে রসুল এই ধরায়॥

ভ্রান্ত অন্ধ বুঝতে নারে
কে এসেছে ভুবন দ্বারে
আঘাত হেনে বারে বারে বন্ধুগণে মারতে চায়॥

কতো মহাজন এ সংসারে
এলো গেলো বারে বারে
বাঁধে না কেউ সবাকারে সাম্যমৈত্রী করুণায়॥

প্রফুল্ল কয়, দীনের বেশে
দয়াল নবী নেমে এসে
জগৎ জীবে ভালোবেসে বাঁধলো প্রেমরাখী–সুতায়॥

১৬

এই ভব সিন্ধু ওহে দীনবন্ধু
কেমনে হবো ভব পার;
দেখে নদীর তরঙ্গ প্রাণবিহঙ্গ
আতঙ্কে কাঁপে অনিবার॥

পারে যেতে বাসনা একা যেতে পারবো না
তুমি গুরু হয়ো কর্ণধার
আমার নাও নিতে গোলার পাঁকে
মায়া এক রাক্ষসী ডাকে
ডাকে শুনি বাসনা কী তার॥

তুমি থাকতে নৌকার পরে
চোর ডাকাত কেন তোমায় ধরে
তুমি গুরু চোরেরই সরদার
চুরি করে চোরের ধন তুমি কেন অকারণ
জীবগণকে দাও জীবান্তর॥

আমারি ভাগ্য ফলে জন্মিয়াছি মাবনকূলে
ঘুরি ফিরি আশি লক্ষবার
শুনো বলি প্রাণসখা ডুবায়ো না এ তরীটা
ইরফান বোকা না জানে সাঁতার॥

১৭

হাল ধরেছে নবী নির্ভয়
ঐ দেখ সোনার নায়॥

শরিয়ত তরী খান
তরিকতে তকতা জান

হকিকতি পাতাম লোহা
জানো তার বিষয়
মারেফতি ভিতরের মাল
তরীখানা চাই সামাল
পঞ্চরত্ন নিয়া ওঠো সেই নৌকায়॥

পড়ো লাইলাহা ইল্লাললাহু
মুহম্মদুর রসুলউল্লাহ
পড়োরে মন এই কলেমা
দিন তো বয়ে যায়:
তুমি আগে করো শরিয়তি
পাবা নবীর মারেফতি
হয়ার বলে ভুলো না কু-ছলনায়॥

১৮

সেই রোজ হাশরের কঠিন দিনে
পাই যেন দেখা দয়ার নবী রে
আমি বান্দা গোনাগার নাই কেহ আমার
ভরসা করি কেবল সেই পরোয়ার রে॥

[illegible] করতো জ্বালাতনি
[illegible]
[illegible] হাজার
[illegible] ঈমানকে [illegible] করো ঈমানদার রে॥

[illegible] দুনিয়ায় আসে
[illegible]
[illegible]
[illegible] নবী [illegible] ধৈর্য ধরে॥

হাশরেরই বেলায় উম্মতের লাগিয়া
ঘুরিবেন একেলা নবীরে আমার
অধীন হাশেম বলে নবীরে ভুলিয়ো না রে॥

১৯

জানতে হয় নবীজির বেনা
খোদার নূরেতে নূরনবী পয়দা
নবীর নূরে সারা দুনিয়া॥

নবী পয়দা হলো নূরে
সে ভেদ অতি গভীরে
রাগ দেহ ছিল পূর্বে রাগেরি ঘরে
তারে কেউ মানে কেউ মানে না॥

নবী আলাহেচ্ছালাম
লেহাজ চার মোকাম
কোন মোকামে থেকে নবী ধরিলেন খাসনাম,
জানলে সে নাম হবে খোশনাম
পানা দিবে সাঁই রব্বানা॥

হুয়াল বাতেনে নবী
জাহেরেতে সেই নবী হয় আদম ছবি
আখেরেতে নবী পাবি
জানগে নবীর উপাসনা॥

নবী আপনি মকবুল
নবী খোদারই মকবুল
করলেন কি না করলেন নবী
সেই কথাটির স্থুল
জহর বলে দেহ পয়দা কিসে
বাপের বীজে জানো ঘটনা॥

২০

নবী চিনে করে ধ্যান
আহম্মদ আহাদ মিলে
আহাদ মানে ছোবাহান॥

আতিউল্লাহ আতিয়ার রসুল
দলিলে আছে প্রমাণ
আল্লাহর নূরে নবীর জন্ম
নবীর নূরে সারে জাহান
নূরে জানে আদম তনে
বসতি করে বর্তমান॥
আউল আখের জাহের বাতেন
চারিরূপে বিরাজমান

বাতুনে গোপন থেকে
জাহেরে দেন তরিক দান॥

তরিক ধরো সাধন করো
আখেরে পাবা আসান
বর্তমান নাহি জেনে
পাঞ্জু হলো হতজ্ঞান॥

২১০

মারফতি গান

সমাজে একদল ব্রাত্যসাধক আছে তাদের আচার আচরণ শাস্ত্রানুগণ নয়। তারা নিজেদের ভিন্ন পথের সাধক বলে মনে করে। তারা মনে করে, তাদের বিদ্যা হলো 'সিনারবিদ্যা'–যা শুধু মুর্শিদের কাছ থেকেই জানা যায়। সেই ধর্মীয় আচার ও বিদ্যা শুধু গুরু ও শিষ্যদের জানবার বিষয়–অন্য কারো পক্ষে তা জানবার পথ নেই। তারা তত্ত্বকে বলে বাতুনিতত্ত্ব। ঐ বাতুনিতত্ত্ব যখন গানের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাকে বলে মারফতি গান। নড়াইল জেলা এলাকায়ও প্রচুর মারফতি গান গীত হয়ে থাকে। এছাড়া এলাকার অনেক রচয়িতার রচনা থেকেও মারফতি গান পাওয়া যায়। এবার দেখুন কয়েকটি মারফতি গানের দৃষ্টান্ত :

১

বিশ্বাকারের আগের অবতার
সহস্রাসারের উপর করে ভর॥

যার অঙ্গের ময়লায় মাটির পয়দা হয়
পুছিনাতে পানি পয়দা করিলেন খোদায়
নিঃশ্বাসে তার অগ্নি জ্বলে
হাওয়া দুভাগ ত্রিসংসারে
শাহ নৈমুদ্দিন কয় কারাকার
ভিতরে আছে নৈরাকার
সেই নৈরাকারে পাক পাঞ্জাতন
হয়ে ভেসেছিলেন ছরোয়ার॥

সে আপনার নূরে মোহিত হয়ে
পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়
পাঞ্জাতন হয়ে হলেন ধরায় অবতার
কে কে হলেন তাও বলি খবর
রসুল আলি মা ফাতিমা

আর হাসান হোসেন
এরা আসলো সবে এই ভবে
জীবকে করিতে উদ্ধার॥

২

আছে কুদরতে সাঁই কুদরতকামিনী
হু-হুংকারে আল্লাগনি
মায়ের মা পিতার মা তিনি
জগতের জননী মাতা হক নামের ধ্বনি
তাকে সৃষ্টি করলেন সেধে
আমার মাবুদ মওলা গুণমণি॥

মা আমার মা হয়ে নিলো নিরঞ্জনের কূল
মায়ের দুই কানে দুটি মতি ছিল মাথায় ছিল ফুল
মায়ের অঙ্গে ছিল চন্দ্র সূর্য গালেতে ছিলেন নবী
ফকির দবির বলে সে মাকে না চিনিলে
তোমার ধর্মকর্ম সব বিফলে মিছে রে হয়রানি॥

৩

সাঁইজির লীলাস্থলে যাই সাধুর সাতবাজারে
আরেফ যারা বুঝবে তারা বুঝবে না কো অন্যজনে॥

আউয়ালেতে আল্লা যিনি
নিরাকারে ছিলেন তিনি
আপনার নিজ অঙ্গ মৈথুন করে
মোহব্বতের পয়দা করে নূর দিয়ে
মোহাম্মদকে পয়দা করেন দশাকার॥
দ্বিতীয় দর্শন হলো দশাকারে
তৃতীয়াতে যোগ হলো জহুরি
পৌঁছাইল সেই নূরে পয়দা করিলেন আদমেরে॥

আল্লাহ আশেক হয় যাতে
মোহম্মদ আদম পয়দা হয় তাতে
তিনেতে জুদা জুদা এক তারে তারে
মাবুব আলি বলে, তাহার পিতার চরণ গুণে
আল্লা রসুল হয়ে আসিলেন এই দুনিয়ায়॥

নবীর শাফায়াত নাই মেলে
আপনারে চিহ্নিত বলে
জিন্নাত মাঝে লয় ধরে॥

৬

আমি বন্দি পদে প্রভু নিরাকার
কে বোঝে মহিমা তার
যার তুলনা দিতে নাই কো আর
আমি তোমার নাম ভরসা করি
তুফানে দিলাম সাঁতার
কিঞ্চিত দয়া করে অধীনেরে
এই সংকটে করো পার
শুনি ইব্রাহিমকে রক্ষা করিলে
আতশের মাঝার॥

আল্লাহর নিজ নূরেতে রসুল পয়গম্বর
শুনি যার নূরে জগৎ সংসার
পাক পাঞ্জাতন সঙ্গে ছিল যার
ছিল আবুবকর ওসমান গনি আর উমর
মা বরকত ছিল ময়নারূপে
রসুর ছিলেন তাহার গলের হার
শুনতে পাই আলি জোরোয়ার॥

আল্লাহ নিজ কুদরতে পয়দা করিলে
মা বরকত বলে ডাকিলে
কূল আলম তার তরে দিলে
ছিল হযরত আলী মহাবলী
ডাকতো ফাতেমা বলে
মানবীর বেটি বেহেস্তের দেওয়ানদার
সবের মা হয় দেখো কোরান খুলে॥

৭

উম্মতের কাণ্ডারি নবী শুয়ে আছেন মদিনায়
ডাকলে সাড়া দেয় নবী মোর উঠে কথা কয়।
সে কারো ডাকে দেয় না সাড়া কেউ ডাকলে কথা কয়
একবার জিন্দা দেলে পরাণ খুলে ডাকো মনুরায়॥

অপ্রকাশ মহিমায় জাগলো প্রকাশেরই সাধ
জাত নূরের সেফাত গড়লো নবী মোহাম্মদ
মাসুক রূপে রইলো আহাদ আরশ মহল্লায়
আশেকে দেয়ানা নবী মোর এলেন দুনিয়ায়॥

মানব লীলা করে খেলা মোর নবী মোস্তাফায়
শুয়ে আছেন অজ্ঞাত বাসে মদিনার রওজায়
সেই রওজা হতে নূরজারি হয় আরশ মহল্লায়
কূল দুনিয়ার মূলধনী সেই সোনার মদিনায়॥

সে তো আশেকিনের প্রেম দরিয়ায় প্রেমের খেওয়া বায়
যতো ছালেহিন সাদেকিন যারা পার হয় সেই নৌকায়
ওঠে মুক্তাকিন মুরছালিন যতো আবেদিন সেই নায়
পৌঁছাবে দয়ালের খেয়া ছদরাতুন মোস্তফায়॥

যার মজা পেয়েছে খাজা গরিব নেওয়াজ
রওজা পাকে যেয়ে পেলো দয়াল নবীজির আওয়াজ
কাঙ্গাল কেবর কয় সেই দেশের রেওয়াজ গেলে জানা যায়
তোরা আয় কে যাবি প্রেমিক সুজন আয় রে ছুটে আয়॥

৮

এক কুপের কথা গুরুর কাছে
করি আমি জিঙ্গাসন বলো হে গুরুধন
আমি হাউস করে এক কূপ কাটিলাম
তার ভেতরে মরা একজন
কুয়ার মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন ছিল রে একজন
ছিল না দরশন॥

পানি থাকতে তোয়াম করা কোরানে মানা
আমার কী ওজু হবে না,
আমি কেমন করে সেই পানি পাক করি
তাই গুরু আমায় বলো না
পানি থাকতে তোয়াম হবে না
আমার কি ওজু হবে না॥

পানির মধ্যে যে সব সৃজন
করেছেন মালেক সাঁই
আমি ওর ওমন দেখি নাই
আমি ইসমাইল শিকদার দশের নিঃশ্বাস

শুনবো গুরু তোমার কাছে
গুরু বলেন দয়া করে॥

৯

পিরিতি সুরীতি ভাই রে কুরীতি না
সে পিরিত জানে কয়জনা
যে দিন ডিম্বাকারে নৈরাকারে ভাসলেন রব্বানা
কবে আছমান জমিন জগৎ স্বামী
পাক পাঞ্জাতনের ঘটনা॥

পাক পাঞ্জাতন পাঁচ ভাগেতে
করলেন পরোয়ার
ময়ূবরূপে সদায় জপে নাম মওলানা
কুদরতের আয়না করে সামনে ধরে
সিজদা দেয় পাঁচজনা॥

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যক্ত হলো
দুনিয়ায় দরখাস্ত প্রকাশ
অধম ইসমাইল তাহা ভেবে বলে
দুনিয়ায় জমিন আর আকাশ॥

১০

বেলায়েত ভেদ যে জনা জানে
বেলায়েত নবুয়ত বুঝে
সাঁইকে খুঁজে ভজে নির্জনে॥
বেলায়েত ভেদ অধিকার
জানলে যেতো মনের আঁধার
নবুয়ত ছেড়ে নিরাকার টানে॥

বেলায়েত সাঁই বর্তমান
নবুয়ত সাঁই অনুমান
অনুমানে হয় কি ধিয়ান
না দেখলে নেহার হয় কেমনে॥

আগে শুনা পিছে চেনা
তাইকে বলে ঈমান আনা

আপন ছিনায় ঢুকে দেখ না
ছফিনার মর্ম পাবি কেমনে॥
আউলিয়াগণ বেলায়েতে
নবীগণ সব নবুয়তে
জহর পড়লো দোটানাতে
এধার ওধার জাহের বাতেনে॥

১১

বেশি বুঝতে চেও না মন
বুঝে তুমি অবুঝ হইয়ো
ন্যায় মন বাক্য কাছে রেখে
সংশোধন নিজে হইয়ো॥

কূট বুদ্ধির হাতায় দড়ি
থাকে জেলখানায়
বিষয় সম্পদ সব হারায়
করে হায় রে হায়
শেষে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ওঠায়
মান-সম্মান সব হারায়ে॥

অতি রোমন্থনে কিন্তু ওঠে হলাহল
বান চুয়াইয়ে ওঠে পানি যাবি রসাতল
ও তোর বিগড়ে যাবে ইঞ্জিনের কল
সময় থাকতে সাবধান হইয়ো॥

১২

হজ্ব করিতে যাবি রে পাগলা মনা,
হাওয়াই সারথি হইয়ে কাবাতে হজ্ব করো না॥

ঢাকা থেকে কোলকাতা যাবি
দিল্লি শহর সামনে দেখবি
চোরাগলি চিনে নিবি
ধরা পড়লে ছাড়বে না
সেই পথে আছে রে ভয়
মরা বাঘে ধরিয়া খায়
তখন তোর নাই রে উপায়
কাঁদলেও তোমায় ছাড়বে না॥
ইটের কাবায় করিলে হজ্ব

শুধু হয় পোশাকের সাজ
হয় না পরপারেরই কাজ
ভেবে দেখ অবুঝ জনা
করিলে হজ্ব দেল কাবা
খোদাকে দেখিতে পাবা
সহজে বেহেস্তে যাবা
ইটের কাবায় পাবা না॥

ধর্মতলার মোড়ে যাইবি
মুন্সিগঞ্জের নৌকা বাইবি
রব্বানিপুর দেখতে পাবি
থাকলে মনে বাসনা
তোমার ঠিক রাখিয়ো
পাসপোর্ট ভিসা
নইলে সীমান্তে হারবি দিশা
কিবরিয়া কয় থাকলে আশা
চিনবি রে সেই অচেনা॥

১৩

শাহজারাতুল ইয়াক্বিন নামে
একবৃক্ষ সৃষ্টি করিলে
চারটি কাণ্ড করলে তাহার
সুন্দর করে গড়িলে॥

নিজ নূরে সৃষ্টি করলে
নূরে মুহাম্মদি
ঘিরে রাখলে তাহে তুমি
সাদা মুক্তাদি
ময়ূর পাখির ন্যায় আকৃতি করে
ওই বৃক্ষের উপর রাখিলে॥

সত্তর হাজার পাখি তোমার
বৃক্ষে রহিল
তোমার গুণ কীর্তন তসবি
তাহবিল জপ করিতে লাগিল
আয়না একটি তৈয়ারি করে
পাখির সামনে ধরিলে॥

নিজ আকৃতি দেখে পাখি
হইলো আত্মহারা
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো
হইয়া পাগলপারা
তখন পাঁচটি সিজদা দিলো
মাবুদ মাওলার মঞ্জিলে॥
আল্লাহর নূরে মুহম্মদির তবে
মায়াবী দৃষ্টি করলেন দান
জড়ো সড়ো হইলো শরীর
বাহির তখন হইলো ঘাম
কিবরিয়া কয় নিয়ো সালাম
যার ঘামে বিশ্ব সৃজিলে॥

১৪

মানুষ হয়ে মানুষ চিনলি না পাগলা মনা,
মানুষ হয়ে মানুষ চিনলি না॥
মন রে মজিয়া এই মায়ারসে
কি যেন কি হয় গো শেষে
সেই ভাবনা একদিন ভাবলি না
সব আমার আমার করলি রঙ্গলীলা
ভূমি জঙ্গলা করলি
কয়লা ধুইলে ময়লা যাবে না॥

মন রে শিশুকাল গেলো ধূলাখেলায়
যৌবন গেলো হেলায় হেলায়
অবোর বেলায় তারে পাবি না
আখ রেখে চিবাইলি বাঁশ
করলি নিজের সর্বনাশ
মিষ্টি রস তাতে মিলবে না॥

মনো রে আকারেতে আস্ত মানুষ
প্রকারে মস্ত বেহুঁস
বিচারে মানুষ তারে কয় না
কিবরিয়া কয় ঘুচলে স্বভাব
যাবে রে তোর মনের অভাব
স্বভাবে যাবে তা চেনা॥

বিচ্ছেদি গান

সহজ কথায় বিরহমূলক গানকে বিচ্ছেদ গান বলে। প্রেম বিরহে কথকের গভীর আর্তিই হলো বিচ্ছেদ গানের মূল বিষয়। এখন প্রশ্ন হলো, কোন প্রেম আর কিসের বিচ্ছেদ। দয়িত-দয়িতার মানবীয় প্রেম ও স্রষ্টার বিরহে যে বিষাদ জন্ম নেয় তা-ই রচয়িতার দরদি মনের ছোঁয়ায় প্রকাশ পায়। বিচ্ছেদি গান বা বিচ্ছেদ গান অতি উৎকৃষ্ট মানের বলে ধারণা করা হয়। এবার কিছু বিখ্যাত বিচ্ছেদ গানের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো.

১

পরবাসি রে বড়ো দাগা দিয়ে গেলি আমার মনে
আমায় নিয়ে যাবে তোমার দেশে রে
এই কথা ছিল তোমাব সনে॥

ফাগুনের পূর্ণিমা রাতি একলা বসে মালা গাঁথি
সহসা অজানা সাথী এলো মোর ভবনে
আমার মনের কথা মনে নিয়ে রে সজল নীরব নিবেদন॥

গাঁথা মালা দিয়ে গলে আসি বলে গেছো চলে
সেই হতে সেই বিজনতলে আছি প্রতিক্ষণে
তুমি আবার আসিয়ো রে আমার আকুল আবাহনে॥

ভুলি নাই সে ভালোবাসা দিন চলে যায় যায় নি আশা
তোমার বাঁশি কুলনাশা বাজাও ফুলবনে
তোমার রূপের ছোঁয়া লেগে আছে রে আমার পথ চাওয়া নয়নে॥

পাগল বিজয় বলে জীবনে আর কতো কাঁদাবে মোরে
কাটবে কি দিন এমনি করে তোমার বিহনে
কতো রবো আমি তোমার হয়ে রে আমার জীবন মরণে॥

২

এসো নন্দলালা বংশীয়ালা শ্যাম সুন্দর
এসো ব্রজবিলাসিয়া রাধা বিনোদিয়া
বাঞ্ছিত বিরিঞ্চি দিগম্বর॥

গিরিধারী গোপাল শ্রী মধুসূদন
মুরারী দামোদর অরিনিসূদন
এসো মানসমোহন তামসদহন
প্রিয় প্রেমপিতম্বর॥
উত্তম অনুপম নমোঃ নারায়ণ

প্রেম অনুরক্ত ভক্ত পরায়ণ
এসো নয়নরঞ্জন বিপদভঞ্জন
গোকূল কূল পুরন্দর॥

পাগল বিজয় ভণে এসো হে মাধব
তুলসী দলসহ আঁখিজল দিবো
আমি পরাইব চন্দন করাইবো বন্ধন
ভরাইবো হৃদয় কন্দর॥

৩

নদীর মোড়ে ভাটির বাঁকে কোণাঘেঁষা চর
আমার সোনা বন্ধুরে সেথায় কেন বাঁধলি বাসর ঘর
হলো পুরানো পরাণে আপন এতেই কি তোর পর॥

শান ঘাটেতে স্নান করিতে দেখলাম তোমার রূপ
বন্ধু দেখলাম তোমার রূপ
আমি প্রাণ খুলে হায় নদীর জলে গো
দিতে নারি ডুবের পরে ডুব
আমি কূল তেজে ভুল করেছি খুব হারালাম ঘর ও পর॥

কাশের বনের ভেতর দিয়ে একপেয়ে পথে
বন্ধু একপেয়ে পথে
সে দিন তোমায় আমায় বিকেল বেলায় গো
দেখা হলো দোল মেলায় যেতে
কেন ফুলাল সেই কাশের পাতে দুলাল দুকর॥

উত্তর ভিটের মিঠে গাছে কতো পাকা আম
ওরে বন্ধু কতো পাকা আম
আবার দক্ষিণবাগে আগের মতো গো
পেকে উঠলো কতো কালোজাম
খেলে নিঠুর খেলা ফেলে যায় আম কালবৈশাখীর ঝড়॥

অসীমের আসন ফেলে এলেম বাহিরে
ওরে বন্ধু, এলেম বাহিরে
অসীমের আসন ফেলে এলেম বাহিরে
যবে তারে চাহি রে
কাঁদে এমনি করে নারী নরে যুগ যুগান্তর॥

৪

ও সেই গোপন অভিসারে রে আমি
কেন বা গেলাম কদম গাছের তলে॥

কেন বা গেলাম কেন বা ভালোবাসলাম
হা রে কেন বা গেলাম কেন বা ভালোবাসলাম
কেন বা পড়লাম তার ছলে;
আমার কাঁদতে কাঁদতে জীবন চলে গেলো
বক্ষ ভাসে চোখের জলে॥

বাঁশি বাজায় মধুর সুর আনিয়া
হা রে বাঁশি বাজায় মধুর সুর আনিয়া
শোনে বনের ফুল ফলে;
আমার পোড়া হৃদয় হরণ করলো বাঁশি
তাই হৃদয় পোড়ে পলে পলে॥

ঘরে আমার রহে না তো মন-প্রাণ
হারে ঘরে আমার রহে না তো মন-প্রাণ
হৃদয়ে তুষের আগুন জ্বলে
আমি কোথায় যাবো কোথায় তারে পাবো
আমায় দে না তোরা বলে॥

নিদয় বন্ধুর লাইগা আমি কাঁদি
হা রে নিদয় বন্ধুর লাইগা আমি কাঁদি
বলিস তোরা তারে মলে;
ক্ষ্যাপা হোসাইনের শেষ মিনতি রাখিস
আমার মালা দিস তার গলে॥

৫

তোমায় কতো ভালোবসি রে কালা
একবার দেখে যাও,
তুমি অভিমানে কোথায় চলছো
একটি বারে মুখ ফিরাও॥

নিতি নিতি ঘাটে আসি
শুনে তোমার মোহনবাঁশি
বন্ধু তোমার বাঁশি সর্বনাশী
মরমটানা সুর বাজাও॥

রইতে নারি আমি ঘরে
দিবানিশি প্রাণ বিদরে
বাঁশির সুরসোহাগে মন যে হরে
বিরহিনীর প্রাণ ভাগাও॥

কলসিতলায় ননী আনি
আসবে শ্যামল অভিমানী
তুমি বোঝ না কি মরমবাণী
বন্ধু একবার ফিরে চাও॥

ক্ষ্যাপা হোসাইন বলে ওরে কালা
পরানে আর দিস না জ্বালা
আমি অবোধ কুলবালা
দুই নয়নে দেখা দাও॥

৬

ও সেই কালার বাঁশি শুনে রে
আমি কেন বা দিলাম হৃদয়-মনখানি॥

কেন বা গেলাম কেন বা মন সঁপিলাম
হারে কেন বা গেলাম কেন বা মন সঁপিলাম
কেন বা গেলাম আনতে পানি;
পাড়ার লোকের কতো কথা শুনি
করে সবে কানাকানি॥

তার চেকন কালা দেহখানি দেখে
হারে তার চেকনকালা দেহখানি দেখে
মনে নিলো আপন মানি;
তার আসার পথে চাইতে চাইতে আমার
চোখে পড়লো বুঝি ছানি॥

কালার হাতে ছিল মোহনবাঁশি
হা রে কালার হাতে ছিল মোহন বাঁশি
সুরে দিলো হাতছানি;
আমার চুলের খোঁপা খুলিয়া পড়িলো
ছাড়িলাম সুখের বিছানি॥

আমার কানতে কানতে জীবন চলে গেলো
হা রে আমার কাঁনতে কাঁনতে জীবন চলে গেলো
বন্ধুরে দে তোরা আনি;
ক্ষ্যাপা হোসাইন যে চোখের জলে ভাসে
সংসারেরই ঘানি টানি॥

৭

আমার কালার প্রেমে জীবন কালা
কলঙ্কিনী বলে সবে,
কালা ছাড়া নাই কিছু ধন
কালা হেরি সারা ভবে–
কালা জ্বালা দিয়ে গেলো আমায়
জানি না সই কবে আমায় তুলে লবে॥

শয়নে স্বপনে কালা, পরাণে হানে মরম জ্বালা
শুকালো মোর সাঁঝের মালা রাই কেমনে রবে;
উতলা হয় পরাণখানি কালার বাঁশির ধ্বনি শুনি যবে॥

ভাবিস তোরা মজলো রাধা মিছা করে কান্না-কাঁদা
তোদের বুঝি মিছাই সাধা প্রেম করার গৌরবে;
তোরা যবে হবি অনুরাধা তোদের ঠিক এমন হবে॥

রাতে দিনে গভীর আশা, মিছা নয় মোর ভালোবাসা
প্রেমহলো মোর সর্বনাশা–আঁখি ভাসাই নীরবে;
ভাঙবে কি মোর আশার বাসা বল না তাই তবে॥

ক্ষ্যাপা হোসাইনও রাধার মতো, কেঁদে ফেরে অবিরত
হৃদয়ে তার হাজার ক্ষত–দুঃখ কারে কবে
মাতিল তার হৃদয়খানি বন্ধুর প্রেমের সৌরভে॥

৮

মধুর মাধবী রাতি এলো বৃন্দাবনে
কেমনে কাটাবো সখি প্রাণ বন্ধু বিহনে॥

এমনি এক শুভ লগনে, পড়িস তার প্রেমের বাঁধনে
চাঁদ জাগিলো মোদের সনে লয়ে তারাগণে;
সে দিন তারি শূক আর আমার সারি না ছিল দুজনে॥

কাছে নাই সে সাথের সাথী, বিফলে যায় বিভোল রাতি
কার তরে আর মালা গাঁথি বসিয়া বিজনে;
আজি বিচ্ছেদ আগুন দ্বিগুন জ্বলে মলয় সমিরণে॥

সেদিন যে কোকিলের গানে, ফুলের জোয়ার রইলো মনে
আজকে তারি কুহু তানে বিষ ঢালে শ্রবণে;
যেন অগ্নিকণা ছড়াচ্ছে এ চাঁদনি কিরণে॥

এ শূন্য কুঞ্জকুটীরে, আর কি সে আসিবে ফিরে
দেখা কি এ অভাগিরে দেবে এ জীবনে;
অবুঝ প্রফুল্ল কয়, পথ চেয়ে রই আকুল নয়নে॥

৯

আমার মন কান্দে যার লাগিয়া
দেহ প্রাণ কান্দে যার লাগিয়া
তারে কোথায় পাবো রে খুঁজিয়া
ও সে তারি তরে বাদল ঝরে
আমার ঝরেছে দুই আঁখিয়া॥

তার সাথে আমার সাথে ছিল মাখামাখি
বড়ো ভালোবাসতাম তারে মায়ায় রাখি
পরাণ বন্ধু বলে ডাকি
হঠাৎ না কয়ে না বলে সে জন
গেলো আমায় সে দিন ছাড়িয়া॥

না বলার যে বড়ো ব্যথার দাগ লেগেছে মনে
পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াই কাননে কাননে
শুধু তারি অন্বেষণে
আমার জাতি ধর্ম কুলের গৌরব
সব দিয়েছি তারে ঢালিয়া॥

শুনেছি সে প্রবাল- দ্বীপে বেঁধে একখান ঘর
সেই ঘরেতে বসে বাঁশি বাজায় নিরন্তর
তুলে পঞ্চমে তার স্বর-
আমি শুনেছি তার বাঁশরির গান
নিশিতে কান পাতিয়া॥

প্রফুল্ল কয়, জীবন ভরে করছি পাতি পাতি
খুঁজিয়া না পেলাম একজন সেই পথেরই সাথী
যে মন সমব্যথার ব্যথী–
এবার নিজে হয়ে নিজের সাথী
দিলেম তরী খুলিয়া॥

ঋতুভিত্তিক ও আনুষ্ঠানিক গান

বাংলাদেশে ১২ মাসের ১৩ পার্বণ বলে একটি প্রবাদ আছে। ঐ সব পার্বণের সাথে রয়েছে আমাদের লোক সঙ্গীতের প্রভাব। নড়াইল এলাকায় এই ধরনের ঋতুভিত্তিক ও আনুষ্ঠানিক গানের বিচিত্র প্রকরণ রয়েছে। এখানে আমরা কয়েক ধরনের গানের উল্লেখ করছি। এই গুলো হলো : অষ্টগান, য়্যাচড়া পূজোর গান, গার্শির গান, বালাই গান, বারাসিয়া গান, সারি গান, বিয়ের গান, মেয়েলি গান, সাপুড়ের গান, পাল্কির গান, ব্যঙ্গ-কৌতুক গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবার কয়েকটি ধারার গানের উদাহরণ দেওয়া গেল।

অষ্টগান

স্ত্রী : তুমি গুনপতি এই মিনতি করি তোমার পায়
খুলে রাখো শাঁখা শাড়ি থুয়ে আসো বাপের বাড়ি
এতো বাড়াবাড়ি সহ্য নাহি হয়॥

স্বামী : তুমি ঐ কথাটি আমার কাছে বলিও না আর
কে তোমায় কী বলছে বলো দেখি আমার কাছে
আমি উপযুক্ত শাস্তি দেব তার॥

স্ত্রী : দেখ চাকরানির মতো আমি খাটি দিন ও রাত
তবু তোমার মা-বুড়ি বলে বেড়াই বাড়ি বাড়ি
আমি গতর শোগা ছিনালের জাত॥

স্বামী : দেখ বুড়ি মানুষ থাকে না হুঁস পাগলের সমান
দেখেছি মা অনেক কথা বলতে গিয়ে বলে যা–তা
তুমি তার কথাতে দাও কেন বা কান॥

স্ত্রী : তুমি কোনো দিনো দাও না কিনে আলতা কি বাসতেল
চাইলাম একখান ছাপা শাড়ি বলরে হাতে নাই কো কড়ি
কিনে আনলে বাইশ টাকার সাইকেল॥

স্বামী : আছে মনে আশা পাটের ব্যবসায় যদি কিছু পাই
এক পয়সা না রাখিবো তোমার হাতে ধরে দিবো
করো তোমার মনে যাহা খুশি তাই॥

বারাসিয়া গান

মালঞ্চ : একে তো আষাঢ় মাসের ঘন বৃষ্টির কালে
পড়িলো হস্তের কলম মাধব তুলে দাও মোর হাতে॥

মাধব : দিবো দিবো কলম মালঞ্চ দিবো তোমার হাতে
একই সত্য তিনো কড়াল মালঞ্চ করো আমার সাথে
তুমি যাবে আমার সাথে॥

মালঞ্চ : এক স্কুলে লিখি পড়ি একি গুরুর ঠাঁই
গরুর সম্পক্কেরে মাধব তুমি হও রে ধর্মের ভাই
মাধব তুমি তুমি হও রে ধর্মের ভাই॥

মাধব : এক স্কুলে লিখি পড়ি একই গুরুর ঠাঁই
গুরু ছাড়া হলে মালঞ্চ কে বা কারো ভাই
মালঞ্চ কে বা কারো ভাই॥

মালঞ্চ : মোমের নাউ পবনের বোঠে গোড়ে পঞ্চ পাঠে
সোমবারের দিন যাইয়ো মাধব পাছ দুয়োরের ঘাটে
মাধব পাছ দুয়োরের ঘাটে॥

মাধব : কচু বোনে মশার কামড় রে মালঞ্চ আমি সইতে নারি
এমন ইচ্ছা করছে রে মালঞ্চ আমি জলে ডুবি মরি
মালঞ্চ আমি জলে ডুবি মরি॥

মালঞ্চ : ঘরে জাগে মাতাপিতা বাইরে জাগে চোকি
কেমন বাহির হবো রে মাধব আমি মাকে দিয়ে ফাঁকি
মাধব আমি মাকে দিয়ে ফাঁকি॥

মাধব : ঢাক বাজে ঢোল বাজে আরো বাজে কাড়া
ওরে শিগ্‌গির করে বাহির হওরে মালঞ্চ পাইয়ে ঢোলের সাড়া
মালঞ্চ পাইয়ে ঢোলের সাড়া॥

মালঞ্চ : ভাতো হলো কড়ো কড়ো ব্যাঞ্জোন হলো বাসি
একটুখানি দেরি করো রে মাধব দুটো অন্ন খায়ে আসি
মাধব দুটো অন্ন খায়ে আসি॥

হাতে হাতে পানো দিবো মাধব বোঠে রে কেন নাও
নিশ্চয়ই জানিলাম আমি জাইলা মাধবের নাও
আমি জাইলা মাধবের নাও॥

উজান বাঁকে তোমার বাড়ি ওরে ভাটি কেন বাও
ওরে নিশ্চয়ই জানিলাম আমি এতো সে মাধব নও
জানিলাম এতো সে মাধব নও॥

২

সকাল বেলি গিয়েছিলাম রে শানো বান্ধা ঘাটে
সেখান হতে হলো দেখা রে হালকা জ্যালের সাথে রে
রে নছিব এই ছিল কপালে॥

জ্যালের মাথায় জাল সুতো রে আমার মাথায় রে ডালি
কেমন করে বেঁচবো মাছো রে রায়েতগণের বাড়ি
রে নছিব এই ছিল কপালে॥

সাত ভাইয়ের বুন আমিরে পরমো সুন্দরী
সাত ভাই বৌদি দিছিল গালি জালিয়া ভাতারি
রে নছিব এই ছিল কপালে॥

শিশুকালে খেলেতে ছিলাম রে ছোট কূল রে লয়ে
ভাই বৌদি দিছিল গালি জালিয়া ভাতারি
বে নছিব এই ছিল কপালে॥

সকল জ্যালে জালোচ করে রে নালে আর খালে
হালকা জ্যালে জালোচ করে রে শানো বান্ধা ঘাটে রে
রে নছিব এই ছিল কপালে॥

৩

নারী : দেয়া পড়ে টিপি টিপি রে মন্দা ছাড়ে রে বাও
আজ বড়ো সংকটে আছি রে বন্ধু আজকে ফিরে যাও
মায়া ছাড়ো না॥

পুরুষ : আজকে যদি যাবো রে যুবতী না আসিবো রে আর
তোমার সঙ্গে কয় কথা রে গাধা হয় বাপ তার রে
মায়া ছাড়ো না॥

নারী : তোমরা তো পুরুষ জাতি রে কথায় করো রে কিরে
একটু খানি বস্তু নিয়ে করো বাপের কিরে রে
মায়া ছাড়ো না॥
দেয়া পড়ে টিপি টিপি ছাচের কেন রে ভেজো
হাতে আছে তা কাটারি রে তুমি ব্যাড়ো কাটে আসো রে
মায়া ছাড়ো না॥
দেয়াপড়ে টিপি টিপি উঠোন ভরা রে পানি
কোন খানে হেলিয়ে দিবো রে সরু মাজা খানি রে
মায়া ছাড়ো না॥

৪

ননদি : ফুল পলি কনেলো ছোট বৌ সাঁজের বেলা॥

বউ : জল আনিতে গিয়েছিলাম শানবান্ধা ঘাটে
ভ্যাসে আলো চম্পা ফুল তুলে দিলাম কানে
লো ননদি কই তোর কাছে॥

ননদি : চুলগুলো সব আলু থালু পৃষ্ঠে কেনো ধুলা
এতো সুন্দর বদনখানি কিসের কামড় গুলা
লো ছোট বৌ সাঁজের বেলা॥

বউ : দেওরা আমার ভাত খাইবে তুলতে গেলাম শাক
শাকের বনে বাঘের পাড়া উল্টে আছাড় খালাম
লো ননদি কই তোর কাছে॥

ননদি : আসুক আসুক দাদা বাড়ি মাইর খাওয়াবো তোরে
লো ছোট বউ কই তোর কাছে॥

বউ : মার খাওয়াবি গাল খাওয়াবি তুই বা কারো শালী
সকল কষ্ট দূরে যাবে তোর দাদার কোলে শুলি
লো ননদি কই তোর কাছে॥

৫

ও পারে সোনা বন্ধু স্নান ভালো করে
এপারে লাগে রে তার ঢেউ,
চোখের ইশারা দিয়ে আর কতো বুঝাবো তোরে
মুই নারী গিরস্তের বউ রে
আজ আমরা কিসের ওবা নারী রে॥
আমরা দুই নারী ধান চালু নাড়ি নাড়ি
পায়রায় খুটে খুটে খায়
কোন সোহাগির মাথা খ্যায়ে পায়রা রাখলো বন্ধ করে
আজ নারীর কোল শূন্য যায় রে
আজ আমি কিসের বা নারী হে॥

আমরা তো দুই নারী তরু তলে বারা বানি
বদন চুয়ায় পড়ে ঘামে
সোনা বন্ধু আমার হতো গামছাদে মুছায় দিতো
চাঁদ মুখে তুলে দিতো পান রে
আজ আমি কিসের বা নারী হে॥

৬

ওরে শীত বসন্ত সুখের সময় পতি নাই যার ঘরে
তুই বল না আমায় ননদিনী থাকবো কেমন করে॥

খাটের পরে দুইটি বালিশ থাকে পাশাপাশি
ঘুম আসে না হায় রে চোখে নয়নজলে ভাসি॥

কতো ব্যথা মনের কথা বলবো তারে শুয়ে
কেমনেতে বিদেশেতে থাকো আমায় থুয়ে॥

এমন যদি থাকবে তুমি করলে ক্যানো বিয়ে
ওরে বারেক আসে এই কথাটি যাও রে আমায় কয়ে॥

রাতি দিনি চিঠি লিখি ভিজে চোখের জলে
হয় না দয়া অভাগীরে মরবো কলসি নিয়ে গলে॥

৭

ও শ্যাম কানাই রে
তেলের বাটি গামছা হাতে
নারী চললো গাঙ্গের ঘাটে
কলসি ভাসায়ে নিলো দারুন সোঁতে রে॥

বন্ধু যদি আমার হতো
কলসি ধরিয়ে দিতো
পুরুষ নষ্ট শহরে বাজারে॥

আমরা তো অবোলা নারী
তরুতলে বারা বানি
বদন ভিজিলো গায়ের ঘামে রে॥
বন্ধু যদি আমার হতো
গায়ের ঘাম মুছায়ে দিতো
গামছাদে মুছায়ে দিতো মুখের ঘাম রে॥

হালোই গান

১

ওই ওরে এই বাড়ির নায়েক কর্তা
বড়োই ভাগ্যবান,

ওই ওরে বংশে ফলুক মানুষ গরু
ক্ষ্যাতে ফলুক ধান॥

ওই ওরে ছ্যামড়াগে দেখে রাজা তখন
বাক্সে দিলেন হাত,
ওই ওরে বাস্তু পূজোর মাঙ্গন চাই
নইলে ভাঙবো দাঁত॥

ওই ওরে তুলো টুনি সাধের গিন্নি
তুলো করলি কী?
ওই ওরে জানো না রে সওদাগর
গামছা বুনিছি॥

ওই ওরে গামছা বুনলি বেশ করলি
গামছা করলি কী?
ওই ওরে জানো না রে সদাগর
বেচে ফেলেছি॥

ওই ওরে বেচে ফেলছি বেশ করলি
পয়সা করলি কী?
ওই ওরে জানো না রে সদাগর
পান কিনেছি॥

ওই ওরে পান কিনলি বেশ করলি
পান করলি কী?
ওই ওরে জানো না রে সওদাগার
খ্যায়ে ফেলেছি॥
ওই ওরে এই পর্যন্ত জানি হালোই
গাচ্ছি বাড়ি বাড়ি
ওই ওরে ধান দিবা না পয়সা দিবা
আন তাড়াতাড়ি॥

২

ও লো খুদি পুটি ভাগ্যের জেটি
দেখসে লো বুন আয়,
এইতি যদি কই লো কিছু
নোহে মন্দ কয়॥

ঐ রে সহাল বেলায় ভাত রাঁধিচি

তারির গুটিক খ্যায়ে
ঐ রে খাটের পরে পাটায় রইছে
বড়ো নাটের ম্যায়ে॥

ঐ রে নেহা পাড়া ম্যায়ে জানে
ঠেহিচি কী দায়,
ঐ রে সাজন গোছন দেখছি আমার
শরীল জ্বলে যায়॥

ঐ রে কুলো হাতে করে না বউ
গায়ে নাগে ধুলো,
ঐ রে ঢেহি ঘরে ঢোহে না বউ
এমনি গতর খোলো॥

ঐ রে বই পড়ে রেডিও শোনে
হারমণি বাজায়
ঐ রে স্যাজে গুজে রেকসা চড়ে
টাহি দেখাতি যায়॥

ঐ রে হুকুম করে নাটের ম্যায়ে
খ্যাটের পরে শুয়ে,
ঐ রে ছোটো বাবু হেগে দেছে
কাপুড়ড়া দাও ধুয়ে॥

ঐ রে ছোটো কথা মুহি নাই তার
যেন হ্যাড়ে গলা
ঐ রে গতর জ্বলে দেখলি ওনার
ষাঁড়ের মতো চলা॥

ঐ রে জল পড়ে ও বশ করিছে
বশীকরণ দিয়ে,
ঐ রে বউয়ের কথা কলি আসে
হ্যালো নড়ি নিয়ে॥

৩

তুই কূল মজালি ও চুলবালি
বেন্যা গাছে ভূত,

নোখের আঁচড় দি-না বলে
কথায় এতো জুত॥

তেড়া দাঁতের গোড়ায় মায়িস
তামাক পেড়া ছাই
জটা চুলির ফেটা দেহে
লজ্জায় মরে যাই॥

ভাসুর শ্বশুর গুরুগম্ভীর
জ্ঞান হলো না তোর
কুটুম্ব লোক বাড়ি আলি
ঝগড়ায় করিস জোর॥

কাজের সময় গতর লোহা
ব্যারামে কাতরাস,
খাবার সময় খালোই পেটি
হাড়িডা কাঁপাস॥

সাদা কাপড়ে দাগ লাগায়ে
করলি ছাপা শাড়ি,
তোর রান্না খ্যায়ে ঘেন্নাতে কেউ
আসে না এই বাড়ি॥

মিঠে কথা বলি তোরে
প্যায়ে গেছিস লাই
যেমন কুকুর তেমনি মুগুর
এখন পাবি তাই॥

মা-ডা আমার বুড়ো মানুষ
খ্যাটে খ্যাটে মরে
কোন আক্কেলে দিনির বেলায়
পালায় থাহিস ঘরে॥

খেটে খেটে এই বয়সে আমি
বাঁধালাম অম্বল
তোর এ পালাস না ও পালাস না
মুহি বানধা বোল॥

গোলা ভরা কোলোই ধান
সব ফেলালি খ্যায়ে,

ছলের নামে খোঁজ খবর নেই
শুধো দিচ্ছিস ম্যায়ে॥

য়্যাচড়া পুজোর গান

১

য়্যাচড়া মাগি রে তোর ফ্যাচড়া চুল
তাই তি দিবো আমি বেঁধে বনফুল॥

বন্যার ফুলি যদি না নেয় মন
তাই তিদিবো আমি মান্দারের ফুল॥

মান্দালেব ফুলে যদি না লয় মন
তাই তি দিবো আমি কুমড়া ফুল॥

কুমড়ার ফুলে যদি না লয় মন
তাই তি দিবো আমি তামাকের ফুল॥

তামাকের ফুলে যদি না লয় মন
তাই তি দিবো আমি লাউয়ের ফুল॥

২

স্বর্ণ থালে চাল ও কড়ি লো
যোগী ভিক্ষা ধরো,
যোগী ভিক্ষা নেয় না কথা কয় না
এতো ঠেকলাম ভীষণ দায়
ওগো যোগী ভিক্ষা ধরো॥

আমার হালের কিষাণ বাড়ি এলো গো
যোগী ভিক্ষা ধরো
ভিক্ষা নেয় না কথা কয় না
এতো ঠেকলাম ভীষণ দায়
ওগো যোগী ভিক্ষা ধরো॥

আমার কোলের ছেলে উনানে পড়লো
ও যোগী ভিক্ষা ধরো
যোগী ভিক্ষা নেয় না কথা কয় না
এতো ঠেকলাম ভীষণ দায়

ও যোগী ভিক্ষা ধরো॥
আমার দুধের ছেলে ক্ষুধায় ম'লো
ও যোগী ভিক্ষা ধরো
স্বর্ণ থালে চালও কড়ি গো
ও যোগী ভিক্ষা ধরো॥

গার্শির গান

মশা মশা কান কোরেশা কানে বাঁধা দড়ি
সকল মশা তাড়ায়ে দিলাম কানুর মার বাড়ি
কানুর মা রে খুচে খুচে খা॥

কচু বুনে মশারে ভাই লম্বা লম্বা হুল
সগল মশা তাড়ায়ে দিলাম বড়ো গাঙের কূল
গাঙ্গের কুলেগে খুচে খুচে খা॥

কলাবুনে মশারে ভাই মুখে চাপদাড়ি
সকল মশা তাড়ায়ে দিলাম গেদুর মা-র বাড়ি
গেদুর মারে খুচে খুচে খা॥

যশোরের মশা রে ভাই লম্বা লম্বা পাখা
সকল মশা উড়ায়ে দিলাম বরিশাল আর ঢাকা
ঢাকা লেগে খুচে খুচে খা॥

সারিগান

যাত্রাকালে সঙ্গে আমার এসেছিল গুণের ভাই
ওরে লক্ষ্মণ গা তোলো দেশে যাই॥

গা তোলো গা তোলো লক্ষণ কতো নিদ্রা যাও
তোমার দাদা কেঁদে ম'লো নয়ন মেলে চাও রে
ওরে লক্ষ্মণ গা তোলো দেশে যাই॥

বিদেশে ম'লো ভাই রে দেশে ম'লো পিতা
পঞ্চবটী বনে এসে হারাইলাম সীতা
ওরে লক্ষ্মণ গা তোলো দেশে যাই॥

সীতা গেলে সীতা পাবো প্রতি ঘরে ঘরে
গুণের ভাই লক্ষ্মণ হারালে ভাই বলিব কারে রে
ওরে লক্ষ্মণ গা তোলো দেশে যাই॥

চৌদ্দ বছর আইছি বনে সীতা তখন ছোটো
দিনে দিনে বাড়ে সীতা বাকল হলো খাটো রে
ওরে লক্ষ্মণ গা তোলো দেশে যাই॥

বিমাতা মন্ত্রণা করে পাঠাইলো বন
আমার সনে আইলো বনে প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ
ওরে লক্ষ্মণ গা তোলো দেশে যাই॥

২

নয়ন মেলো কথা বলো ওরে গুণের ভাই
কাঁদে সীতা অশোক বনে চলো দেশে যাই
ওরে লক্ষ্মণ গা তোলো দেশে যাই
নিমাই হারা পাগলিনী বসে কাঁদে রাজপথে
ওরে নিমাই গেল কোন পথে॥

ধীরে ধীরে শয্যা ছাড়ি উঠিলো তখন
প্রিয়ার দিকে চেয়ে নিমাই বলিছে বচন॥

চির বিদায় লয়ে আমি চলিলাম এখন
ধর্ম্ম ধরে থেকো ঘরে করো না রোদন॥

বলিতে বলিতে নিমাই করিলো গমন
হেনকালে বিষ্ণুপ্রিয়া হইল চেতন॥

কি নিয়ে রে থাকবো ঘরে কি সাধনা হবে
শূন্য ঘরে হা-হুতাসে জীবন কেটে যাবে॥

নিমাই চাঁদ সংসার ছাড়ি কাটোয়াতে গেলো
কেশব ভারতী তারে সন্ন্যাসী করিলো॥

বিয়ের মেয়েলি গান

১

আরশের মা-র মহলে ঘুনঘুন
চৌকিদারে ডাক ছাড়ে
ও তার লাঠিতে দেখি ঝামঝুর ঝুমঝুর
কালা ওছা ভোমরা রে

ও তার চেককোন সিঁথে দেখে হই পাগল
কাল্য ওছা ভোমরা রে॥

আরশের চাচির মহলে কোনের গোমস্তা ডাক ছাড়ে
কালা ওছা ভোমরা রে
ও তার হাইলকো মাজা দেহে হই পাগল
কালা ওছা ভোমরা রে॥

আরশের ভাই বোন মহলে
গেরামের মাতব্বার ডাক ছাড়ে
কালা ওছা ভোমরা রে॥
ও তোর চেককোন নাক দেহে
পথের মানুষ হয় পাগল
কালা ওছা ভোমরা রে॥

ঘোমেরও না ভানু আমার নিদরালো না ভানু আমার
ভানু দুলায় তুলিয়া দিলাম
আদদেক পথে যাইয়া ভানু কান্দে অভিমানে॥

কি সে দুক্ষে কাঁদো ভানু কও দি আমার কাছে,
এই না দুক্ষে কান্দি সাধু বাবজান আনি নাই সাথে॥

ডুলার কাপুড় উজলোয়ে দেখ ভানু বাবজান সামনে খাড়া
ঘোমের ওনা ভানু আমার নিদরালো না ভানু আমার
ডুলায় তুলিয়া দিলাম॥

আদ্দেক পথে যাইয়া ভানু কান্দে অভিমানে
কিসের দুক্ষে কান্দো রে ভানু কও দি আমার কাছে॥

এই না দুক্ষে কান্দি সাধু চাচাজান আসি নাই সাথে॥
ডুলার কাপড় উজলোয়ে দেখ ভানু চাচাজান সামনে খাড়া॥

৩

পঞ্চ আইয়েরে আমার পঞ্চ মুখ
লোয়াসার বাপের যেন শারেলের মুখ
খাইয়ে গেলো আমার

লোতুন বাগের ক্যালা॥

উড়ো যনতোর পাতিবো
হ্যায়ো না শারেল বাঁধাইবো
আদাই করবো রে আমার
লোতুন বাগের ক্যালা॥

পঞ্চ আইয়েরে আমার পঞ্চ মুখ
খেয়ে গেল রে আমার নোতুন বাগের কচু
উড়ো যনতর পাতিবো
হ্যায়ো না শুয়োর বাঁধাইবো
আদাই করবো রে আমার
লোতুন বাগের কচু॥

পঞ্চ আইয়ে রে আমার পঞ্চ মুখ
খাইয়ে গেলোরে আমার
ব্যারে ঠিলের পেড়ি
উড়ে যনতর পাতিবো
হ্যায়ো না শিয়েল বাঁধাইবো
আদাই করবো রে আমার
ব্যারে ঠিলের পেড়ি॥

৪

বিয়েই বিয়েই বলে আমরা যাই না বিয়েইর কাছে
বিয়েই আমার হনুমান রাফদে বসে পাছে (রামরে)॥

পুতরো পুতরো বলে আমরা যাই না পুতরোর কাছে
পুতরো আমার লাফারুর বেটা লাফদে ওঠে গাছে (রামরে)॥

জামাই জামাই বলে আমরা যাই না জামাইর কাছে
জামাই আমার বেজির ব্যাটা শঙ্খ দিয়ে ওঠে (রামরে)॥

গাজীর দরগা, ব্রাহ্মণপাটনা, কালিয়া

মোগল আমলে নির্মিত কদমতলা মসজিদ, কালিয়া
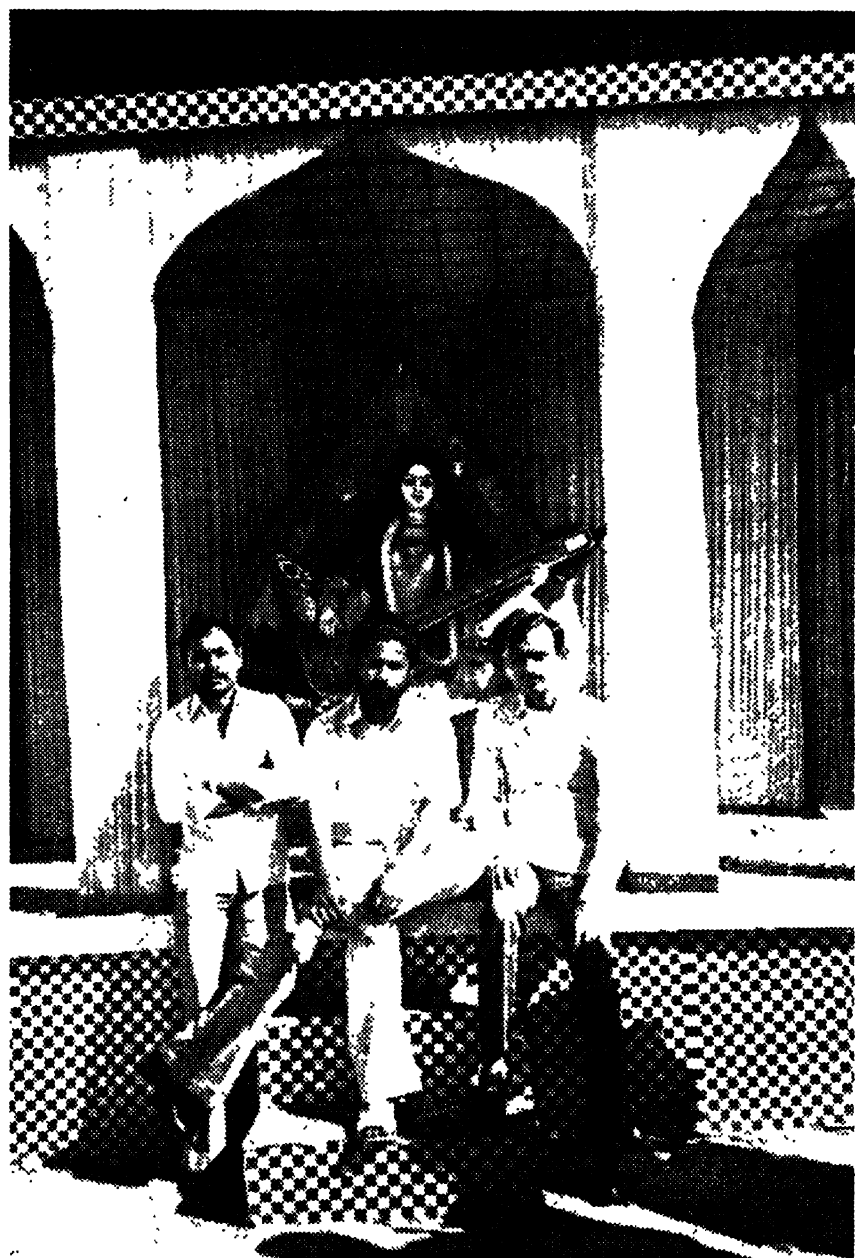
স্বরস্বতী পূজামণ্ডপ, কালিয়া

পোড়োবাড়ি মন্দির, পুরুলিয়া, নড়াইল
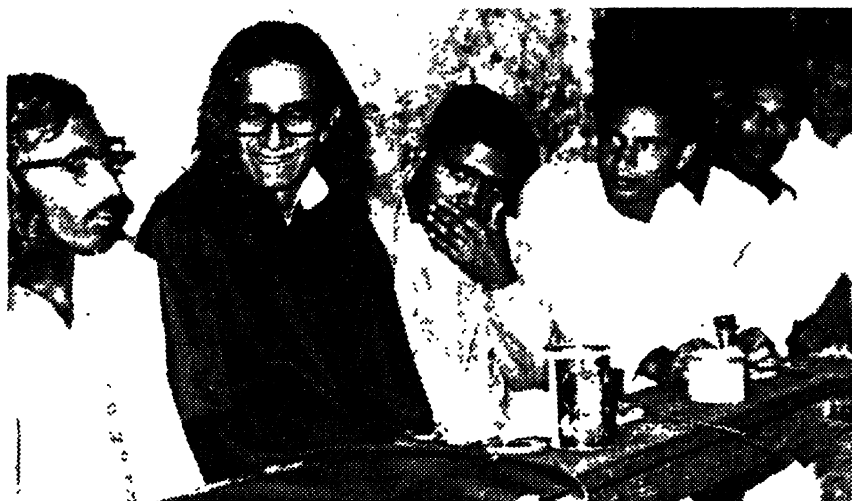
মুচিরপুলের কাছে শিল্পী সুলতানের আড্ডা, রূপগঞ্জ

কবিগাণের আসর, কলাবাড়িয়া, কালিয়া

বড়দিয়ার গৌড়িয় মঠ, লোহাগড়া
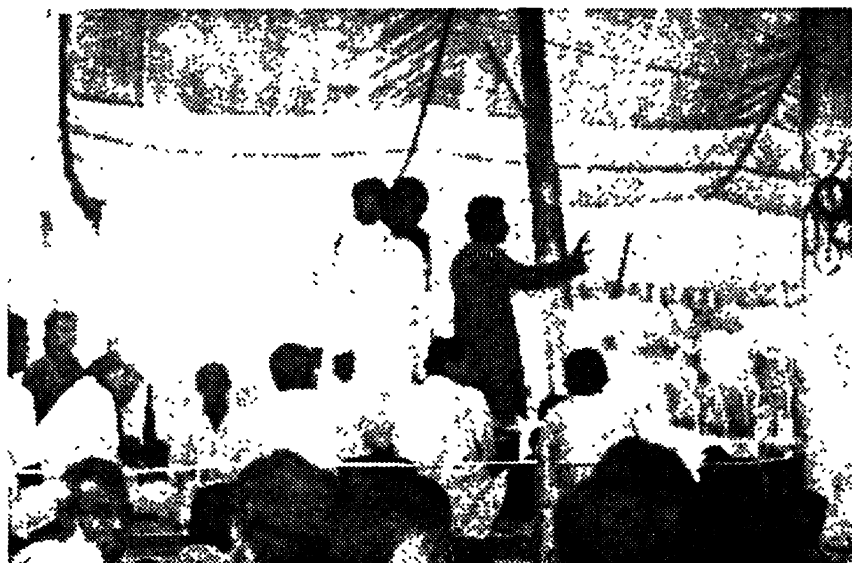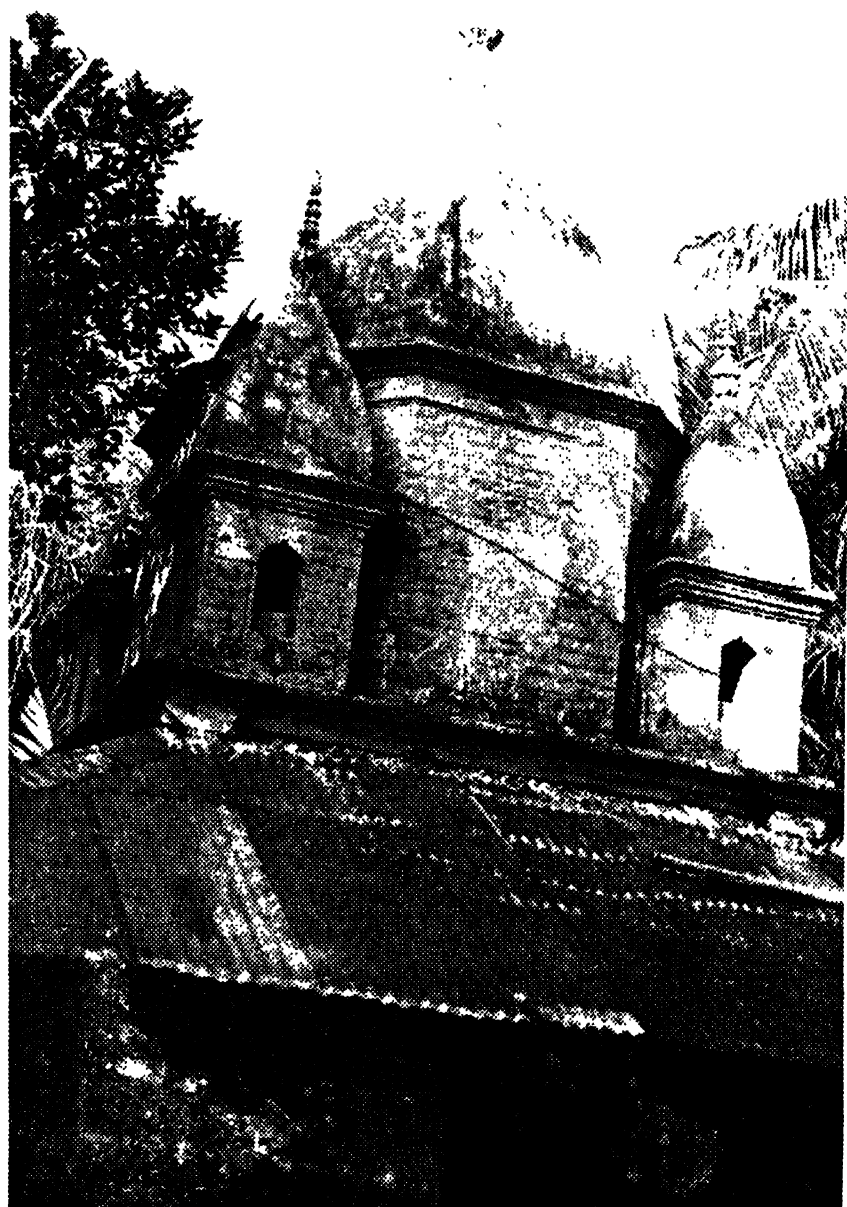
শিল্পী এস এম সুলতান

কালিয়ার কৃতিসন্তান ওস্তাদ রবিশংকর
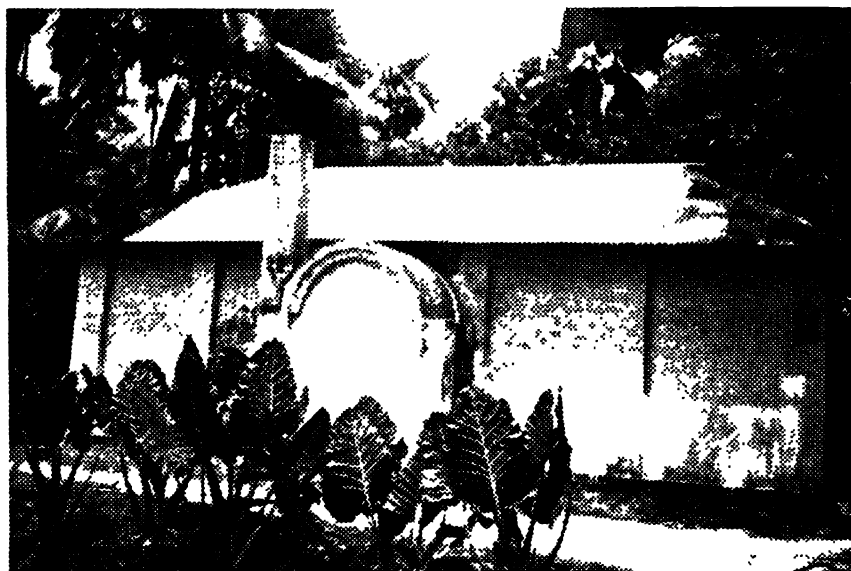
কলাবাড়িয়ার প্রাচীন মসজিদের বর্তমান আলোকচিত্র

রবিশংকর-উদয়শংকরের বাড়ি, কালিয়া

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ, বর্তমানে শহীদ মিনার, কলাবাড়িয়া, কালিয়া

কালিয়ার কৃতিসন্তান বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ গিটার শিল্পী এনামুল কবির

শিবপূজা, কলাবাড়িয়া দশআনি মাঝিপাড়া, কালিয়া

কিংবদন্তির রাজা কেশব সেনের ধ্বংস হয়ে যাওয়া রাজবাড়ির ভিটায় লেখক, ১৯৮২

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক নীহাররঞ্জন গুপ্ত, ইতনা, লোহাগড়া

কবিয়াল বিজয় সরকার, ডুমদি, নড়াইল

বাঁ থেকে ববিশংকর, উদয়শংকর ও মমতাশংকব

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'র সঙ্গে রবিশংকর, উদয় শংকর ও অন্যান্য

ঔন্যাসিক নীহাররঞ্জনগুপ্তের বসতভিটা, ইতনা, লোহাগড়া

বেন্দার কৃতিসন্তান কমলদাস গুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী ফিরোজা বেগম, কালিয়া
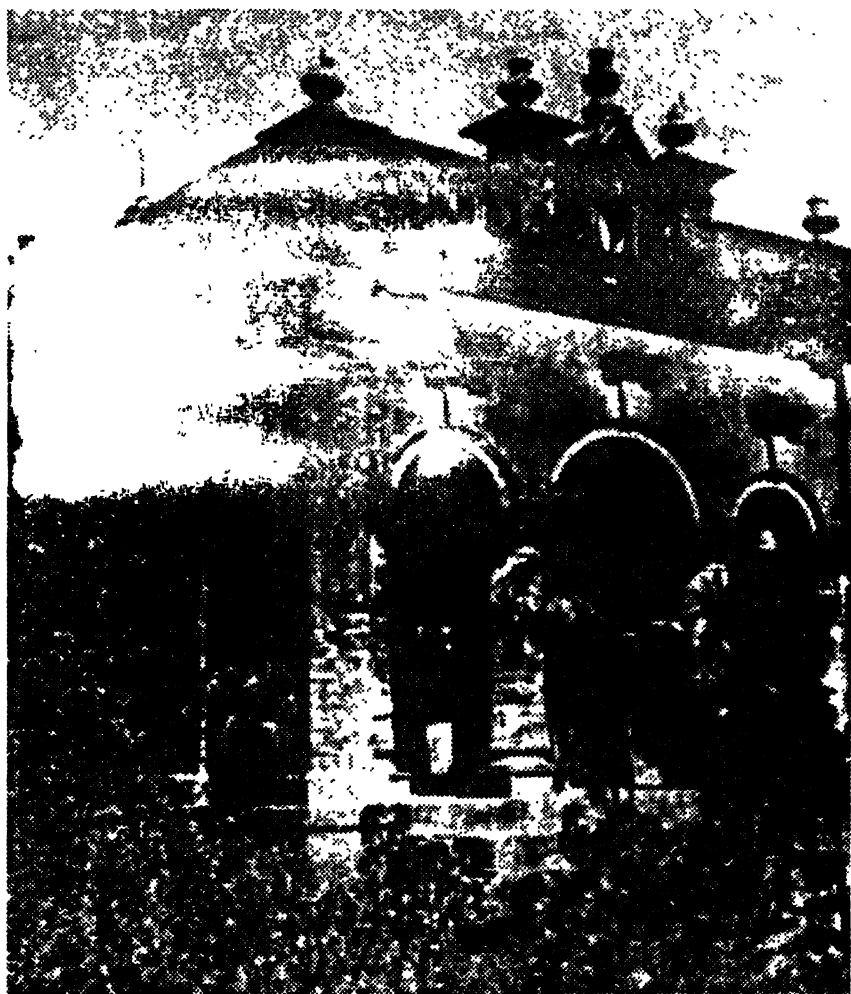
খামারপারোখালি কালীমন্দির, কালিয়া

শিল্পী এস এম সুলতান ও চিত্রা নদীতে ভাসমান শিশুস্বর্গের নৌযান
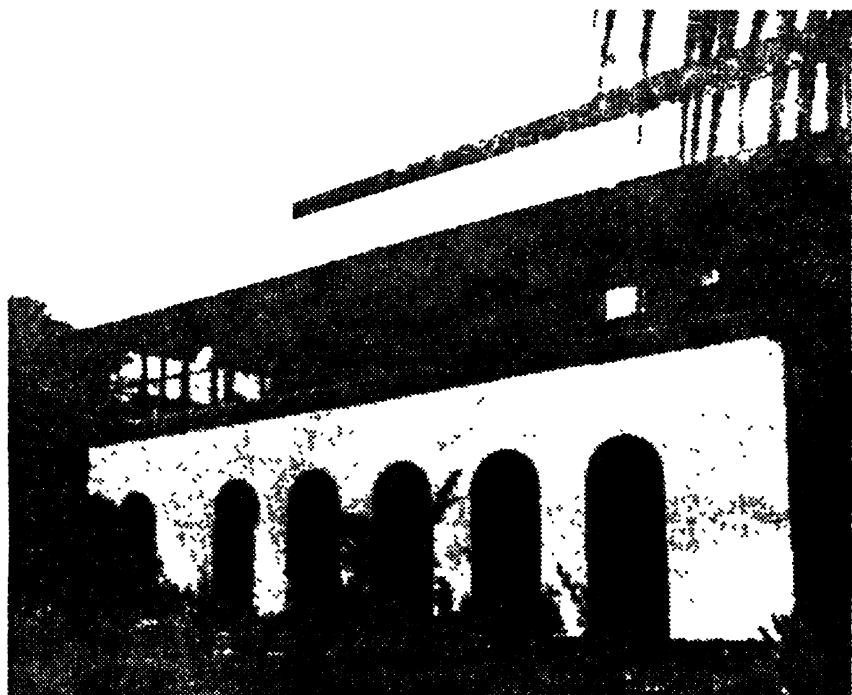
মহিশাপাড়া নীলকুঠি পরে নড়াইল মহকুমা প্রশাসকের বাসভবন, নড়াইল ১৯৮১
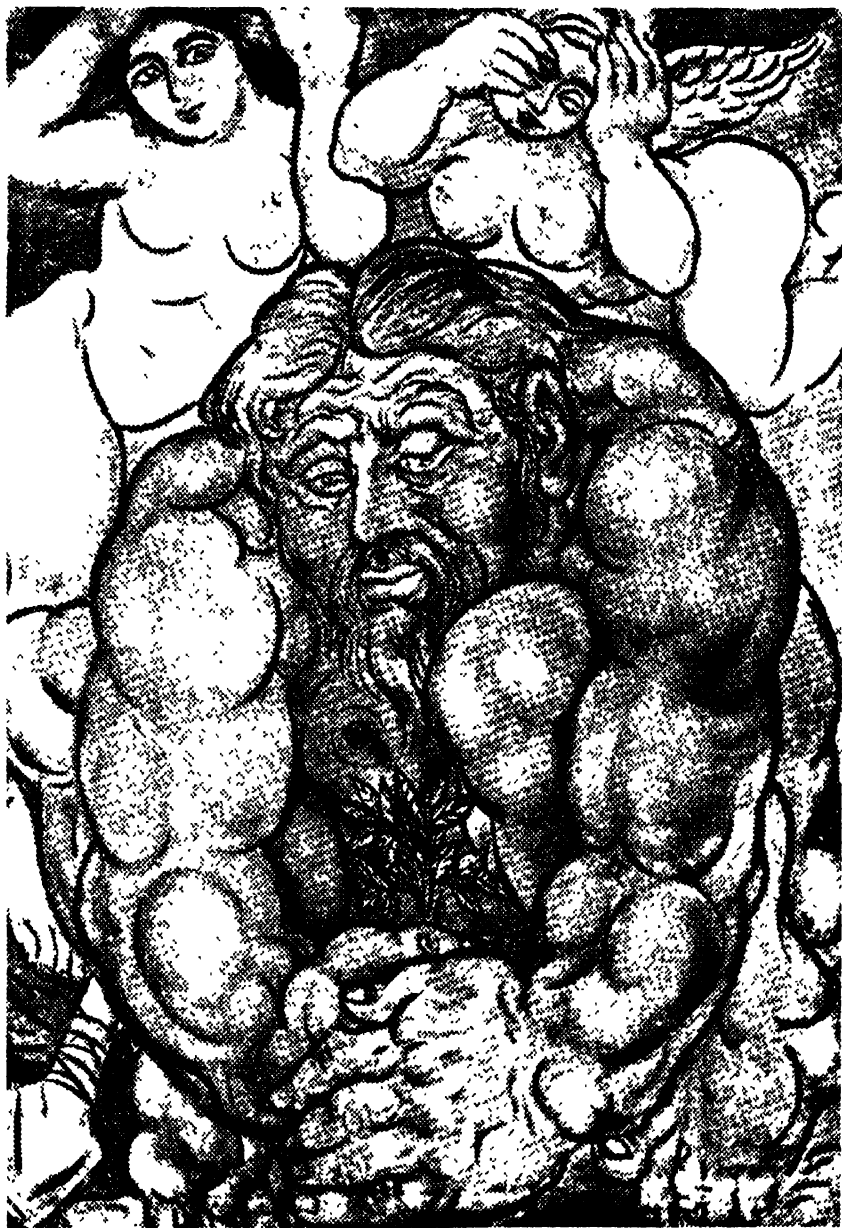
শিল্পী এস এম সুলতানের অঙ্কিত বৃক্ষরোপন চিত্রকর্ম

নড়াইল জমিদারদের নির্মিত চিত্রানদীর তীরে বাঁধানো ঘাট

ঊনবিংশ শতাব্দিতে নীলচাষের অঙ্কিত ছবি

নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ, কলাবাড়িয়া, কালিয়া
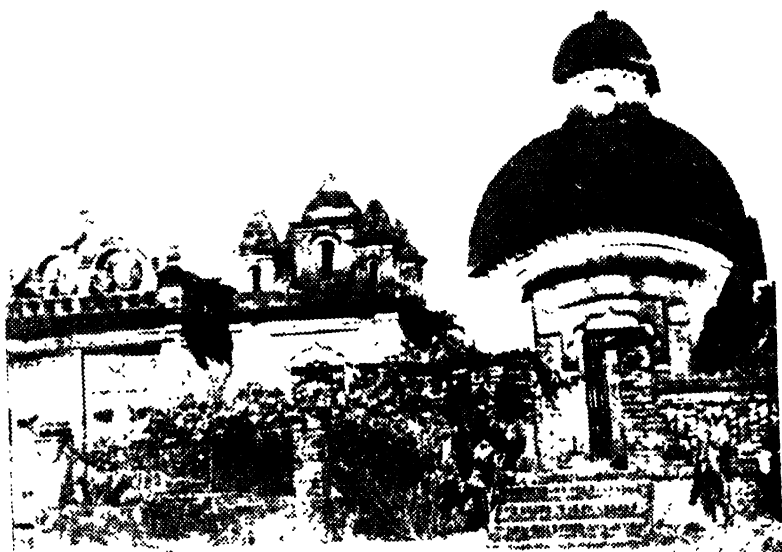
কালিয়া কলেজের অভ্যন্তরে প্রাচীন মন্দিরসমূহ

বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর

মহাজন হরিসভা মন্দির, লোহাগড়া

পজুশাহ দেওয়ানের দিঘি ও মাজার, রামপুর, লোহাগড়া

কালিয়ার সুবিখ্যাত পিতলের রথ